২২ শ্রাবণ ১৩৬৩

প্রচ্ছদের ছবিতে 'ফাল্গুনী' নাটকে অন্ধ বাউলের
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ : শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

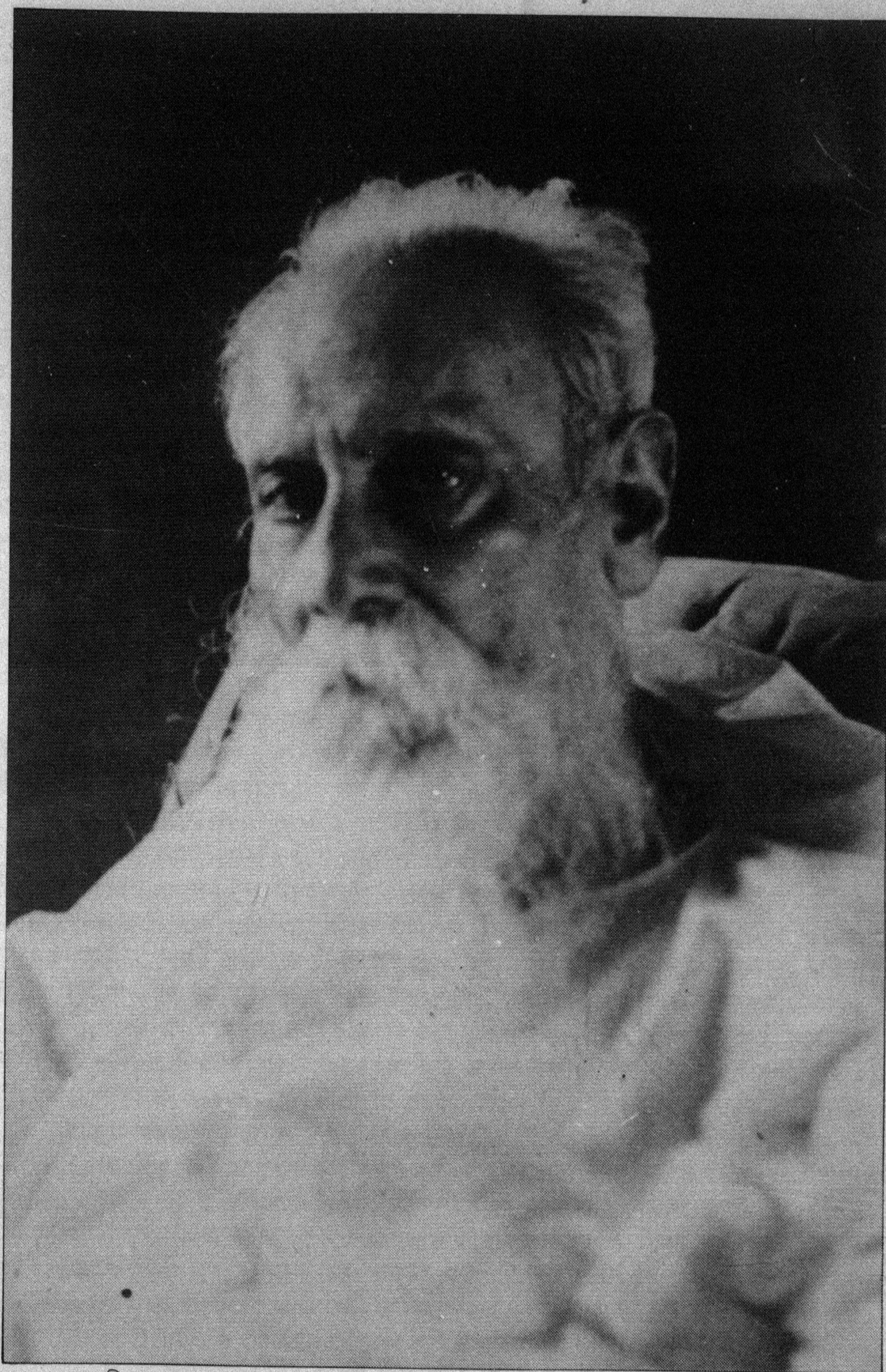
নিষ্ক্রিয় অবকাশ শূন্য শুধু, শান্তি তাহা নয়,
যে-কর্ম্মে রয়েছে সত্য, সে-কর্ম্মে শান্তির পরিচয়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

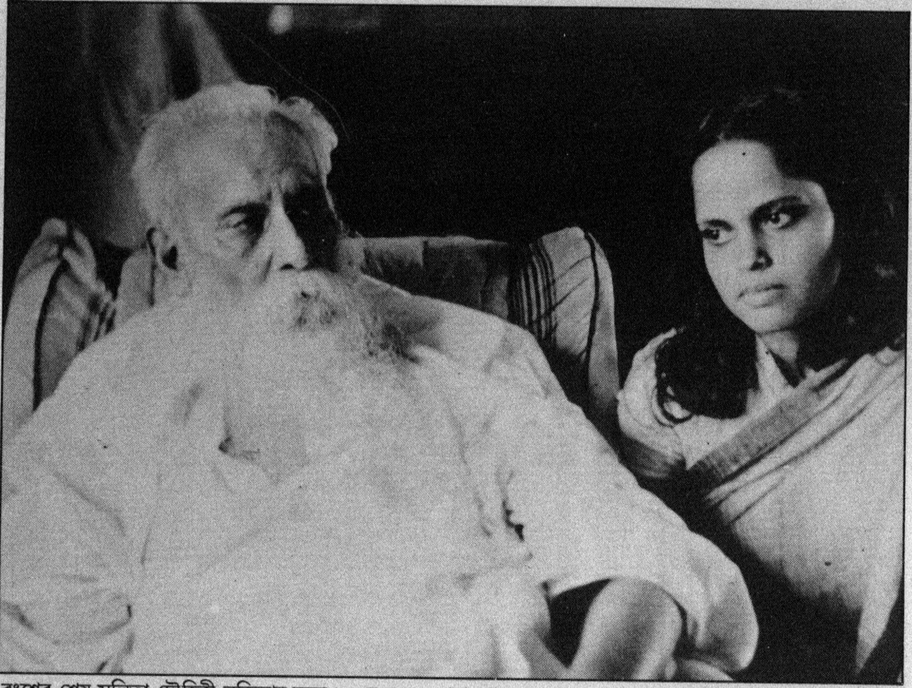
বিজয়া দশমী

১৩৩৬

শান্তিদেবকে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী



৮০ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ, ২১ জুলাই ১৯৪১



বংশের শেষ সলিতা দৌহিত্রী নন্দিতার সঙ্গে ৮০ বৎসরের দাদামশায়

আমার জন্মস্থান

আমার জন্ম বাংলা ১৩১৭ সালের ২৪ বৈশাখ, ইংরেজি ১৯১০ সালের ৭ মে। জন্মেছিলাম বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরের ছ' মাইল দক্ষিণে, বিশাল মেঘনা নদীর তিন মাইল পুবে, বাজাপ্তি গ্রামে। এই গ্রামেই আমার পিতামহ দীননাথ ঘোষ প্রথম এসেছিলেন। গ্রামটি ছিল কয়েকটি পাড়ায় বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের গ্রামগুলির মতো নয়। বংশানুযায়ী পাড়া কটি ছিল বিভক্ত। দত্ত-বংশীয় পাড়াটি ছিল বেশ বড়। এই পাড়ার দত্তদের মধ্যে একটি পরিবার ছিল ছোটখাটো জমিদার। তাদের ছিল একটি দোতলা পাকা ইঁটের বাড়ি। সঙ্গে চারিপাশে ছিল টিনের এবং একপ্রকার লম্বা ঘাসের ছাউনি ও বাঁশের বেড়া দেওয়া রান্নাঘর ও আরও অনেকগুলি ঘর। ঢেঁকিঘরও ছিল। চাষের ও দুধের গরু থাকত স্বতন্ত্র একটি চালাঘরে। পরিবারের নরনারী, সন্তানসন্ততি, ভৃত্যের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এই পরিবারের বাড়ির সংলগ্ন উত্তর দিকে ছিল একটি ইঁট বাঁধানো বড় ঠাকুরদালান। সেখানে দুর্গাপুজোর সময় মূর্তি গড়িয়ে পুজো হত না। হত ঘট-পুজো। পুজোর দালানের সঙ্গেই ছিল একটি বৃহৎ মণ্ডপ। বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড় করানো এবং একপ্রকার ঘাসের চালায় নির্মিত এই মণ্ডপটি। এখানেই বসত গ্রামের পাঠশালা। শিশুরা এখানে সকালে জড়ো হত, হাতে 'শ্লেট' ও হাল্কা একপ্রকার সাদা পাথরের সরু আকারের এক আঙুলের মতো লম্বা পাথর নিয়ে। 'শ্লেট'-এর উপর সাদা দাগ ফেলে বালকরা অ-আ-ক-খ ইত্যাদি লিখতে শিখত। আর দেখেছি, কলাপাতাকে পুথির পাতার মতো করে কেটে নিয়ে তার উপরে কালি ও কলম দিয়ে বাংলা শব্দ লিখত। শুনেছি, সেই কালি তাদের বাড়িতেই তৈরি করা হত একপ্রকার দেশি প্রথায়। ছোট ছোট কাঁচের শিশিতে তার মুখ নরম কাঠ বা পাটকাঠির ছোট গোঁজা দিয়ে আটকে তারা পাঠশালায় আসত সব কিছু নিজের হাতে বয়ে। এই রকম কালো কালিতে কলাপাতার উপরে বালকেরা বাংলা শব্দাদি লিখত বাঁশের সরু কঞ্চিতে বানানো একপ্রকার কলম দিয়ে। মণ্ডপে ছিল সারি সারি বেঞ্চি। তাতে বালকেরা বসে লেখাপড়া করত, গুরুমশায়ের নির্দেশে। তিনি বসতেন চেয়ারে। শাসনের জন্য বেত্রাঘাতের প্রয়োজনে প্রায় দু হাত লম্বা সরু বেত তিনি হাতে যে রাখতেন তাও দেখেছি। তবে বেত্রাঘাত করতে কখনও দেখিনি। এই দত্তবাড়ির গায়ে লাগা একটি ছোট ঘরে বাজাপ্তি গ্রামের পোস্ট-অফিসও ছিল।

দত্তপাড়ার উত্তরে এই জমিদার বংশের পূর্বপুরুষরা একটি বিরাট জলাশয় রচনা করে গিয়েছিলেন, যাকে বলা হত দিঘি। এর পুব দিকের পাড়ে ছিল ইঁট-বাঁধানো একটি বড় ঘাট। এই দিঘি থেকেই দত্তপাড়ার সব কটি বাড়ির রান্না-খাওয়ার জল সংগৃহীত হত এবং সকলেই ঘাটে স্নান করতেন। ঘাটের উল্টো দিকের একটি কোণের পাড় ছিল নালা-কাটা। সেখান দিয়ে বর্ষার জল সহজেই দিঘিতে প্রবেশ করত। এ ছাড়া এই দত্তপাড়ার নরনারীরা যখনই নৌকো করে বাইরে কোথাও যেতেন তখন ওই নালা দিয়ে নৌকো দিঘিতে ঢুকে ঘাটের সঙ্গে লাগিয়ে সকলকে তাতে তুলে নিয়ে ওই নালা দিয়েই বেরিয়ে গন্তব্যস্থল অভিমুখে যাত্রা করত এবং ওই নালা দিয়েই ঢুকে ঘাটে যাত্রীদের নামিয়ে দিত। এই দত্তপাড়ার সঙ্গে ব্যবধান রেখে আশে-পাশে যে কটি পাড়া ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল ঠাকুরপাড়া, অন্যটি বৈদিকপাড়া। ঠাকুরপাড়া ও বৈদিকপাড়ার অধিবাসীরা ছিলেন

ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। ঠাকুরপাড়ার ব্রাহ্মণেরা এই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের যাবতীয় পালাপার্বণ, পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে পুরোহিতের কাজ করতেন। বৈদিকপাড়া ছিল সংস্কৃত পণ্ডিতদের আস্তানা। সেখানে একটি সংস্কৃত টোল ছিল। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা সেখানে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করত।

আমাদের ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা

বাজাপ্তি গ্রামে ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের ঠাকুরদাদা। তিনিই প্রথম এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। ঘোষপাড়ার বেশ কিছু তফাতে ছিল ভুঁইয়াপাড়া এবং দেপাড়া। এভাবেই এক-একটি বংশ স্বতন্ত্রভাবে বাস করতেন। তবে আমাদের পাড়াটি অন্য কোনও ঘোষ পরিবারকে নিয়ে গড়ে ওঠেনি। আমাদের ঠাকুরদাদার আমলেই এর উৎপত্তি। বাজাপ্তিতে আমাদের বংশের উৎপত্তির গল্প আমাদের ঠাকুরমার কাছে বড় হয়ে যা শুনেছিলাম, তা হল—এখানকার দত্তপাড়ার ওই জমিদার বংশের কন্যা আমাদের ঠাকুরমা, শ্যামাসুন্দরী। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর জন্ম। ছ-বছর বয়সে তাঁর বিবাহের কথা চিন্তা করে তাঁর পিতা এবং আত্মীয়রা উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করতে গিয়ে আমার ঠাকুরদাদার সন্ধান পেয়ে, তাঁকে পাত্র হিসাবে নির্বাচন করেন। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন পূর্বের কোনও এক গ্রামের কুলীন কায়স্থ এবং দেখতে দৃষ্টিনন্দন। তাঁকে নির্বাচন করে তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, কুলীন ঘোষ বংশের ওই পাত্রকে তাঁদের ছ-বছরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে জামাইকে ঘরজামাই করে, বাড়িঘর জায়গাজমি সমেত বাজাপ্তি গ্রামে দত্তপাড়ার কাছেই রাখতে চান। ঠাকুরদাদার অভিভাবকরা সানন্দেই সম্মত হন এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়। ঠাকুরদাদা তখন বারো বছরের বালক মাত্র। ঘোষ পরিবার বাজাপ্তি গ্রামে এসে দত্ত জমিদার প্রদত্ত চারটি পুকুর, নানাপ্রকার গাছপালা ও অনেকখানি জায়গাজমি নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

ঠাকুরমা বলতেন, সে যুগে ঠাকুরমার মতো অল্পবয়সী বালিকাদের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সাজপোশাকের প্রাচুর্য বিশেষ ছিল না। তাঁরা গামছার মতো একপ্রকার বস্ত্র পরেই দিন কাটাতেন, বিবাহের পরেও। কখনও এমন হত যে, সমবয়সী বালিকাদের সঙ্গে খেলাধূলার সময় পরিধানের সেই বস্ত্রটি কোমরে আঁটসাঁট করে বেঁধে নিতেন। গায়ে কাপড় থাকত না। মাথায় ঘোমটা দেবার কথা ঠাকুরমার মনেও থাকত না। বারো বছরের বালক, ঠাকুরদা ওই সময়ে যখন বাড়িতে আসতেন তখন বাড়ির বয়স্ক মহিলারা ঠাকুরমাকে ধরে যথাযথ রীতিতে কাপড়টি পরিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দিতেন। ঠাকুরমার কাছে তাঁর অল্পবয়সের এইরকম নানা গল্প শুনে আমরা খুবই আমোদিত হতাম।

দত্তপাড়ার নিকটবর্তী আমাদের ঘোষ বংশের এই বাড়িটির মধ্যে প্রায় আধ মাইলব্যাপী একটি জঙ্গল ছিল। নানাপ্রকার বড়-ছোট গাছ, লতানো বেতগাছের সঙ্গে আরও নানা প্রকৃতির ছোট ঘাসে পূর্ণ ছিল এই অঞ্চলটি। দিনের বেলায়ও সেখানে প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল। এখানে এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ার ব্যবধানে দেখেছি এইরকমের জঙ্গল। ঠাকুরমা বলতেন, তাঁর বাল্যকালে এই জঙ্গলে মাঝে মাঝে বণ্যপ্রাণীদেরও আবির্ভাব ঘটত। সেই কারণে তখনকার দিনে ঘোষ বংশের সকলকেই সর্বদা সতর্ক থাকতে হত। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল সে যুগের পূর্ত-দপ্তরের তৈরি পায়ে হাঁটা রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে সকলেই পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতেন। গরুর গাড়ির মতো কোনওপ্রকার যানবাহন ওই অঞ্চলে তখন প্রচলিত ছিল না। বিশেষ প্রয়োজনে পাল্কি বা একজন বসতে পারে এইরূপ ডুলিতে চড়ে বাহকদের সাহায্য নিতে হত একটু দূরে কোথাও যেতে হলে। কাছাকাছি পাড়াতে যাবার সময় সকলকে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে হত।

আমাদের বাড়ির উত্তর সীমানা দিয়ে পূর্ত-দপ্তরের তৈরি রাস্তা ছিল। বাড়ির প্রবেশের বাঁদিকে

দিঘি ছিল। দিঘির চার পাড়ে পুরনো দিনের আম, বেল, কাঁঠাল, নাশপাতি, লেবু, গাব এবং আরও কয়েকপ্রকার ফলের গাছ প্রচুর ছিল। দিঘি পার হয়ে বাড়ির প্রাঙ্গণে ঢোকার মুখে পড়ত বিরাট একটি ডালপালা বিস্তৃত অতি প্রাচীন বকুলগাছ। তার গুঁড়িটিও ছিল তেমনই বিশাল। গাছটি ছিল বড় বড় ডালপালায় বিস্তৃত। প্রচুর ফুল বিছিয়ে দিত রাস্তার উপরে এবং আশে-পাশে। এই গাছটিকে ঠাকুরমারা কোনও একটি দেবতার স্থানরূপে দেখতেন। সন্ধ্যায় প্রদীপ ও ধুনো জ্বালিয়ে ফুল দিতেন তার গোড়ায়। আমরা কখনও কখনও এই গাছে ছোট-বড় কয়েকপ্রকার সাপের আনাগোনাও লক্ষ করতাম। কিন্তু তা দেখে কেউ ভীত হতাম না।

বাড়ির সীমানায় প্রবেশের মুখে প্রথমে ছিল ঘাসে ছাওয়া বেড়া দেওয়া, দরজা-জানলাযুক্ত একটি বাসোপযোগী ঘর। সেখানকার প্রচলিত্-কথ্য ভাষায় এটিকে বলা হত 'বাইর বাড়ি'। এটিতে অতিথি অভ্যাগত পুরুষরা যখন আসতেন, থাকতেন এবং রাত্রে শুতেন। এই বাড়ির দু পাশে দুটি পুকুর ছিল। 'বাইর বাড়ি'র ডান দিকের পুকুরটির জলে বাসন মাজা, কাপড় কাচা হত। বাম দিকের পুকুরটিতে ছিল জলজ ঘাস ও ছোট একপ্রকার কচুরিপানা। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে ঘন জঙ্গলের মধ্যেও আর একটি পুকুর ছিল। তারও অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তৃতীয় ও চতুর্থ পুকুরটির জল কোনও কাজে লাগত না। দত্ত বংশের পূর্বপুরুষরা চারটি পুকুর একসঙ্গে কেন কাটিয়েছিলেন জানি না। অবশ্য এই চারটি পুকুরে ছোট-বড় নানাপ্রকার মাছ ছিল অফুরন্ত। প্রতিটি পুকুরের একটি কোণে, ছোট খালের মতো করে একটি নালা কাটা থাকত, বর্ষার জল প্রবেশের সুবিধার্থে এবং নৌকো করে ঘাটে যাতায়াতের প্রয়োজনে।

আমাদের এই বাড়ির পরিধি ছিল বেশ বড়। এর মধ্যেই ছিল শতাধিক সুপারি গাছ। এই গ্রামেরই দেপাড়ার একজন, অর্থের বিনিময়ে, এই গাছগুলির সুপারির জন্য অগ্রিম দাদন ঠাকুরমার কাছে দিয়ে রাখতেন। সুপারি পাকলে তিনি নিজে গাছে চড়ে সুপারিগুলি কেটে নীচে ফেলতেন। পরে তা কুড়িয়ে নিয়ে যেতেন। এই মধ্যবয়সী লোকটির গাছে চড়া এবং সুপারি কাটা আমাদের মতো স্বল্পবয়সীদের কাছে মজার ব্যাপার ছিল। তিনি পাটের দড়ি দু পায়ে জড়িয়ে, তার সাহায্যে দু হাতে গাছটি ধরে বাঁদরের মতো লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে যেতেন, পিঠে বেঁধে নিতেন সুপারির গুচ্ছগুলি কাটার উপযোগী ধারাল দা। একটি গাছের সুপারির ছড়া কাটা হয়ে গেলে নীচে নামতেন না। গাছটির গা ধরে নিজেকে সুদ্ধ দোলাতেন। সেই দোলায়মান গাছটি পরবর্তী গাছটির মাথার কাছাকাছি আসামাত্রই অত্যন্ত সহজে দড়িবাঁধা দুটি পা ও দুই হাতে সেই গাছটির ডগা অবলীলায় ধরে ফেলতেন। এই ভাবে পরপর বেশ কয়েকটি গাছের সুপারির ছড়া কাটা হলে সেদিনের মতো শরীরকে বিশ্রাম দিতে তিনি মাটিতে নামতেন। সুপারিবাগানে গিয়ে তাঁর সেই সুপারি কাটার দৃশ্য আমি আগ্রহের সঙ্গে দেখতাম। আমি সেই বাল্য বয়সেই তাঁর মতো দু পায়ে দড়ি বেঁধে সুপারি গাছে উঠতে শিখেছিলাম। কিন্তু একেবারে শেষ প্রান্তে উঠতে সাহস কোনওদিনই পেতাম না। মাঝপথেই নেমে পড়তাম।

বাড়ির আর একটি অংশে হত পাট গাছের চাষ। গ্রীষ্মে পাটগাছের ক্ষেতের জমিতে জল জমত না। মাটি শুকনো থাকত বলে, আমরা—বাড়ির বালকবালিকারা সেখানে গিয়ে কখনও কখনও লুকোচুরি খেলতাম। পাট ও সুপারি গাছগুলি ঠাকুরমা সংগ্রহকারীদের দাদন দিলেও সামান্য কিছু রাখতেন বাড়ির জন্য। নারকেল গাছও ছিল বেশ কিছু। বাড়ির গাছের নারকেল থেকে তেল বাড়িতেই তৈরি করাতেন ঠাকুরমা। সেই টাটকা নারকেল তেলের গন্ধ, ছোটবেলায় খুব ভাল লাগত, মনে হত যেন খাঁটি ঘি।

বাড়ির খোলা উঠোনের দক্ষিণে ছিল টিনের চালার বৃহৎ একটি ঘর। তার মাটির মেঝে ছিল প্রায় তিন-চার ফুট উঁচু। তার উত্তর ও পূর্বে ছিল কাঠের দুটি দরজা একটি জানলা। সে যুগে ওখানকার গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থের বাড়ির দেওয়াল কখনও মাটি দিয়ে তৈরি হত না, পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের মতো। পাটকাঠি বা বাঁশের চাচা পাত দিয়ে বেড়াগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেওয়ালের মাপ অনুযায়ী তৈরি করে, বাড়ির চারকোণে এবং মাঝখানে যে মোটা ও লম্বা গাছের গুঁড়িগুলি থাকত বাড়ির চালাকে ধরে

রাখার জন্য, তার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হত। কাদামাটির সঙ্গে গোবর মিশিয়ে বাড়ির বেড়াতে, বালি ও সিমেন্টের পলেস্তারার মতো পুরু করে লাগানো হত। এর উপরে চুনকাম করার মতো কোনও ব্যবস্থা ছিল না এ অঞ্চলের বাড়িগুলিতে। কেবল মাটি গোলা জল দিয়ে মাঝে মাঝে নিকিয়ে দেওয়া হত,—যে ভাবে মাটির বেড়াগুলি পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের গ্রামের মেয়েরা নিকিয়ে থাকে। এ অঞ্চলের বাড়ির এই বেড়া চালা প্রভৃতি বাঁধার কাজে পাট বা নারকেলের দড়ি ব্যবহার করতে কখনও দেখিনি। জঙ্গলে আপনা থেকেই প্রচুর সরু বেত গাছের লম্বা লতা জন্মাত। এই লতাগুলি কেটে এনে ঘরামিরা সেগুলি খুব পাতলা করে চিরে নিয়ে, তাকেই দড়ির মতো ব্যবহার করত। এগুলি ব্যবহারের একমাত্র কারণ বোধহয় ঘাসের বা নারকেলের দড়ি অপেক্ষা এগুলি অনেক বেশি টেঁকসই। টিনের চালার বড় ঘরটি ছিল বাড়ির বালকবালিকা ও বয়স্কদের রাতের শোবার ঘর। ভিতরে একদিকের বেড়ার সঙ্গে লাগানো থাকত বড় বড় কয়েকটি কাঠের পালঙ্ক। তাতে একদল শুতেন, আর একদলকে শুতে হত মেঝেতে। স্বতন্ত্র কোনও গুদামঘর ছিল না। এই বৃহৎ ঘরটির ভিতর দিকে টিনের চালার নীচে কাঠের পাটাতনের আচ্ছাদন থাকত। টিনের চালার নীচে কাঠের আস্তরণটি পূর্বোক্ত গাছের খুঁটির উপর নির্ভর করত। আমাদের এই ঘরটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মানুষের প্রবেশের উপযোগী একটি ফাঁক থাকত। সেই ফাঁক দিয়ে পাটাতনের উপরে যেতে হত। পাটাতনের উপরে যাওয়ার সুবিধার্থে ওই কোণের নীচ থেকে পাটাতনের উপর পর্যন্ত মই ছিল। এটির বর্ণনা এত বিশদ করে দেবার কারণ হল, এই পাটাতনের উপরটিই ছিল আমাদের পরিবারের নির্ভরযোগ্য বিরাট গুদামঘর। পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিস ওখানেই স্থান পেত। গ্রামের বাড়ির এই অংশটিকে সকলেই বলত 'কার'। কাঠের কয়েকটি আলমারি সহ একটি বিরাট কাঠের সিন্দুক ছিল।

ঠাকুরদার কবিগানের দল

ঠাকুরমা বলতেন, আমাদের ঠাকুরদার একটি কবিগানের দল ছিল। তিনি মাঝে-মাঝেই তাঁর গানবাজনার দল নিয়ে বাইরে যেতেন কবিগান করতে। বাড়িতে কখনও ফিরতেন অধিক রাত্রিতে। সকলেই তখন নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু সেই রাত্রেই কাঠের উনুন জ্বালিয়ে সব কিছু রান্না করে তাঁকে গরম গরম খাওয়াতে হত।

ঠাকুরমা নিজে লেখাপড়া জানতেন না। তাঁকে বাংলায় রামায়ণ মহাভারত পুরাণ পাঁচালি প্রভৃতি থেকে সুর করে পড়ে শোনাতে হত। একবার তিনি উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুকাল সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আমাদের বাজাপ্তি গ্রামেরই একজন ডাক্তার তাঁর সেই ব্যাধি সারিয়েছিলেন। আমার এখনও মনে পড়ে, ডাক্তারটি তাঁকে বাড়ির শোবার খাটের কিনারায় বসিয়ে তাঁর জলভর্তি উদরে যন্ত্র দিয়ে কীভাবে ফুটো করেছিলেন এবং পিচকারির মতো পেটের জমা জল বেরিয়ে এসে মেঝেতে রাখা একটি বড় গামলা সেই জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে ঠাকুরমা সারাদিনই সংসারের নানা কর্মে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন তিনি। ওই একবার ছাড়া, অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখিনি তাঁকে। উদরীজনিত অসুস্থতার সময় তাঁকে আমি রামায়ণ মহাভারত আদ্যোপান্ত পড়ে শুনিয়েছি। সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোতে এই কাব্য দুটি ছন্দোবদ্ধ ভাবে একপ্রকার সুর করে আমাদের পিসতুতো দিদিরা ঠাকুরমাকে পড়ে শোনাতেন। আমিও তাঁদের মতো সেই ছন্দোবদ্ধ সুরসহ পড়তে শিখেছিলাম। আমাকেও যখন ঠাকুরমা বলতেন পড়ে শোনাতে, উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করে বা গেয়ে তাঁকে শুনিয়েছি। খুব মনোযোগ দিয়ে ঠাকুরমা তা শুনতেন। ঠাকুরমাকে শোনাতে গিয়েই বাংলা ভাষায় সমগ্র রামায়ণ মহাভারত আমি তখনই প্রথম আদ্যোপান্ত পড়বার সুযোগ পাই। আমি নিজেও সেইভাবে সুরে ছন্দে আবৃত্তি

করে শুনিয়ে খুব আনন্দ পেতাম। এই দুটি বৃহৎ কাব্য আমার মনে বরাবরের মতো তখনই বসে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে এই দুটি মহাকাব্য আমার আর কখনও পড়বার দরকার হয়নি।

ঠাকুরমা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ মহিলা। বাড়িতে বড় রকমের পুজোর প্রচলন ছিল না বটে, কিন্তু সে যুগের গ্রামাঞ্চলের হিন্দুসমাজে যত প্রকার ব্রতপার্বণ ছিল তার প্রায় সবই আমাদের বাড়িতে তিনি প্রতি মাসেই করতেন। একবার আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে ছিলাম। সে মাসের একটি ব্রত অনুযায়ী পুজোর আয়োজন তিনি করেছিলেন। ঠাকুরপাড়ার পূজারী ব্রাহ্মণ এসে অধিকবেলায় পুজো শেষ করার পর বাড়ির সকলে পুজোর প্রসাদ মুখে দিয়েছিলেন। সেবার ঠাকুরমা, বংশের প্রথম নাতি, আমাকে তাঁর ওই ব্রতের সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি সম্মত হই। কিন্তু শর্ত ছিল, পুজো শেষ হবার আগে আমি কিছু খাব না। খালি পেটে থাকতে হবে। পুজোর মুখরোচক প্রসাদের বহর দেখে আমি সহজে ঠাকুরমাকে আমার সম্মতি জানাই। যখন বাড়িতে পুজোর কাজ চলছে তখন আমরা অল্পবয়সী পিসতুতো ভাইবোনেরা মিলে সেখানে বসে না থেকে বাড়ির চারদিকের গাছের পাকা ফল খেয়ে সময় কাটিয়েছিলাম। সব থেকে বেশি খেয়েছিলাম গাব গাছের পাকা ফল। ইতিমধ্যে পুজো শেষ। ঠাকুরমা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমার খোঁজে। কারণ আমি সকাল থেকে ব্রতপালনের জন্য অভুক্ত আছি। সে কথা শুনে আমার সঙ্গীরা মজা করে বলল, পেট ভরে কেউ ফল খেলে তাকে কি অভুক্ত থাকা বলে ? ঠাকুরমা তাদের কথা কানেই তুললেন না। আমাকে আদর করে ভাল কাপড়জামা পরিয়ে পুজোর যাবতীয় প্রসাদ পেট ভরে খাইয়ে, তার পরে অন্যদের ডাকলেন প্রসাদ নেবার জন্য।

ঠাকুরমার সঙ্গে বাড়িতে থাকতেন আমাদের সেজ পিসিমার বড় ছেলে জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, আমার সমবয়সী তাঁর এক ভাই। পিসিমাদের বাড়ি ছিল মাইল দু-এক দূরে 'ছানার চর' নামে একটি গ্রামে। ছোট গ্রাম। সেখানকার এক দত্ত বংশে পিসিমার বিবাহ হয়েছিল। আমাদের পিসেমশাই ও তাঁর দাদার পরিবার নিয়েই সেখানকার দত্তদের এই পাড়াটি। পিসিমার বড় ছেলে জিতেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়েছিল আমাদের বাড়ি থেকে। তিনি বিবাহ করতে যাবার কদিন আগে থেকেই বাড়িতে একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। আত্মীয়স্বজনের সমাগম হয়েছিল। আমাদের গ্রামের দত্তপাড়া, ভুঁইয়াপাড়া ও আরও দু-একটি পাড়ার মহিলারা সমবেত হয়ে বিবাহের যাবতীয় কাজেকর্মে ঠাকুরমাকে সাহায্য করেছিলেন। প্রয়োজনীয় বাসনপত্র দরকারমতো সংগ্রহ করা হয়েছিল অন্য পাড়া থেকে। আমি সব থেকে আনন্দ পেতাম দুপুরে খাওয়াদাওয়ার শেষে যখন মহিলারা দল বেঁধে বিবাহের গান গাইতেন। এই দলের নেত্রী ছিলেন একজন বয়স্কা মহিলা। তিনি রাম-সীতা, শিব-পার্বতীর বিবাহ-বিষয়ক গান জানতেন। তিনি এক পঙ্‌ক্তি গাইতেন, বাকিরা সমস্বরে সমচ্ছন্দে তার পুনরাবৃত্তি করতেন। আমাদের আত্মীয়দের মধ্যেও অনেকে এই দলে যোগ দিতেন। গান হত খুবই উচ্চকণ্ঠে। আমরা বালকদল আমাদের দিদিদের গানের নকল করে তাদের চটাতে চেষ্টা করতাম। বউদিকে যখন বিবাহের পর পিসতুতো দাদা বাড়িতে নিয়ে এলেন তখন তাঁর বয়স বোধহয় দশ কিংবা এগারো। আমার সঙ্গে আমার ভাই সাগরময় এবং সমবয়সী পিসতুতো ভাই-এর সঙ্গে বউদির খুবই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল অল্পদিনের মধ্যে। তিনি ছিলেন বেঁটেখাটো এবং বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। বিবাহিতা বধূর মতো শাড়ি পরে, মাথায় সর্বদা ঘোমটা টেনে থাকতে হলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল সমবয়সী ভাইবোনের মতো। তিনি বেশ শান্ত প্রকৃতির ছিলেন বলে আমাদের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলবার চেষ্টা করতেন সেই বয়সেই, এমনকী বাড়িতে পিসতুতো দিদি ও বোনেদের সঙ্গেও। ঠাকুরমার সঙ্গেও তিনি নানা কাজ সানন্দে করতেন। আমরা দুই ভাই আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে যেদিন শান্তিনিকেতন অভিমুখে যাত্রা করতাম সে দিন আমাদের বউদির চোখেও জল লক্ষ করতাম। ঠাকুরমা ও দিদিদের সঙ্গে তিনিও আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন। এইরূপ বেদনাযুক্ত স্নেহপূর্ণ বিদায়ের দিনের কথা যখন ভাবি তখন এই বউদির কথা বিশেষ করে মনে মড়ে।

আরম্ভেই বলেছি, আমার জন্মমাস হল বৈশাখ। ২৪ বৈশাখে ভূমিষ্ঠ হবার কিছুকাল পূর্বে, বেশ

কিছুদিন ধরে সন্ধ্যার আকাশে হ্যালির ধূমকেতু নিয়মিত উদিত হত। লম্বা জ্বলন্ত আলোর মতো তার পুচ্ছটি ছিল সকলের কাছে দর্শনীয় এবং বিস্ময়কর। গ্রামের ছোট বড় সকলেই তা দেখতেন। কিন্তু আমাদের ঠাকুরমার ধারণা ছিল, এই ধূমকেতু দেখা আমার মায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। আমার মা বলতেন, ঠাকুরমা তাঁকে বারেবারেই সাবধান করে দিতেন এই বলে যে, তিনি কোনওপ্রকারে ধূমকেতুটি যেন না দেখেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে মা যদি তা দেখেন, তবে তা হবে আগত সন্তানের পক্ষে অমঙ্গলজনক। আমাদের বাড়ির আর সকলেই দেখেছেন। পাড়ায় পাড়ায় ধূমকেতু দর্শন থেকে কেউ বাদ পড়েননি। এই পরিবেশের মধ্যে ধূমকেতু দেখার প্রতি মার মনের আগ্রহ দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তিনি ধূমকেতুটি কয়েকবার দেখেছিলেন লুকিয়ে, কাউকে না জানিয়ে। ঠাকুরমা জানতেন আমার মা তাঁর নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলছেন। এর জন্য তাঁর আঠারো বছরের পুত্রবধূর প্রতি তিনি খুবই প্রসন্ন ছিলেন।

আমাদের টিনে ছাওয়া বাড়ি

গ্রামে আমাদের টিনের চালা বড় ঘর ছাড়া আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর ছিল। আর ছিল একটি রান্নাঘর। এর এক দিকে কাঠের উনুনে রান্না হত। এরই অন্য দিকে একটি মাচার উপরে থাকত উনুনের জন্য চেরা কাঠ। এই মাচাটিতেই আমাদের পিসতুতো দাদা ও বউদির রাত্রে শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কেবলমাত্র চালা দেওয়া একটি ঘরে ছিল ঢেঁকি। তাতে বাড়ির মহিলারাই ধান কুটে বাড়ির প্রয়োজনীয় চাল তৈরি করতেন। কুলো দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে চালগুলি যত্ন করে রাখতেন। আমাদের মা ঢেঁকির কাজে বেশ দক্ষ ছিলেন। ঢেঁকির কাজে সর্বদাই একজন মহিলা পিছনদিকে, কাঠের দু পাশের খুঁটিতে বাঁধা বাঁশের লগি ধরে দাঁড়িয়ে নিয়মিত ঢেঁকির পিছনে পায়ের চাপে সামনের অংশটি উঠিয়ে ছেড়ে দিতেন। নীচে গর্তের মতো একটি জায়গায় ধান নেড়ে ছেড়ে দেওয়া হত হাতে করে। সেখানে একজন বসে হাতের আঙুলের সাহায্যে ধানগুলি সেই গর্তের মধ্যেই উল্টে-পাল্টে দিতেন, ঢেঁকির মাথাটির মোটা গোঁজ গর্তের মুখে পড়বার পূর্বে। এ কাজটি বাড়ির মহিলারাই করতেন। আমার মা এই কাজ করতে করতে একদিন একটু অসাবধান হয়েছিলেন। যথানির্দিষ্ট সময়ে হাতের আঙুলটি সরিয়ে আনার পূর্বেই ঢেঁকির মাথার মোটা গোঁজটি তাঁর আঙুলে এসে প্রবল বেগে পড়ে এবং মাঝের আঙুলটি থেঁতলে যায়। মা যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন। যিনি পায়ের দিকে কাজ করছিলেন তিনিও ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন। বাড়ির সকলে ছুটে আসেন। আমার দাদা, অর্থাৎ পিসিমার বড় ছেলে যান গ্রামের ডাক্তারের কাছে। ইতিমধ্যে মার আঙুলটির রক্তপাত বন্ধের জন্য যা করণীয় তা করার চেষ্টা করেছেন ঠাকুরমা। ডাক্তার এসে ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার করে, প্রয়োজনীয় ওষুধ লাগিয়ে ভাল করে বেঁধে দিলেন। মার সাধারণ স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। ডাক্তার প্রতিদিন এসে হাতের আঙুলের পরিচর্যা করে দিতেন। তাঁর বিধিনিষেধ পালন করায় প্রায় পনেরো-কুড়িদিন পরে মা পুনরায় সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠেন।

আমাদের টিনে ছাওয়া বড় ঘরটি ছাড়া আর সবকটি ঘর ছিল চালাঘর। কাশ গাছের সরু পাতার মতো একপ্রকার লম্বা ঘাসে ছাওয়া। এই ঘাস এ অঞ্চলের জঙ্গলে প্রচুর জন্মাতো।

বাড়ির বড় ও ছোট ঘরের মেঝে তৈরি হত মাটি দিয়ে। পূর্বেই বলেছি টিনের চালা বড় ঘরটির মেঝে মাটি থেকে উঁচু ছিল প্রায় তিন-চার ফুট। অন্য ঘর কটির মেঝে ছিল দু ফুটের মতো উঁচু। বর্ষার দিন ছাড়া শুকনো দিনে এই মেঝের বাইরের দিকে গোবর মাটি মেশানো জলে নেকড়া দিয়ে মাঝে মাঝে ঠাকুরমা, মা ও পিসতুতো দিদিরা নিকিয়ে দিতেন। ঠাকুরমার আর একটি বাঁধা কাজ ছিল। তিনি অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে একটি মাটির বা পিতলের বড় গামলায় গোবর জল গুলে

বাড়ির বাইরে উঠোনের সর্বত্র ছিটিয়ে দিতেন। তাঁর সেই জলের ছপছপ শব্দে অনেকেরই ঘুম ভেঙে যেত। আমিও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে পড়তাম এই শব্দে।

এখানকার গ্রামাঞ্চলের প্রতিদিনের পায়খানার ব্যবস্থাটিও বর্ণনার যোগ্য। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে ছোট বড় নানা গাছ ও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি জলপূর্ণ ছোট খাল ছিল। তার এপাড় থেকে ওপাড় পর্যন্ত একটি মোটা গুঁড়ি পাতা থাকত। তার সঙ্গেই বাঁধা ছিল দুপাশে পোঁতা গাছের মোটা ডালের সঙ্গে একটি বাঁশের লগি। আমরা বালকেরা চেষ্টা করতাম একসঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সারতে। কারণ ওইরূপ জঙ্গলের মধ্যে একলা যেতে অল্প বয়সের আমরা কেউ সাহস করতাম না। আমাদের পক্ষে এই সময়ে দর্শনীয় ছিল খালের জলে ছোট ছোট নানাপ্রকার মাছের চলাফেরা। কই মাগুর খলসে পুঁটি জাতীয় মাছগুলি আমাদের নীচেই নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করত। বাড়ির মহিলাদের জন্য ছিল অন্যত্র একটি নির্জন অঞ্চল, চট দিয়ে ঘেরা।

নৌকো ভ্রমণ ও নাটকাভিনয়ের অভিজ্ঞতা

ওই অঞ্চলে বর্ষার প্রকোপ সাধারণত বেশি। বর্ষার সময় খালবিল ধানের ক্ষেত এবং গ্রামের পুকুরগুলি সবই জলে পূর্ণ থাকত। শরৎকালে আশ্বিন মাস থেকে তার জল ধীরে ধীরে কমতে থাকত। বর্ষা থেকে শরৎ নৌকো করে যাতায়াত করত গ্রামবাসীরা দূরে কোথাও যাওয়া-আসার প্রয়োজনে। পায়ে হাঁটার চেয়ে নৌকোয় যাওয়াটাই আরামের হত, বিশেষ করে পরিবারের অনেকে মিলে কোথাও যাবার সময়। এইরূপ নৌকো ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার একবার হয়েছিল দুর্গা পুজোর সময়। আমি তখন ছিলাম ঠাকুরমার কাছে। মা সেই সময় মামার বাড়ির সকলের সঙ্গে ভ্রাতা সাগরময়কে নিয়ে চাঁদপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে নোয়াখালি জেলার প্রান্তে 'করপাড়া' নামে মামাদের আদি বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানকার একটি বাড়ির দুর্গাপুজো খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে হত। চিত্তবিনোদনের জন্য গ্রামের যুবকেরা নাটকের অভিনয় করতেন মঞ্চ বেঁধে। যাঁরা পড়াশোনা বা চাকরি করতেন কলকাতায় বা অন্য শহরে, তাঁদের কাছে খবর পাঠানো হত, কী বই সেবারে মঞ্চস্থ হবে এবং তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হত, কাকে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকই সাধারণত বাছা হত। সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হত, সম্ভব হলে নাটকটি যেন দোকান থেকে কিনে নিয়ে তাঁদের অংশটি মুখস্থ করে রাখেন। কারও কারও চরিত্র হাতে লিখেও পাঠানো হত। নাটকের নারীচরিত্রের অভিনয় করতেন যুবকেরা। শুনেছি, নারীচরিত্রে আমাদের এক মামার সাজপোশাকে, চলনে-বলনে দর্শকেরা খুবই আমোদিত হতেন।

মামার বাড়ির গ্রামে আমার মা ভ্রাতা সাগরময়কে নিয়ে সেখানকার দুর্গাপুজোর ধুমধামের মধ্যে আনন্দ করছেন, আর আমি ঠাকুরমার কাছে থাকার দরুন সে সব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ভেবে ঠাকুরমা স্থির করলেন, আমার পিসতুতো দাদা জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে মামার বাড়ির পুজো দেখতে পাঠাবেন। ইতিমধ্যে বাজাপ্তির দত্তপাড়ার পুজোদালানের ঘটপুজোর সমারোহ ষষ্ঠী ও সপ্তমীর কিছুটা দেখা হয়ে গেছে। সপ্তমীর দিন দ্বিপ্রহরের খাওয়াদাওয়া সেরে, দাদা ও আমি একটি নৌকো নিয়ে এক মাঝি সহ, তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম মামাদের 'করপাড়া' গ্রামের অভিমুখে। নৌকো ছাড়ল, আমাদের বাড়ির উত্তর দিকের সীমানার শেষে, পূর্ত দপ্তর নির্মিত পায়েহাঁটা রাস্তার নীচে ধানক্ষেত থেকে। তখন ধানগাছগুলির গোড়া থেকে অর্ধেক জলমগ্ন, বাকি অর্ধেক জলের উপরে। জল প্রায় এক হাঁটুর উপরে। মাঝি আমাদের নিয়ে বাঁশের লগিতে নৌকো ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলল। এইবারের এই নৌকো ভ্রমণ আমার মনে স্থায়ী দাগ এমনভাবে কেটে গিয়েছিল যে তার কথা আজও ভুলতে পারিনি। সেদিনের সেই দক্ষ মাঝি বাঁশের লগিতে ঠেলে ধানক্ষেত দিয়ে যখন নৌকোটিকে নিয়ে

যাচ্ছিল তখন নৌকোটির ছই-এর সরসর শব্দ এবং একপ্রকার গন্ধ প্রাণভরে উপভোগ করেছিলাম। কখনও কখনও ছোট এবং বড় রৌদ্রোজ্জ্বল বিলের মধ্যে যখন নৌকো প্রবেশ করত তখন আবার তার আর এক ভিন্ন চেহারা। বিলের কয়েকপ্রকার ছোটবড় জলজ ঘাস, শালুক ফুল, ছোট ছোট একপ্রকার কচুরিপানা প্রভৃতি চোখে পড়ত। অগভীর নিস্তব্ধ পরিষ্কার বিলের জল। কয়েকপ্রকার ছোট ও মাঝারি মাছের খেলা মন দিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। নৌকো যখন কোনও জল ভর্তি খালে প্রবেশ করত, তখন দেখা যেত আর এক দৃশ্য। দু'পাশের গাছগুলি তাদের ডালপালা ও পাতায় খালটিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে দেখা যেত ছোট ও বড় ধরনের ঘাট। সেখানে নৌকো বাঁধা হত। গ্রামের নরনারীরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, বাসন মাজছে। গ্রামের বাড়িঘরও দেখা যেত। কখনও কখনও কোনও গঞ্জের গায়ে লাগা বাজার দোকানপাটও চোখে পড়ত। ধানের ক্ষেত ও বিলের অগভীর জলের আলে আমাদের নৌকো আটকেও গিয়েছে। নৌকোর মাঝি এবং আমাদের দাদা হাঁটুর লুঙ্গি ও কাপড় তুলে জলে নেমে নৌকোটিকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে আবার তাতে উঠে বসতেন। সবটাই আমার কাছে খেলার মতো মনে হত। সূর্যাস্তর পর আমাদের নৌকো আর এগোত না। মাঝি ও দাদা ভাল করেই জানতেন, এ ধরনের নির্জন খালের অন্ধকারে চলা ডাকাতির কারণে নিরাপদ নয়। সন্ধ্যার মুখে আমরা খালের গায়ে লাগা কোনও একটি গ্রামের নৌকোর ঘাটে আমাদের নৌকো ভিড়িয়েছিলাম। সঙ্গে রান্না করার বাসনপত্র কিছু ছিল। গ্রামের দোকান থেকে রসদ কিনে, খালের পাড়ে কাঠের উনুনে রান্না করে, পেট ভরে খেয়ে, রাত্রে সেই নৌকোতে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। ঘাটে আরও নৌকোসহ মাঝি-মাল্লারা থাকায় সেই রাতটি নিরাপদেই কেটেছিল। পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে, মুড়ি বাতাসা দই কিনে জলযোগ করে পুনরায় লগি ঠেলে মাঝি নৌকোকে নিয়ে এগিয়ে চলল। সেদিন শহর থেকে বহু দূরে, ছোট-বড় গাছ-গাছড়ায় পূর্ণ নানা দৃশ্য দেখার যে সুযোগ পেয়েছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, শরতের রৌদ্রস্নাত ধানক্ষেত, জল, বাতাস, গাছপালায় বেষ্টিত সহজ সরল গ্রামবাসীরা শান্তিতে পরমানন্দে রয়েছে। তখন আমি অল্প বয়সী বালক, সব দিক খুঁটিয়ে দেখবার বা বোঝবার বোধ তখন অবশ্যই আমার ছিল না। কিন্তু কেন জানি না, তখনই সব মিলিয়ে গ্রামের সেই শান্ত পরিবেশ মনে যে আনন্দের ঢেউ তুলেছিল তা বর্ণনাতীত।

ভোরে নৌকোতে রওনা হয়ে সকালের দিকে মামার বাড়ির গ্রামে পৌঁছলাম। মামার বাড়িতে সকলেই আমাদের দেখে খুবই খুশি। পুজোর আনন্দে গ্রামের সকলেই মত্ত। গ্রামের এক বাড়িতে ছিল মোষবলির প্রথা। লোকে লোকারণ্য তার পুজোর প্রাঙ্গণ। সেখানে ঢাকঢোল কাঁসর বাদ্যের বাদকদের সমাবেশ। দেখলাম, বড় আকারের কাঠের একটি হাড়িকাঠ সেখানে প্রোথিত রয়েছে। তার গায়ে লাল সিঁদুর লেপা। পালোয়ানের মতো কিছু লোক একটি সুপুষ্ট মোষকে দড়িতে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এল। মোষটির তখন অসহায় অবস্থা। প্রথমে তার মাথাটি হাড়িকাঠে দিয়ে, পিছন থেকে মোটা দড়িতে বাঁধা পা প্রবল টানে টেনে রেখে, মোষের গলা ও ঘাড়ে ভাল করে ঘি মাখানো হল। মোষটির নড়াচড়ার কোনও ক্ষমতা তখন আর নেই। বেচারার গলা দিয়ে কোনও শব্দও বের হচ্ছে না। হঠাৎ প্রবল শব্দে ঢাকঢোল-কাঁসি বেজে উঠল। দেখা গেল একটি মানুষকে। তার দক্ষিণ হস্তে একটি বিরাট খাঁড়া। উচ্চদেহী সেই বলশালী মানুষটি বিরাট খড়্গ হাতে অবলীলায় ঢাকের বাদ্যের ছন্দে চলে আসছে। দেখেই বোঝা গেল সে প্রচুর মদ্যপান করেছে। তার চোখ দুটি রক্তবর্ণ। একটি আঘাতে মোষের গলাটি তাকে কাটতে হবে। প্রবল বেগে প্রায় লাফিয়ে পড়ে, দুই হাতে খড়্গটি ধরে সে যখন মোষের গলার উপর কোপ মারল তখন সঙ্গে সঙ্গে সহজেই তা দ্বিখণ্ডিত হল। দেখে মনে হল ঘাতক যেন লাউ বা কলাগাছের কাণ্ড বলি দিল। সঙ্গে সঙ্গে মোষের গায়ের রক্ত ঘাতক ও অন্যরা নিজেদের কপালে গায়ে মেখে প্রায় পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে ঢাকের তালে তাল মিলিয়ে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে। ঘাতককে দেখে মনে হল, বিশাল খড়্গটি হাতে করে সে যেভাবে তার মত্ততা প্রকাশ করে চলেছে, তাতে নিশ্চয়ই কোনও অঘটন যে-কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। তার কয়েকজন শক্তিশালী সঙ্গী তাকে কোনওপ্রকারে ধরে ফেলে, তার

হাত থেকে খড়্গাটি নিয়ে তাকে একস্থানে বসিয়ে মাথায় গায়ে জল ঢেলে তার হুঁশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

বিজয়া দশমীর পর পিসতুতো দাদা নৌকোর মাঝি সহ একই পথে গ্রামে ফিরেছিলেন। আমি ফিরেছিলাম মার সঙ্গে প্রথমে চাঁদপুরের মামার বাড়িতে। সেখান থেকে সকলে মিলে নিজেদের গ্রামে ফিরলাম ঠাকুরমার আশ্রয়ে।

তখনকার আমাদের বাড়িতে আরও দুটি দ্রষ্টব্য উল্লেখযোগ্য। দেখতাম, ধানের তুষ ভর্তি একটি মাটির ছোট গামলা। তুষগুলি সর্বদাই ধিকিধিকি জ্বলত। বাড়িতে সে যুগে দেশলাইয়ের ব্যবহার ছিল না। এক বিঘত লম্বা, সরু সরু একগুচ্ছ পাটকাঠির ডগায়, বোধ হয় গন্ধক জাতীয় কিছু লাগানো থাকত। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো, হারিকেন জ্বালানো বা রান্নাঘরের উনুন জ্বালানোর সময় ওই কাঠিগুলির ডগা ওই তুষের আগুনে ধরার পর জ্বলে উঠলে, সেই আগুনের সাহায্যেই অন্যগুলিকে জ্বালানো হত।

বাড়িতে ঠাকুরমার ছিল একটি দুধেল গাভী। গাভীটি ছিল খুবই শান্ত প্রকৃতির। একজন নমঃশূদ্র ভৃত্য গাভীটির দেখাশোনা করত। যেখানে ঘাসের অভাব ছিল না সেখানে তাকে দড়িতে বেঁধে দিত। ভৃত্যটি গাভীর দুধ দোহন করে দিলেও ঠাকুরমাকে প্রায়ই দেখতাম, দুই হাঁটুতে একটি বাসন রেখে দু' হাতে খুব সহজেই দুধ দোহার কাজ করছেন। ঠাকুরমার কাছে আমাদের মা-ও তা ভালভাবেই শিখে নিয়েছিলেন। তাঁকেও এ কাজ করতে দেখেছি।

জোঁকের উপদ্রবে জেরবার

এখানকার গ্রামাঞ্চলে দুই প্রকার জোঁকের খুব উপদ্রব ছিল। একপ্রকার হল জঙ্গলের। এগুলি আকারে ছোট হত, রং লালচে। ঘাসের সঙ্গে বা গাছের পাতায় ছিল এদের স্থান। অসতর্ক হয়ে চলার সময় প্রায়ই এরা পায়ে এসে বসত কিংবা গাছের পাতা থেকে কখন যে গায়ে এসে পড়বে, তা বোঝা যেত না। কিছু পরে বুঝতে পারতাম—তাদের রক্ত চোষার সময়। দ্বিতীয় আর এক রকমের ছিল জলের জোঁক। রং তাদের কালো, আকারে একটু লম্বা ও মোটা। একবার জলের জোঁকের শিকার আমাকে হতে হয়। তখন আমি তিন-চার বছরের মাত্র। আমাদের বাড়ির দিঘির জলে এক দ্বিপ্রহরে আমি ও আমাদের পিসতুতো ভাই, জামাকাপড় ঘাটের পাশে খুলে উলঙ্গ হয়ে জলে নেমেছি। তখন গ্রীষ্মকাল। ঘাটের ডান-পাশে আমাদেরই একটি নৌকো জলে ডোবানো ছিল। নৌকোর উপর দিকটার খানিকটা ছিল জলের উপরে। জলে ঝাপাঝাপি করতে করতে আমার কী দুর্বুদ্ধি হল, নৌকোটির কাঠের পাটাতনের উপরে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ মনে হল, আমার মলদ্বারে কিছু ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমি কিছু না বুঝেই এক হাতে সেটিকে ধরেও ছিলাম। কিন্তু আমার হাত পিছলে সেটি অতি সহজেই ভিতরে চলে গেল। আমি সে কথা আমার পিসতুতো ভাইকে বলামাত্রই সে বলল, নিশ্চয় জলের জোঁক আমার পেটে ঢুকেছে। শুনে আমার কী ভয়। কাঁদতে কাঁদতে সেই উলঙ্গ অবস্থায় বাড়িতে এসে ঠাকুরমা, মাকে জানালাম কী করে আমার পেটে জলের জোঁক প্রবেশ করেছে। ঠাকুরমা তা শুনে খুব যে চিন্তিত হলেন তা মনে হল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পানে খাবার চুন জলে গুলে একটি গ্লাসে করে আমাকে খাইয়ে দিয়ে উঠোনে উলঙ্গ অবস্থায় উবু হয়ে বসে থাকতে বললেন। মিনিট দশেক পরে দেখি একটি কালো জোঁক আপনা থেকেই মাটিতে পড়ে গেল। দেখার পর আমার কী স্ফূর্তি, এতক্ষণ যে সকলের সামনে আমি উলঙ্গ ছিলাম, সে কথা আমার মনেও ছিল না। এবারে তা মনে পড়ে গেল। তখন কী লজ্জা! তাড়াতাড়ি একটি গামছা জড়িয়ে নিয়ে ধাতস্থ হলাম। কান্নাও থেমে গিয়েছিল। পরে আমার পিসতুতো ভাই আমাকে বলল, জোঁকটিকে শাস্তি দিতে হবে। দুটি খেজুরের কাঁটা জোগাড় করে এনে আমাকে বলল, জোঁকটির দুই

দিকের দুই প্রান্তে ফুটিয়ে যথাসম্ভব টান করে মাটিতে কাঁটা দুটি পুঁতে রাখতে। তার কথামতো তাই করেছিলাম। রোদে অনেকক্ষণ সেটি সেইভাবে ছিল। পরে সেটিকে ফেলে দেওয়া হয়।

আমাদের বাড়ির গাভীটির নাকে বা পায়ের ক্ষুরে জঙ্গলের জোঁক প্রায়ই বসত। সেগুলিকে চেষ্টা করে ফেলে দিত ঠাকুরমার ভৃত্যটি।

এ অঞ্চলে দেখা যেত লালমুখো বাঁদর। তারা দলবেঁধে গৃহস্থের বাড়ির ফলগাছে চড়াও হত। ক্ষতি করত খুব। কালোমুখো হনুমান কখনও দেখিনি।

পুকুরের পাড়ে এবং অন্যত্র এমন কিছু জংলা শাক আপনা হতেই জন্মাত যা সংগ্রহ করে ভাজা এবং তরকারি রান্না করা হত। দু'বেলা ভাত খাবার সময় তা খেতাম। খুবই মুখোরোচক হত।

জঙ্গলের সরু বেতের লতায় আঙুরের মতো থোকে থোকে ফল ধরত। যাকে বলা হত বেতইন। সেই ফল পাকলে, তার খোসা ছাড়িয়ে নুন ও লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে খেতে খুবই ভাল লাগত। আমাদের ওই গ্রামাঞ্চলে সে যুগে টম্যাটো ফুলকপি বাঁধাকপির চল ছিল না।

বোলপুর থেকে বাজাপ্তি : আসা-যাওয়ার মাঝখানে

প্রথম মহাযুদ্ধের যুগে, অর্থাৎ ১৯১৪ সাল থেকে প্রতিবারই গ্রীষ্মের ও পুজোর ছুটির সময় আমরা আমাদের গ্রামে যেতাম ঠাকুরমার কাছে। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদলকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'জন শিক্ষকের দায়িত্বে পাঠানো হত। আমার বাবার উপর থাকত চাঁদপুর, আগরতলা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চট্টগ্রামের ছাত্রদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব। অন্যজনের উপর থাকত, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার দিককার ছাত্রদের দায়িত্ব। চাঁদপুরের স্টিমার ঘাটে এবং ট্রেনের টারমিনাসে ছাত্রদের আত্মীয়রা কেউ কেউ আসতেন, সেখান থেকে ট্রেনে তাদের নিয়ে যেতে। দলে ছাত্রসংখ্যা জনা-পনেরোর বেশি হত না।

সে যুগের যে-কোনও ট্রেনগাড়িতে মোট চারটি শ্রেণী থাকত। যেমন, প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী। তারপর ইন্টার ক্লাস নামে একটি শ্রেণী, আর সবশেষ শ্রেণী—তৃতীয় বা থার্ডক্লাস। আমরা সর্বদাই এই তৃতীয় শ্রেণীতে দলবেঁধে যেতাম। সে যুগে তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া-আসার সময় এ যুগের মতো যাত্রীর ভিড়ের জন্য কষ্ট পেতে হত না। মালপত্র নিয়ে আরামেই বসে যাওয়া যেত। বোলপুর থেকে বাঁশি বাজিয়ে আমাদের ট্রেন যখন চলতে শুরু করত তখন দলের কয়েকজন খাতা-পেনসিল নিয়ে তৈরি হত প্রত্যেকটি স্টেশনের নাম লিখে রাখবার জন্য। এইভাবে বর্ধমান হয়ে ব্যান্ডেল থেকে নৈহাটি পর্যন্ত কোনও স্টেশনের নামই খাতায় বাদ পড়ত না।

আমরা প্রতিবারই বোলপুর থেকে সকালের একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়তাম। সেটি বর্ধমান হয়ে ব্যান্ডেলে পৌঁছবার পর বাক্স-পেটরা নিয়ে সেখানে নেমে অন্য একটি গাড়িতে নৈহাটি পর্যন্ত যেতাম। সেখানে নামতে হত দ্বিপ্রহরে। এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রাত্রিতে 'চট্টগ্রাম মেল' নামে যে-গাড়িটি সেখানে আসত তাতে চড়তাম। এই মেল গাড়িটি প্রত্যুষে যাত্রীদের পৌঁছে দিত গোয়ালন্দের স্টিমার ঘাটে। একবার আমার বাবা নৈহাটি শহরে তাঁর অতি পরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে পূর্বে যোগাযোগ করে স্থির করেছিলেন, দ্বিপ্রহরে তাঁরই একটি আমবাগানে পিকনিক হবে। সেখানে খিচুড়ি সহ অন্যান্য পদ রান্না করে আমরা সবাই খাব। রান্নার বাসনপত্রাদির ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছিলেন। সঙ্গে আমাদের মা ছিলেন, সেই কারণে রান্নার জন্য কোনও ভাবনা ছিল না। আমরা ছেলেরা মিলে রান্নার কাজে মাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলাম। পেটভরে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াদাওয়া করে, বাসনপত্রাদি ধুয়ে, যেখান থেকে সেগুলি এসেছিল, সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। মাটিতে উপবেশন করে কলাপাতায় আমাদের ভোজন সম্পন্ন হয়েছিল।

মধ্যাহ্নভোজন সাঙ্গ করে স্টেশনে এসে বিশ্রামের পালা। কিন্তু, নৈহাটি স্টেশনে মালগাড়ি এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের আনাগোনা, যাত্রীদের ওঠানামা ইত্যাদি বাল্য বয়সের ঔৎসুক্যবশত দেখতে দেখতে

সময় কখন যে চলে যেত বুঝতে পারতাম না। সন্ধ্যার পর আর একবার স্টেশনে খাওয়া হত। চট্টগ্রাম মেল ট্রেনটি আসবার পর জিনিসপত্র নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে সকলে একই সঙ্গে জায়গা করে নিতাম। এই গাড়িতে একটু যে ভিড় হত না তা নয়, তবে বসে যেতে পারতাম। এর মধ্যেই ঘুমোতেও চেষ্টা করতাম।

এই যুগে যাত্রীবাহী ট্রেনে বিজলিবাতি ছিল না। গাড়ির আলো জ্বলত গ্যাসে। সন্ধ্যার মুখে লোক এসে প্রত্যেক কামরায় গ্যাসের বাতিগুলি জ্বালিয়ে দিত। স্টেশনে দেখতাম কেরোসিনের বাতি। অতি প্রত্যূষে পদ্মা নদীর পাড়ে গোয়ালন্দ স্টেশনে ট্রেনটি এসে থামত। বাঁধানো কোনও প্ল্যাটফর্ম ছিল না। বালির উপর গাড়ির লাইন পাতা। নির্দিষ্ট স্থানে এসে ট্রেনটি দাঁড়াবার পর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কামরা থেকে নামাওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি রেলকর্মীরা জুড়ে দিত। ইন্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা দরজার-বাইরের লোহার ডাণ্ডা ধরে নামত-উঠত। কুলি পাওয়া যেত প্রচুর। আমাদের ছাত্রদলে সাধারণত একটি করে বাক্স, শতরঞ্চি-বালিশ থাকত। সেগুলি ছাত্ররা নিজেরাই বহন করে স্টিমারে উঠত। আমাদের মালপত্র একটু বেশি থাকত বলে বাবা কুলি নিতেন।

চাঁদপুরগামী স্টিমারটি, ঢাকাগামী স্টিমারের অপেক্ষা বড় ছিল। দুটি স্টিমারই ঘাটে পাশাপাশি নোঙর করা থাকত। চট্টগ্রাম মেলের যাত্রীরা যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে স্টিমারের উপরতলায় বিছানা পেতে বাক্স-পেটরা রেখে জায়গা দখল করত। আমরাও তাই করতাম। স্টিমার গোয়ালন্দ থেকে ছাড়ত বেলা প্রায় একটার সময়। সেই কারণে, সকালে গোয়ালন্দের ঘাটের বালির চরে পরপর বাঁশের বেড়া দেওয়া খড়ে ছাওয়া খাঁটি দেশি হোটেলে জলযোগের পর আমরা বালির চরে ঘুরে বেড়াতাম। নদীতে ও ঘাটে নানা আকারের নৌকো দেখে সময় কাটাতাম। দেশি হোটেলে আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থার কথা বলে রাখা হত। খাবার আগে পদ্মা নদীতে অনেকে বেশ স্ফূর্তিতে স্নান সেরে নিত। পূর্ববঙ্গের ছাত্ররা প্রায় সকলেই সাঁতার দিতে পারত। আমি ও আমার ভাই সাগরময় তা পারতাম না বলে জলে নামতাম না। তবে বাবার নির্দেশে কেউ নদীর গভীরে যেত না। পাড়েই স্নান করত।

দেশি হোটেলে ভাত ডাল পদ্মার ইলিশ এবং আরও অন্য দু'-এক প্রকার মাছের ঝোল, তরকারি ও ভাজা খেতে দিত। হোটেলের রান্নার স্বাদে আমাদের খুবই তৃপ্তি হত, বিশেষ করে বরিশালের মুসুরির ডাল, পদ্মার ইলিশের ঝোল। স্টিমার ছাড়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে 'ঢাকা মেল' নামে একটি ট্রেন সকালে কলকাতার শিয়ালদা থেকে ছেড়ে দুপুরে গোয়ালন্দে পৌঁছত। হুড়মুড় করে ওই গাড়ির যাত্রীদের বেশ কিছু আমাদের স্টিমারে, বাকিরা ঢাকাগামী স্টিমারে চড়তেন।

গোয়ালন্দ থেকে স্টিমার ছাড়ার পর আমরা সাধারণত শুয়ে বা বসে বিশ্রাম করতাম না। দোতলায় যাত্রীতে ভর্তি হয়ে যেত। নীচের প্রথম তলায় ছিল আমাদের কাছে ঔৎসুক্য নিয়ে দেখার মতো অনেক কিছু। জাহাজের প্রথম তলার মধ্যভাগে ছিল বিরাট যন্ত্র বা ইঞ্জিন। সেটি তেলের দ্বারা বা কয়লার দ্বারা চালিত হত কি না এখন মনে পড়ছে না। বিরাট সেই স্টিমারের বাইরের দু'ধারের কাঠের পাটাতনে তৈরি চাকা দুটি ঘুরত। তার সাহায্যেই স্টিমারটি চলত। আমাদের কাছে ইঞ্জিনটা বিশাল যন্ত্রদৈত্যের মতো মনে হত। স্টিমারে প্রথম তলা বহন করত নানাধরনের মাল।

নদী দিয়ে স্টিমারটি যখন এগিয়ে চলত, তখন দেখতাম তার সামনের দিকে একটি লোক দাঁড়িয়ে নদীতে দড়ি ফেলে জলের গভীরতা কোথায় কতখানি, উচ্চ স্বরে তার সংকেত দিত—উপর তলার ছাউনির উপরে স্টিমারটির চালককে। সেই চালককে বলা হত স্টিমারের সারেং।

সন্ধ্যার সময় জ্বলে উঠত সামনে বৃহৎ একটি সার্চলাইট। এর আলোতে বহু দূর পর্যন্ত নদীর জল, নদীর চর, নদীর আশপাশের পাড় ও গ্রামগুলিকে পরিষ্কার দেখা যেত। একটি লোকের দ্বারা সেই আলোটি পরিচালিত হত। আমরা খুবই আগ্রহ নিয়ে ওই সার্চলাইটের কাছাকাছি থেকে চারিদিকের দৃশ্য দেখে সময় কাটিয়ে দিতাম। স্টিমারটি যখন চাঁদপুর শহরের বন্দরে এসে পৌঁছত তখন রাত্রি হয়ে যেত।

এই বন্দরটি যেখানে, তার বেশ খানিকটা আগে থেকেই পদ্মা নদীর নাম বদলে হয়ে যেত 'মেঘনা'। এখানে 'ডাকাতিয়া' নামে ছোট নদী এসে মিশেছে, চাঁদপুর শহরটিকে দু' ভাগে ভাগ করে। এর পশ্চিম পারে ছিল নানাশ্রেণীর- মানুষের ঘন লোকবসতি, স্কুল, দোকানপাট, বাজার, আদালত, মন্দির, মসজিদ এবং ছোটবড় জলাশয়। অপর পারে ছিল ইংরেজ পাটব্যবসায়ীদের বিরাট কারখানা ও বড় বড় গুদামঘর। চাঁদপুরে এই বন্দরটির সঙ্গেই ছিল অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই অঞ্চলের ট্রেনের টারমিনাস। স্টিমার থেকে নেমে যারা উত্তর দিকে কুমিল্লা, আগরতলা, শ্রীহট্টের দিকের যাত্রী, তাদের জন্য গাড়ি যেমন অপেক্ষা করত তেমনই আর একটি গাড়ি অপেক্ষা করত চট্টগ্রামের দিকের যাত্রীদের জন্যে। গাড়ি দুটি যাত্রীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করত মধ্যরাত্রে।

চাঁদপুর শহরে ছিল আমাদের মা-র পৈতৃক বাড়ি, শহরের প্রায় মধ্যস্থলে। কুলির সাহায্যে মালপত্র নিয়ে মাইলখানেক হেঁটে মামার বাড়িতে যাওয়া যেত। আবার বন্দর থেকে নৌকো করে ডাকাতিয়া নদী ধরে অল্প কিছুটা উজানে আসার পর একটি ছোট খালে ঢুকে মামার বাড়ির সংলগ্ন দিঘির অপর প্রান্তে নামতাম। মাঝি মালপত্র মাথায় করে বাড়িতে নামিয়ে দিত। এখানে দাদামশায়, দিদিমা, মামা, মামি, মাসিদের পরম আদরযত্নে দু'চারদিন কাটিয়ে বাবা ও মা-সহ আমরা যেতাম আমাদের গ্রামে। বাবা ছিলেন এ অঞ্চলের মানুষের খুবই পরিচিত। তাঁর সঙ্গে অনেকেই দেখা করতে আসতেন। বাবাও যেতেন বিভিন্ন পল্লীতে।

চাঁদপুর স্টিমার ঘাট থেকে এবারে আমরা চড়তাম বরিশালগামী একটি ছোট স্টিমারে। মেঘনা নদীর পূর্ব দিক ধরে যাবার পর 'নসিমপুর' নামে একটি ছোট স্টিমার-স্টেশনে এটি প্রথম থামত। সেখান থেকে পূর্ব দিকে হাঁটাপথে তিন মাইলের পর বাজাপ্তি গ্রাম। ঠাকুরমা নসিমপুর স্টেশনে গ্রাম থেকে একটি পালকি পাঠিয়ে দিতেন। আমি ও সাগর প্রথম দিকে মা-র সঙ্গে পালকিতে চড়ে আমাদের বাড়িতে আসতাম। বাবা আসতেন পালকির সঙ্গে পায়ে হেঁটে। যখন আমরা বেশ একটু বড় হয়েছি তখন বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটেই যেতাম। তখন মা-র জন্য ঠাকুরমা একটি ডুলি পাঠিয়ে দিতেন। তাতে একজনের বসবার মতো স্থান থাকত। পালকির বাহক থাকত দু'জন করে মোট চারজন, আর ডুলির জন্য মাত্র দু'জন। পালকি বা ডুলির বাহকরা চলার সময় ছন্দোবদ্ধ কথা ও সুরে শব্দ তুলে পথ চলত। আজ এত বছর পর বাহকদের সেই কথা আর মনে নেই। চাঁদপুরে ফেরবার সময়েও ঠাকুরমা একই ব্যবস্থা করতেন। বাবা আমাদের বাড়িতে কয়েক দিন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তেন চাঁদপুর কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণের ডাকে। তাঁকে যেতে হত সভাসমিতিতে যোগদানের জন্য। ছুটির শেষে বাড়িতে ফিরে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, আমাদের নিয়ে চাঁদপুর হয়ে শান্তিনিকেতন অভিমুখে যাত্রা শুরু করতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল থেকে যুদ্ধের শেষ বছর পর্যন্ত, প্রতি গ্রীষ্মের এবং পুজোর ছুটিতে নিজেদের গ্রামে আমরা যেতাম। বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতির পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এসে, আমাদের দেশের এই অঞ্চলের আর এক রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ পেতাম, সেই বয়সেই আমাদের মনকে তা খুবই আকৃষ্ট করত। সেই বাল্য বয়সে আমার জন্মস্থানের কথা আজকের এই বৃদ্ধ বয়সে যখন স্মরণ করি তখন সেই মাধুর্যময় পরিবেশের ফেলে-আসা দিনগুলির কথা ভেবে মন খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের ঠাকুরমা

শুরুতে ঠাকুরমার সম্পর্কে কিছু বলেছি। এবারে বিস্তারিতভাবে তাঁর সম্পর্কে জানাব। ঠাকুরমার জন্ম উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে। মাত্র ছ' বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কৈশোরে পা দিয়ে গৃহস্থালির যাবতীয় কাজে তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন। ঠাকুরমা ছিলেন বহু সন্তানের জননী। শেষ

যৌবনে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের ঠাকুরদাদা দেহত্যাগ করেন। ঠাকুরমা তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে অনেককেই হারিয়েছিলেন তাদের শিশু বয়সে। শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাঁর দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। সংসারে আর্থিক অনটন থাকলেও তাঁর কন্যাদের দুটি কারণে বিবাহের জন্য অসুবিধায় পড়তে হয়নি। প্রথমত, ঠাকুরমার মতো পিসিমারা ছিলেন সুন্দরী ও ফর্সা। দ্বিতীয় কারণটি হল, সে যুগে কৌলীন্যের তখনও পর্যন্ত বিশেষ মর্যাদা ছিল। আমাদের মতো কুলীন কায়স্থঘরের সুন্দরী কন্যার বিবাহে পাত্রপক্ষই প্রায় সব ব্যয় বহন করে কন্যাকে সসম্মানে নিয়ে যেতেন। এক পিসেমশায় ছিলেন সে যুগে সে-অঞ্চলের প্রথম বি.এ. পাস যুবক। তিনি ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করতেন। অন্য পিসিদের বিবাহ হয়েছিল ত্রিপুরা ও নোয়াখালির অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে। এক পিসিমার বিবাহ হয় বাজাপ্তি গ্রামের অনতিদূরে হানারচর গ্রামে, যাঁর কথা আগে বলেছি। আমাদের বাবা ছিলেন ঠাকুরমার চতুর্থ সন্তান, দ্বিতীয় পুত্র। ঠাকুরমার প্রথম পুত্রের বিবাহ হয়েছিল চাঁদপুর শহরের নিকটবর্তী গ্রামের ছোট এক জমিদারের কন্যার সঙ্গে। তাঁরা উভয়েই তখন অল্প বয়সী। আমরা আমাদের এই জেঠামশায়কে দেখবার সুযোগ পাইনি। তিনি আমার জন্মের অনেক বছর আগেই বালিকাবধূকে রেখে পরলোকগমন করেন। জেঠাইমাকে দেখেছি। তিনি আমার মা-র চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। আমাদের বাজাপ্তি গ্রামের বাড়িতে তিনি থাকতেন না, থাকতেন তাঁর বাপের বাড়িতে। শান্তিনিকেতনেও একবার এসে কিছুকাল কাটিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। একবার চাঁদপুর থেকে নৌকোযোগে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে গিয়েছিলাম। ক'দিন খুবই আদরযত্নে তাঁর কাছে থেকে ফিরে এসেছিলাম।

আগেই উল্লেখ করেছি, ঠাকুরমা ছিলেন অত্যন্ত দেবদেবীর ভক্ত। সারা বছর গ্রামের বাড়িতে তিনি 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'-এর মতো ব্রত ও পূজার্চনাদি নিয়ে দিন কাটাতেন। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশের গুরুর কাছে বৈধব্যজীবন পালনের দীক্ষা নিয়েছিলেন। প্রতিদিন দুপুরে স্নান সেরে তিনি নিজ হাতে কাদামাটি দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ছোট একটি শিবলিঙ্গ রচনা করে, ফুল-বেলপাতা-চন্দন-ধূপধুনো দিয়ে তার পুজো করতেন। তিনি মুখে মৃদুস্বরে পুজোর মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। তারই সঙ্গে দুই হাতের আঙুল চালনা করে কয়েকপ্রকার মুদ্রাও করতেন। এর তাৎপর্য যে কী, তা বুঝিনি। তিনি মুখে যে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতেন, হয়তো হাতের আঙুলের মুদ্রার দ্বারা তারই অর্থ প্রকাশ করতেন। দু'গাল ফুলিয়ে ডান হাতের বুড়ো ও কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে তাতে আঘাত করতেন এবং খুবই নিম্নস্বরে বোম্ বোম্ শব্দ উচ্চারণ করতেন। দীক্ষাগুরু তাঁর সেই মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ তাঁকে শিবলিঙ্গের পুজোর যে প্রকরণটি শিখিয়েছিলেন, এই পুজোর সময় সেই নিয়মের কোনও অন্যথা বা ব্যতিক্রম ঠাকুরমা কোনওদিন করেননি।

একবার তাঁর ইচ্ছা হল, আমাকে তিনি তাঁর গুরুগৃহে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর বংশের প্রথম নাতিটিকে তাঁর গুরু আশীর্বাদ জানিয়ে প্রার্থনা করবেন। আমি ঠাকুরমার গুরু ও গুরুর বাড়ি দেখবার উৎসাহে তাঁর হাত ধরে কয়েক মাইল পদব্রজে গুরুর বাড়ি উপস্থিত হলাম। ঠাকুরমা তাঁর গুরুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। আমিও সেই দেখে সেইমতো প্রণাম করি। গুরু আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। আমি যে শান্তিনিকেতনবাসী এবং আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথা তিনি কিছু কিছু জানতেন। তিনি ঠাকুরমাকে আমাদের পরিবার, শান্তিনিকেতন এবং আমাদের বাবার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সেদিন দুপুরে তাঁর বাড়িতে আহারের পর একটু বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরে যাবার কথা ছিল। খাবার সময়ে বাড়ির গৃহিণীরা আমাদের খেতে আসতে বললেন। আমাদের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল গুরুর বাড়ির ঢেঁকিঘরের এক প্রান্তে। সেখানে কলাপাতা ও পিঁড়ি পেতে আমাদের খেতে হয়েছিল। ঠাকুরমার জন্য নিরামিষ রান্না, আমার জন্য তার সঙ্গে ছিল দু'তিন রকমের মাছের তরকারি, ঝোল প্রভৃতি।

গুরুর বাড়ির খাবারঘরে, থালাবাটিতে খাবার ব্যবস্থা করা হয়নি দেখে আমার মনে খটকা লাগে। আমি নীরবে ঢেঁকিঘরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিকটবর্তী পুকুরঘাটে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে বাড়িটির চারদিক ভাল করে দেখলাম। পরে গুরুর পায়ে প্রণামান্তে বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করলাম।

পথে আমার মনেব অভিমান বা ক্রোধ ঠাকুরমার কাছে প্রকাশ করে বললাম, আপনার গুরুর বাড়ি বা গুরুর কাছে আর আমি কখনও আশীর্বাদ নিতে যাব না। তিনি কেন ওঁদের খাবারঘরে, ওঁদের থালাবাটিতে আমাদের খাওয়ালেন না! কেন তিনি ঢেঁকিঘরে কলাপাতে খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন! আমার কথা শুনে ঠাকুরমা অত্যন্ত অপ্রস্তুত। নানাভাবে আমাকে বোঝাতে লাগলেন, তাঁর গুরু উঁচুবংশের ব্রাহ্মণ। অব্রাহ্মণদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই হল দেশের নিয়ম। সুতরাং ঢেঁকিঘরে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে আমাদের প্রতি তাঁরা অন্যায় করেননি।

ঠাকুরমার জীবনটিকে প্রকাশ করবার চেষ্টার কারণটি হল, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে পূর্ববাংলার হিন্দু সমাজব্যবস্থায় বিধবা নারীরা তাঁদের পুত্রকন্যা পরিজন সহ যেভাবে গ্রামে জীবনযাপন করতেন, তার কিঞ্চিৎ পরিচয়দান আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। তার দ্বারা সে যুগের সামাজিক চিত্রের পরিচয় কিছুটা পরিস্ফুট করবার হয়তো সুযোগ পাওয়া যাবে। আরম্ভেই বলেছি ঠাকুরমা বাজাপ্তি গ্রামের অবস্থাপন্ন দত্তবংশের প্রথম সন্তান। ছ' বছর বয়সে বিবাহের পর থেকেই বাপেরবাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির বয়স্কা মহিলাদের তত্ত্বাবধানে বিবাহিত বধূর আচরণবিধি পালনের শিক্ষা তিনি পেতে থাকেন। কৈশোরে পা রাখার কিছু পরে সন্তানের জননী হন। কিন্তু দুই পরিবারের গৃহিণীদের জন্য নবজাত সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ত না। ঠাকুরদার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরমাকে বহু সন্তানের জননী হতে হয়েছিল। ঠাকুরদা নাকি সংসারের প্রতিদিনের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। সেই কারণে ঠাকুরমা সব দিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে, যৌবনের পর থেকেই, সংসার চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। লেখাপড়া না জানলেও, তাঁর স্বামী সন্তান ও বিষয়সম্পত্তি সহ সংসারের যাবতীয় কর্ম পরিচালনার সময় নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে নিজেকে তৈরি করে ধীরে ধীরে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমার জন্মের কয়েক বছর পর, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে দেখে বুঝতে শিখি, সেই বয়সেও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কর্মশক্তি কত প্রবল ছিল। কোনও অবস্থায় কখনও তাঁকে ক্লান্ত দেখিনি।

প্রতিদিন শিবলিঙ্গ পুজো শেষ করে নিজের হাতে রান্না করে তিনি খেতেন। আতপ চালের ভাত, সঙ্গে নানাপ্রকার শাকসবজি দ্বারা নিরামিষ তরকারি ঝোল কিংবা শুক্তনি। মুসুরের ডাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। রাত্রে খেতেন দুধ ও খই, তার সঙ্গে পাকা সবরি কলা। কবরী নামে আর একপ্রকার পাকা কলা সেই অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও ঠাকুরমা তা খেতেন না। সাদা চিনি, সাদা নুন খাওয়া সে যুগের বিধবাদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। সাদা চিনির পরিবর্তে কাশীর চিনি নামে একপ্রকার লালচে চিনি এবং সৈন্ধব লবণ নামে একপ্রকার খনিজ লবণ তিনি খেতেন। বাড়ির গাছের নানারকম পাকা ফল তিনি বাড়ির সকলকে পেট ভরে খাইয়ে তবে নিজে খেতেন রাত্রির আহারের সময়। পুজো-পার্বণের দিনে নিয়মিত উপবাস করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল। সারা দিন উপবাসে থেকে রাত্রিতে ফলাহার করতেন দেখেছি। কয়েকবার তিনি চাঁদপুর থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ এসে ট্রেনে কলকাতায় এসেছেন। সেই সময়ে এবং শান্তিনিকেতনে যাবার সময়েও মুখে কিছু দিতেন না। এমন কী জলও না। তার একমাত্র কারণ ছিল স্টিমার ও ট্রেনের যাত্রাপথে নানা ধর্মের নানা জাতের নরনারীর সংস্রবে এবং ট্রেন ও স্টিমারের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে খাওয়াদাওয়া ঠাকুরমার মতো বিধবাদের পক্ষে সে যুগে নিষিদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণমাত্রই তাঁর কাছে ছিলেন সম্মাননীয়। বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রাহ্মণকেও তিনি প্রণম্য বলে মান্য করতে দ্বিধা করতেন না। পায়ে চলার রাস্তার একপাশে খুঁটির সঙ্গে লম্বা দড়িতে বাঁধা কোনও গরু ঘাস খাবার জন্য রাস্তার অন্য দিকে চলে গেলে, রাস্তার এ পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত মাটির উপর পড়ে থাকা দড়িটি তিনি ডিঙিয়ে না গিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকতেন। পথচারী ঠাকুরমাকে ওই অবস্থায় দেখে গরুটিকে খুঁটির দিকে টেনে এনে দেবার পর তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেই পথ ধরে যেতে পারতেন। এর কারণ যা জেনেছিলাম, তা হল, গরু শিবের বাহন, তাঁর মতো শিবভক্ত গরুর গলার দড়ি টপকে যাওয়াকে তিনি পাপ কাজ মনে করতেন।

একবার তিনি গ্রামের একদল মহিলা তীর্থযাত্রী সহ চট্টগ্রামের সন্নিকটে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের

শিবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। ফিরে আসবার সময় সেই পাহাড়ের একটি কালোপাথর সঙ্গে নিয়ে আসেন। বাড়ির উঠোনের এক দিকে সেটি যত্ন করে রেখে দিলেন। কিন্তু সেটিকে পুজো করতেন না। ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে দেশের বাড়িতে গিয়ে সেই পাথরটি প্রথম চোখে পড়ে। ঠাকুরমার কাছে এটির ইতিহাস জানতে চাইলে তিনি যা বলেছিলেন তা খুবই কৌতুকপ্রদ। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে পূজার্চনার পর মন্দিরের পাণ্ডারা ঠাকুরমাকে বুঝিয়েছিল, ওই মন্দির-সংলগ্ন পাহাড়ের গায়ে ছোটবড় যতগুলি পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এগুলি হল দেবী দুর্গা-কর্তৃক নিহত অসুরদের হাড়। এগুলি কুড়িয়ে বাড়িতে রাখলে পরিবারের কোনও অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। ঠাকুরমা সরল মনে পাণ্ডাদের কথায় বিশ্বাস রেখে মাঝারি আকারের ওই পাথরটি নিয়ে আসেন, তাঁর পুত্রকন্যা, নাতিনাতনিদের মঙ্গলার্থে।

আমার বাবা

আমার বাবার জন্ম ১৮৮৪ সালে, সে-যুগের পূর্ববঙ্গের অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রাম— বাজাপ্তিতে। আর্থিক অনটনের মধ্যেই তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। পিতা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হারিয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়। বিধবা ঠাকুরমা বাড়ির জায়গাজমির নানারকমের ফসল, নানাপ্রকার ফলমূল, পুকুরের মাছ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে তাঁর সংসার চালাতেন। গ্রামের এইরূপ পরিবারের ছেলে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়ে, গুরুদেবের অন্যতম শিষ্যরূপে শান্তিনিকেতনবাসী হলেন এবং সেখানকার কর্মজীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকারে সক্ষম হন, তার ইতিহাস একটু বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করছি, আমার জীবনের বিকাশের সূত্রে।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে প্লেগ রোগ মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো মানুষের মৃত্যু ঘটে এই রোগটির কবলে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির হাত থেকে জনগণকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকার প্লেগ দমনের সার্বিক দায়িত্ব ব্রিটিশ সেনাবিভাগের হাতে ন্যস্ত করেন। কিন্তু সেনানীরা সে-যুগের ভারতীয় জনসাধারণের মানসিক ও সামাজিক দিকের কথা বিবেচনা না করে এমন কিছু আইনকানুন চালু করলেন যা সকলের কাছে অত্যাচাররূপে প্রতিভাত হল। ফলে শিক্ষিতসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

মহারাষ্ট্রে সে যুগের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'মরাঠা' এবং 'কেশরী' পত্রিকায় সেনাদের কার্যকলাপের বিবরণ প্রকাশ করে সুতীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। সেগুলি পড়ে শিক্ষিত যুবসমাজের মন এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে পুণে শহরের প্লেগ দমনের ভারপ্রাপ্ত এক ইংরেজ অফিসার ও তাঁর সহকর্মীকে দু'জন মরাঠি যুবক হত্যা করে। এই ঘটনায় ইংরেজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে, প্রথমেই বালগঙ্গাধর তিলককে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। আদালতের বিচারে তাঁর দেড় বছরের মতো সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সারা দেশের শিক্ষিতসমাজ এর বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছিল। ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলে তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিচারের দাবি করা হল। এর বিপুল খরচের প্রয়োজনীয় অর্থ চাঁদা করে সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সমগ্র দেশ জুড়ে। শোনা যায়, বাংলার চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্ব গুরুদেব নিজে স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন প্রিভি কাউন্সিলে ভারতবাসীর আবেদন অগ্রাহ্য হল। তিলকের কারাদণ্ড বহাল রইল। তিনি কারাগারে বন্দি রইলেন।

এতেও ভারতের ইংরেজ শাসক খুশি হননি। সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজন যুবকের ফাঁসি হল। এর সঙ্গে যুক্ত হল Sedition Bill নামে একটি আইন, যার দ্বারা দেশি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা সহজে সম্ভব হয়েছিল। ভারতের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস এর

প্রতিবাদে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের সঙ্গে ধীরে ধীরে দেখা দেয় দেশের শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজের মনে রুদ্রপন্থার প্রতি ঝোঁক। বাংলার শিক্ষিত সমাজও এই আন্দোলনের প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেনি। তাদের মধ্যেও দেখা দিল ইংরেজদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব, যুবকদের মনে দেখা দেয় প্রতিহিংসার প্রবণতা। তখনকার বাংলার শিক্ষিত সমাজের মনে মহারাষ্ট্রের আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সেই সময় বাবা বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসে পড়াশোনার জন্য ঢাকা শহরের Imperial Seminar নামে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কোনও এক পরিচিতজনের আর্থিক সহায়তায়, ১৯০২ সালে এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঢাকা শহরের শিক্ষিত সমাজও মহারাষ্ট্র প্রদেশে ইংরেজ শাসকের নানাবিধ দমনমূলক কার্যকলাপে খুবই উত্তেজিত। ঢাকার এইরূপ উত্তেজনাকর পরিবেশে বাবা নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ রাখতে পারেননি। এনট্রান্স পরীক্ষার পরেই তিনি মেতে উঠেছিলেন সেই আন্দোলনের প্রভাবে। এর পরেই ১৯০৩ সালে ইংরেজ শাসক যখন সে যুগের বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করবার প্রস্তাব দেশবাসীর কাছে প্রথম প্রকাশ করল তখন বাঙালি শিক্ষিতদের মনে তার প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পেল প্রবল বিদ্বেষ। ১৯০৫ সালে বাংলা দ্বিখণ্ডিত যখন হল তখন দলে দলে যুবক গ্রামে-শহরে স্বদেশি প্রচার এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের প্রচারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেন। আমাদের পিতা তখন স্বেচ্ছায় এবং যুবকোচিত উৎসাহে যোগ দিলেন অনুশীলন সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক দলে। ছাত্রাবস্থায় সুবক্তা হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন বলে তিনি দায়িত্ব নিলেন ঢাকা এবং সে যুগের ত্রিপুরা জেলার গ্রামে ও শহরে—স্বদেশি এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের প্রচারের। গ্রামের এবং শহরের নরনারী সর্বত্রই খুবই অনুপ্রাণিত হতেন, সুদর্শন অল্পবয়সী এই যুবকের বক্তৃতা শুনে। সে যুগের সর্বত্রই ভদ্রবংশের মহিলারাও বিনা শিক্ষায় তাঁদের সহজাত বুদ্ধি ও আভিজাত্যে বাবার বক্তব্য শুনে অনুপ্রাণিত হতেন। সেই যুগেই, সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী যুবকদের কার্যকলাপ খুবই বৃদ্ধি পায়। তাঁরা শাসক সম্প্রদায়ের হিংসাশ্রয়ী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। দেশপ্রেমের আবেগে তাঁদের মন যেভাবে জাগ্রত হয়েছিল, তারই প্রেরণায় কারাবাস করা, ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া, পুলিশের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে সানন্দে বরণ, ইত্যাদি তাঁরা মহানন্দে করতে পেরেছিলেন। বাবার প্রতি পুলিশের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু কারাগারে নিক্ষেপ করবার মতো কোনও কার্যকলাপের পরিচয় না পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সেই কারণে তিনি তাঁর স্বদেশি প্রচার ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের অভিযান অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

পিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশের গোপন রিপোর্ট

অনেকেরই ধারণা যে আমাদের পিতা বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের যুগে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই কারণে এক গবেষণা গ্রন্থে বলা হয়েছে "বিপ্লবী দলের প্রাক্তন সদস্য কালীমোহন ঘোষ"। তিনি যে সে দিনের সশস্ত্র বিপ্লবী দলে ছিলেন না তা জানা যায়, "F. Roddis" নামে তখনকার "Eastern Bengal and Assam"-এর Superintendent of Police-incharge কর্তৃক লিখিত, ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত পিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কিত একটি গোপন রিপোর্ট থেকে। তাতে বলা হয়েছে :

"Confidential.
History Sheet (No. 22).
of
Kalimohan Ghosh.
Compiled in Special Branch,
Eastern Bengal and Assam.

Kalimohan Ghosh is the son of Dina Nath Ghosh, of village Bajapti, Chandpur, Tipera district, and is a prominent member of the Anti-Circular Society of Calcutta. In fact, he seems to be the most noteworthy member of that Society in this province. The Society is reported to consist of some 7,000 members, no member of which is taken into full confidence until his loyalty to "the cause" has been tested for two years. Every member of the Society has a card bearing a peculiar symbol, but such cards are only given to those who pass the two year's test. The principal meeting place of the Society is reported to be close to College Street Kalibari, Calcutta, where more than a bigha of land has been fenced in with bamboos, and where the members are taught various military evolutions.

Kali Babu generally moves about between the district of Tippara and Noakhali, but is often touring about with some of the most violent agitators, e.g., Sachindra Prasad Basu, another member of the Society.

Kali Babu is about 26 years of age (1909), and is said to be a member of the Mymensingh Surhid Samiti. He has passed the Entrance Examination and read up to the F.A. Standard in the Seminary School, Dacca.

In his endeavours to promote the aims of the Anti-Circular Society, Kali Babu has appeared as a cloth hawker in the streets of Dacca.

He assumes various aliases, the principal of which are—

Kali Prasanna Ghosh.

Kali Mohan Basu (or Bose)

Kali Mohan Sen.

Kali Babu has no fixed residence in Calcutta, but while there he lived with Krisna Kumar Mitra, the editor of Sanjibani newspaper, where he met Sachindra Prasad Bose (deported under Regulation III of 1818).

Kali Babu fallows no regular occupation, and is dependent on his father-in-law (Dina Nath Bosu, pleader of Chandpur).

Relatives in Government Service—

(1) Mon Mohan Dutta, Sub-Inspector of School. Comilla (Uncle).

(2) Chandra Kanta Chaudhuri, Collector's office, Comilla (Uncle)."

সে যুগে গুরুদেব কর্তৃক রচিত স্বদেশি পর্যায়ের গানগুলিকে ইংরেজ সরকার কোন দৃষ্টিতে বিচার করতেন তারও পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের ওই রিপোর্টে। তাতে আছে :—

"On 11th December 1908, in connection with the Naria dacoity, Chandra Kumar (alias Mohan) Ghosh's house at Idilpur, Faridpur, was searched and a letter (exibit 36) was found from one Kali Mohan (Probably Kali Mohan Ghosh, agent of the Anti-Circular Soeicty), Kali Mohan wrote: "I have come to Rabi Babu at Kushtea (probably Rabindra Nath Tagore, author of numerouse seditious songs),"

ওই রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, আমাদের পিতা ১৯০৯ সালে গিরিডিতে ছিলেন। যে মাসে চাঁদপুরে এসে তাঁর শ্বশুর মহাশয়, দীননাথ বসুর কাছে ছিলেন কিছুদিন। তার পর বাজাপ্তিতে নিজের বাড়িতে ঠাকুরমার কাছে ছিলেন, আমাদের মাতাকে নিয়ে। পিতা যে গিরিডি বাসকালে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা নিয়ে, পরে প্রচারক হিসেবে কাজ করতেন, তার সংবাদও ওই রিপোর্টে আছে। যেমন :

"During the week ending 18th September 1909 he was at Comilla. It was understood that there was some likelyhood of his becoming a Brahmo preacher."

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম হলেও কিছুকাল পরে পিতার মনে ওই সমাজের প্রতি নিষ্ঠার যে অভাব দেখা দিয়েছিল তা জানা যায় ১৩২১ সালে ১১ই মাঘের ব্রাহ্মোৎসবের দিন, তাঁর ডায়েরিতে লেখা উক্তি থেকে। তাতে বলেছেন :

'আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন চলিতেছিল। Individual ধর্মের উপর আস্থা হারাইতেছিলাম। মনে হচ্ছিল মন্দিরে এত বক্তৃতা কেন। ঘরের পাশে দেশের সর্বত্র যে দুঃখ বেদনা তাহার প্রতি উদাসীন থাকিয়া চারিদিকের আকাশ বাতাসের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিলে কোথায় পাইব।

'আমাদের দেশের স্বার্থপর আধ্যাত্মিকতা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। এমন কি আমার মনে হচ্ছিল যাঁরা প্রতিবেশীর দুঃখ দৈন্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তি খুঁজিতে চায় তাহার অপেক্ষা নাস্তিক যদি নর সেবায় প্রতিবেশীর দুঃখ মোচনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে তবে সেই যথার্থ মানুষ, তার ধার্মিকতা সত্য। আর নিজে পবিত্র থাকিয়া আধ্যাত্মিকতার রসে ডুবিয়া সংসারের বাহিরের দুঃখে উদাসীন থাকা অপরাধ। কারণ ভগবানকে দেখি না কিন্তু মানুষকে দেখি। তার দুঃখকে বুঝি তাহা দূর করিবার আনন্দকে অনুভব করি। তাহাতে যথার্থ মানুষের মঙ্গল হয় তাহা প্রত্যক্ষ করি—সেই প্রত্যক্ষ মঙ্গল সাধনই তো ভগবানের পূজা।

'ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে এত বক্তৃতা কিন্তু প্রতিবেশী ও স্বদেশের দুঃখীর জন্য তাহাদের প্রাণ কাঁদে না। তবে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া কি লাভ। তাই আমি কলিকাতায় গেলাম না।

'ভগবানের করুণা অপরিসীম। তাই আজ তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন না। উৎসব সার্থক হইল।'

পিতার ডায়েরির এই অংশের প্রথম দিকে ধর্মসাধনার বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন যে ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ হল, গুরুদেবের সার্বিক জীবনের প্রকাশ। গুরুদেবের নিজের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে "প্রতিবেশী ও স্বদেশের দুঃখিতদের জন্যে" যে প্রাণ কাঁদত, তাদের সার্বিক উন্নতির জন্যে নিরাসক্ত কর্মযোগের যে সাধনা করে চলেছিলেন, তাকেই আমাদের পিতা আদর্শ আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই, প্রতি বৎসরের মতো ১১ই মাঘের দিন কলকাতায় গিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে যোগদান করা বন্ধ করে দিলেন। সে দিন তিনি শান্তিনিকেতনেই থাকতেন। এর পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পিতা ওই সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশে তিনি গুরুদেবের জীবনকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

ক্ষিতিমোহন সেন ও আমাদের বাবা

ঢাকা শহরে বাসকালে বাবা, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের পরিচয়, তাঁর সাহিত্য কাব্য ও গানের মাধ্যমেই পেয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত গুরুদেবের 'স্বদেশি সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠের পর বাবার মন গভীরভাবে গুরুদেবের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি গুরুদেবকে দেখবার, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত পথের নির্দেশ পাবার জন্য অধীর হয়ে পড়েন।

এইরূপ মানসিক অবস্থায় গুরুদেবের চিন্তাভাবনার গভীরে প্রবেশ করবার সুযোগ ঘটে গেল ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে বাবার প্রথম পরিচয়ের পর। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'১৯০৬ সাল। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমার পিতৃভূমি বিক্রমপুর সোনারং গ্রামে আসিয়া শুনিলাম, একদল স্বদেশি প্রচারক গ্রামে আসিয়াছেন। বৈকালে

গ্রামের সভামধ্যে তাঁহাদের দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বক্তা, আর কেহ কেহ গান করেন। সকলের মধ্যে দেখিলাম কালীমোহন ঘোষই যেন প্রাণস্বরূপ। শরীরে কিছুই নাই, অথচ উৎসাহ-পরিপূর্ণ চিত্ত, তাহারই সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু। গ্রামের পুরস্ত্রীরা এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে স্নেহে ও বাৎসল্যে একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইয়াছেন। কালীমোহনের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। বড় ভাল লাগিল। দেখিলাম এই উৎসাহমাত্র সম্বল যুবকটির শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। একটু সেবাযত্ন ও বিশ্রামের প্রয়োজন। গ্রামের মেয়েরা সেবা ও যত্ন দিতে পারেন, কিন্তু অবসর ও বিশ্রাম লইবার ধৈর্য কালীমোহনের নাই।

'দেশে আসিয়া রবীন্দ্রকাব্য লইয়াই দিনগুলি কাটাইতেছিলাম। আমি কালীমোহনকেও সেই কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করিতে চাইলাম, কালীমোহন তাহাতে আনন্দে ধরাও দিলেন। কয়েকদিন সোনারং ও আউটসাহী গ্রামে বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার আমাদের গ্রাম হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

'এই দুইটি গ্রামের মেয়েরা কালীমোহনকে ইতিমধ্যে ঘরের ছেলের মতো করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারাও বাধা দিতে চাহিলেন। কালীমোহন একদিন দারুণ রৌদ্রের মধ্যে মালখাননগরের দিকে যাত্রা করিলেন। আমাকেও তাঁহার সঙ্গে লইয়া গেলেন। রবীন্দ্রকাব্যচর্চা আমাদের চলিল, কিন্তু তাঁহার বিশ্রাম চলিল না।'

এর পরে ক্ষিতিমোহনকে সঙ্গে নিয়ে আরও কিছু গ্রাম ঘুরে চাঁদপুর শহরে এলেন। সেখানে আশপাশের কতকগুলি গ্রামে গিয়ে তাঁর প্রচার অভিযানের পর এলেন বাজাপ্তি গ্রামে, নিজের বাড়িতে মায়ের কাছে। ঠাকুরমা অনেক দিন পরে ছেলেকে কাছে পেয়ে খুবই খুশি। কদিন পরে ক্ষিতিমোহনবাবু ফিরে গেলেন তাঁর গ্রাম হয়ে পশ্চিম ভারতের কর্মস্থলে। বাবা তাঁর মাতার যত্ন ও বিশ্রামের সুযোগ পেয়েও কাছাকাছি গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে তাঁর কাজ তিনি না করে বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি।

বাবা স্বদেশির দলে ঢুকে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে স্বদেশি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার জন্যে সর্বত্র প্রশংসা ও সমাদরও পাচ্ছেন শুনে ঠাকুরমা খুশি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ধরে নিয়েছিলেন তাঁর পুত্রকে নিশ্চয় পুলিশ জেলে আটকে রাখবে। এই ভাবনায় তিনি তখন দারুণ মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি স্থির করলেন, তাঁর পুত্রকে বিবাহ দিয়ে তাঁকে সংসারের বন্ধনে বাঁধবেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরাও একমত হলেন। তাঁরা পুত্রের বিবাহযোগ্য কন্যার সন্ধান করতে লাগলেন।

আমার বাবার বিবাহ

এই সময়ে চাঁদপুর শহরের প্রখ্যাত উকিল দীননাথ বসু তাঁর এগারো-বারো বছরের কন্যা, মনোরমার বিবাহের চেষ্টা করছিলেন। চাঁদপুরে প্রচার অভিযানের সময় বাবা যখন আসতেন তখনই তিনি এই সুদর্শন, তেজোদীপ্ত চেহারার যুবক আমার বাবাকে দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বাবার সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। জানলেন, চাঁদপুরের পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বাজাপ্তি গ্রামের কুলীন ঘোষবংশের একমাত্র পুত্রসন্তান আমার বাবা। পিতৃহারা, কিন্তু তাঁর মাতা বর্তমান। বুঝলেন, কায়স্থ বসুবংশের কন্যার সঙ্গে ঘোষবংশের পুত্রের বিবাহের কোনও অসুবিধা নেই। কারণ সে যুগে, বিবাহাদিতে বংশমর্যাদার প্রতি হিন্দুসমাজ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। দীননাথ বসুকে সে কথা তাঁর অন্যান্য পুত্রকন্যার বিবাহের সময়ও ভাবতে হয়েছিল।

দীননাথ বসু আমাদের ঠাকুরমার কাছে এই বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। ঘোষ পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির খবর নিয়ে তিনি জানালেন, তাঁর কন্যার সঙ্গে ঠাকুরমা যদি তাঁর পুত্রের বিবাহে সম্মত হন, তা

হলে বিবাহের পর ভাবী জামাতার উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব তিনি বহন করবেন। আত্মীয়স্বজনরা ঠাকুরমাকে এই প্রস্তাবে রাজি করালেন। ঠাকুরমা নিজে যেমন সুন্দরী ছিলেন তাঁর কন্যারাও ছিলেন তেমনই সুন্দরী। সেইজন্যে ঠাকুরমার ইচ্ছা ছিল, একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে বধূরূপে গৃহে আনবেন। ঠাকুরমা খবর নিয়ে যখন জানলেন উকিলের কন্যাটির গায়ের রং ময়লা, তখন তিনি পুত্রকেই নির্দেশ দিলেন, চাঁদপুরে গিয়ে কন্যাটিকে নিজে দেখে মনস্থির করতে। বাবা ঠাকুরমার আদেশমত তাই করলেন। দেখার পর ফিরে এসে ঠাকুরমাকে জানালেন তাঁর সম্মতি। ১৯০৬ সালে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

বিবাহের আগে বাবা গ্রামের বাড়িতে ছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। বিবাহের পর কয়েক মাস বাড়িতে কাটিয়ে তাঁর শ্বশুরমহাশয়ের অর্থানুকূল্যে কোচবিহারের রাজা-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ কলেজে ছাত্র হিসাবে পড়াশোনার জন্য চলে যান। সেখানকার ছাত্রাবাসে কম খরচে থাকার সুবিধা ছিল। সেই কলেজে তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

বিবাহের পূর্বে আমাদের মা-কে তাঁর পিত্রালয়ে সংসারের কোনও কাজই করতে হত না। তার প্রয়োজনও ছিল না। বাজাপ্তি গ্রামে এসে ঠাকুরমার সংসারের যাবতীয় কর্মে তাঁকে হাত দিতে হয়েছিল। কোনও কাজকেই তিনি অবহেলা করলেন না। সেই কারণে ঠাকুরমা তাঁর নবাগতা পুত্রবধূকে খুবই ভালবেসে ফেললেন।

ওদিকে বাবা কোচবিহারের রাজ কলেজে ভর্তি হয়ে লক্ষ করলেন, শহরের শিক্ষিত সমাজে এবং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রবল প্রভাব। দুটি কারণে এখানকার জনগণ উত্তেজিত। প্রথমটি হল মহারাষ্ট্রে জনগণের প্রতি শাসক ইংরেজের কঠোর দমনমূলক আচরণে সেখানকার জনমানসে রয়েছে প্রবল উত্তেজনা, তার সঙ্গে আগুনে ঘৃতাহুতির মতো যুক্ত হয়েছিল (১৯০৫) বাংলাকে দ্বিখণ্ডিতকরণের ঘটনা। এই উত্তেজক পরিবেশের মধ্যে বাবা কোচবিহার কলেজে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারলেন না। তিনি পূর্বের ন্যায় স্বাধীনতা-আন্দোলনে, যাকে বলা হয় বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন বা স্বদেশি-আন্দোলন, তাতে যোগ দেবেন বলে মনস্থির করে কলেজ ত্যাগ করলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমর্থনে গুরুদেব বেশ কয়েকটি জোরালো প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন, রচনা করলেন অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২৪/২৫টি স্বদেশি গান, যা তখনকার শিক্ষিত যুবকদের মনে দারুণ প্রেরণা যোগাতে পেরেছিল।

বাবার শ্বশুরমহাশয় তাঁর জামাতার কলেজের পড়া ত্যাগ করবার সংবাদ পেয়ে খুবই বিরক্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। ঠাকুরমাও তাঁর পুত্রকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে সংসারের প্রতি মন ফেরাতে পারলেন না দেখে মনে নিদারুণ আঘাত পেলেন। বাবা সেদিন তাঁর শ্বশুরমহাশয়, তাঁর মা এবং তাঁর পত্নীর মনোভাব লক্ষ করে এতটুকু বিচলিত হলেন না। দেশের স্বাধীনতার চিন্তা তখন তাঁর মনকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

গুরুদেবের সঙ্গে বাবার সাক্ষাৎ

গুরুদেবের রাজনৈতিক প্রবন্ধ, কাব্য ও গানের সঙ্গে পূর্বে পরিচিত হয়ে, তাঁর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনার আগ্রহে বাবা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ খুঁজছিলেন। বিশেষ করে চেষ্টার পর সে সুযোগ তিনি অবশেষে পেলেন। প্রাণভরে গুরুদেবের কাছে দেশপ্রেম, বঙ্গভঙ্গ থেকে উদ্ভূত আন্দোলন এবং তাঁর কর্মের পদ্ধতি নিয়ে বাবার মনে যত রকম প্রশ্ন জেগেছিল পূর্বের কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে, তা একে একে গুরুদেবকে বললেন। গুরুদেবও খুবই আগ্রহ নিয়ে বাবার কথা শুনে সবকটির উত্তর দিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর গুরুদেব বুঝতে পারলেন, এই যুবকটি অন্তর থেকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক

এবং গুরুদেবের পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে। এর পরেই গুরুদেব বাবাকে নিয়ে গেলেন শিলাইদহে। বাবা উৎসাহের সঙ্গে গুরুদেবের কর্মসূচি অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের মধ্যে সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

বাবার মতো অল্পবয়সী যুবককে গুরুদেব তাঁর জমিদারিতে কেন নিয়ে গেলেন, সে বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

১৮৯০ সালে গুরুদেব যখন তাঁর পিতার নির্দেশে তাঁদের জমিদারির তদারকির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স তিরিশের মতো। তখন সেখানকার দরিদ্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং তাদের সার্বিক উন্নতির সংকল্প গ্রহণ করে কীভাবে তখন থেকেই তিনি হাতেকলমে কাজে নেমেছিলেন, তার যে ইতিহাস তিনি নিজেই লিখে গেছেন, এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন। গুরুদেব জানিয়েছেন—'শিলাইদহ পতিসর—এইসব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি।...

'পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে—নদীয়া এবং রাজশাহি জেলার সন্নিকটে।... পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলাম এই প্রথম।...

'আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনও স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাইনি।...

'যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। ...ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। ...তারপর থেকে চেষ্টা করতুম—কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনার দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমি যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে।'

তখনকার গ্রামের দরিদ্র নরনারীর জীবনযাত্রার বেদনাদায়ক পরিচয়ে তাঁর মন যে কতখানি বিচলিত হয়েছিল, তাঁর উপরিস্থ বাক্য থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এইরূপ মানসিক অবস্থায় তিনি 'এবার ফিরাও মোরে' নাম দিয়ে একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁর সেই মনোবেদনা প্রকাশ না করে থাকতে পারেননি। এটি রচনার তারিখ ২৩ ফাল্গুন ১৩০০/১৮৯৩ সাল। এখানে গুরুদেবকে বলতে শোনা গেল—

'...ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ?...
...কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল ? কোন্ অন্ধকারামাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায় ? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া ; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার ; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ

রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে—
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;...
...কবি, তবে উঠে এস—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
এক বার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।...'

অন্যত্র গুরুদেব বলেছেন—'গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল।...

'শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই যে এরা খাদ্য থেকে বঞ্চিত, এই যে এরা একবিন্দু পানীয় জল থেকে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনও উপায় নেই।...

'তখন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরেজি জানা লোক ভারতবর্ষের উপর—যেখানেই এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে। পল্লীর জীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব তা ভেবেই উঠতে পারিনি।...

'আমার জীবনের মধ্যে পল্লীগ্রামের দুঃখদুর্দশার চিত্রটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, বিচলিত করেছিল, আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হতেই শুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম।...

'সেই সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল। যত বড় দায়িত্বই হোক না কেন, তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম।... আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।...

'এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নূতন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করব।'

পল্লীবাসী দরিদ্র জনসমাজের সার্বিক উন্নয়নের কাজে হাত দিয়ে প্রকৃত জনদরদী সহায়কের অভাব তিনি বোধ করেছিলেন। তাঁর জমিদারির কর্মচারীদের দিয়ে এ কাজ করতে গিয়ে হয়তো তেমন আন্তরিক সাড়া তাঁদের কাছ থেকে পাচ্ছিলেন না। এই প্রকার মানসিক অবস্থার মধ্যে ১৯০৫-০৬ সালে প্রথমে আমাদের বাবাকে, পরে আরও দু তিনটি যুবককে পেয়ে তিনি খুবই নিশ্চিন্ত

হতে পেরেছিলেন। পরবর্তী যুগে সে দিনের কথা স্মরণ করে গুরুদেব বলেছিলেন—'আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব ; এই সঙ্কল্পে সহায়তা করবার জন্যে সে দিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন।'

বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলনের যুগে গুরুদেবের প্রেরণায়, পল্লীসমাজ গঠনের কাজে বাবা, ঠাকুরপরিবারের জমিদারি অঞ্চলে— শিলাইদহ, পতিসর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নবোদ্যমে কাজে নামবার পর তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ ও চিন্তার সঙ্গে, গুরুদেবের চিন্তা ও কাজকে বিশ্লেষণ করে যা লিখে গিয়েছিলেন, তা পড়ে তাঁর দেশসেবামূলক নিরাসক্ত কর্মযোগের পরিচয় যা পাওয়া যায়, তারও উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বাবা জানাচ্ছেন—'গত স্বদেশি আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মিতায় বাঙালির প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। ইহার পূর্বেই বঙ্কিমের বন্দেমাতরম, রঙ্গলালের স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়, হেমচন্দ্রের বাজ্‌রে শিঙা বাজ্ এই রবে, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি সাহিত্য ও কাব্যের ভিতর দিয়া বাঙালির মনে দেশপ্রেমের বীজ রোপিত হইয়াছিল। ...

'রাজকাহিনী ও শিখের বলিদান তাহাদের চিত্তকে ত্যাগের মহিমায় অনুপ্রাণিত করিল। অতএব সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের বাগ্মিতা বাংলার তরুণ হৃদয়ে সহজেই সাড়া পাইল। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, একলা চলো রে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না, ইত্যাদি সঙ্গীত ভাবপ্রবণ এই বাঙালির চিত্তের অনুভূতিকে ত্যাগশীল যুবকদের সম্মুখে কোনও সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করে নাই। কারণ সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের প্রেরণার মূল ছিল পাশ্চাত্য দেশের বার্ক ও ম্যাটসিনির চিন্তাধারা। ইহার কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি সমাজ (১৯০৫) নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শিক্ষিত সমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পল্লীর অঙ্গনেই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ...

'তখনকার রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ দ্বারা আমাদের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার প্রতি ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বয়কট আন্দোলন সেই উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন লিখিয়াছিলেন—বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছল বল কৌশলের সাজ-সরঞ্জাম কিছুই বাকি রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষাও মহামূল্য এবং তাহার জন্য যে বহুতর সাধনার আবশ্যক এ কথা আমরা মনেও করি নাই। পল্লীসমাজের ভিত্তির উপরেই জাতি-সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতিকে কি উপায়ে জনসাধারণের প্রাণের জিনিস করা যায় এ বিষয়েও তিনি উক্ত প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ...

'রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সমিতিকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম ? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশি ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা, গান, আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর-দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশি পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্তন গায়ক ও যাত্রাদলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং তাহাদের যাহা কিছু বলিবার আছে, যাহা সুখ-দুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্র মিলিয়া সহজ বাংলায় আলোচনা করা হইত। ...

'কিন্তু তখন তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] অরণ্যে রোদন করাই সার হইয়াছিল। পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত স্বদেশি নেতৃবর্গ ধ্বংসোন্মুখ পল্লীর অন্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় যে প্রচ্ছন্ন শক্তি চির প্রবাহিত রহিয়াছে তাহার সন্ধান জানিতেন না। ...

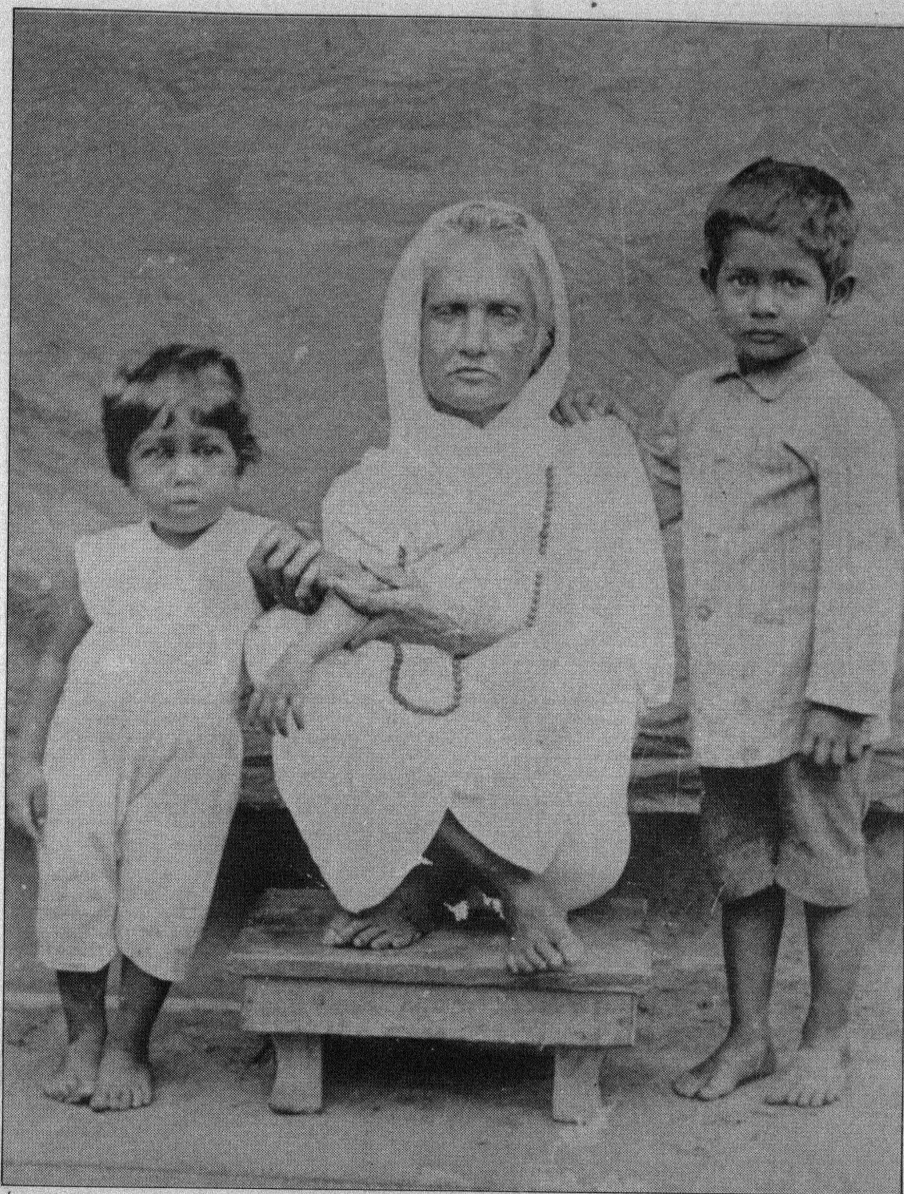
'যাহা হউক এই স্বদেশি আন্দোলনের সফলতার পশ্চাতে অনেকখানি ছিল পূজনীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের নীরব সাধনা। তাঁহারই নেতৃত্বে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" মাথায় করিয়া আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই বলিষ্ঠদেহ তেজস্বী নেতার মনে যশ ও খ্যাতির কোনও আকাঙ্ক্ষা

ছিল না। বাংলার প্রথম স্বদেশি-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল তাঁহারই গৃহে। স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় ছিলেন যুবকদলের নেতা। কৃষ্ণবাবু একদিন ডাকিয়া বলিলেন—দেখ স্বদেশি দ্রব্য উৎপন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে বিদেশি বর্জন আন্দোলন অসম্ভব। অতএব তুমি কলিকাতায় না থাকিয়া মফস্বলে ঘুরিয়া তাঁতি জোলাদের মধ্যে আবার তাঁত প্রবর্তনের চেষ্টা কর। আমি তাঁহার আদেশে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কারণ বৃহৎ নগরীর আবহাওয়া কখনও আমার মনের সঙ্গে খাপ খায় নাই। বাংলার নানা জিলা ঘুরিয়া আমি নোয়াখালি ও কুমিল্লায় আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র করিলাম। নোয়াখালির যুগি বা নাথ সম্প্রদায়ের পৈতৃক ব্যবসা তাঁত, কিন্তু সেই ব্যবসা তখন লুপ্তপ্রায়। ইহাদের সংখ্যা পঞ্চান্ন হাজারের উপর। যুগিদিগের অধিকাংশেরই জায়গা-জমি নাই। অর্ধাশনে দিনাতিপাত করায় ইহাদের দেহ দুর্বল। দিনমজুরিতেও মুসলমান মজুরদের মতো কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে না। ইহারা ধর্মপ্রাণ ও বৈষ্ণব। ইহাদের মুখে কীর্তন, ময়নামতী ও শূন্য পুরাণের গান শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম যে ইহাদের হৃদয় সরল ও সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন। বাংলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর সনাতনী সমাজ গঠনের যুগে পৈতৃক ধর্মাসক্ত এই উন্নত জাতিকে সমাজপতিগণ অপাঙক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বহু শতাব্দীর সাধনার সম্পদকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। শহুরে শিক্ষিতাভিমানী আমি কলিকাতার রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতা লইয়া যখন গ্রামে আসিলাম, তখন আমার মনে এই সকল নিরক্ষর নিরন্ন অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা ছিল। এই সকল নির্বোধ জনগণকে কোনওরকমে মাতাইয়া তুলিয়া যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করা যায় ইহাই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনুভব করিলাম যে ইহারা একটি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। ইহাদের বোধশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। আমি যতই ইহাদিগের সহিত মিশিতে লাগিলাম, ততই ইহাদের বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলাম। আমার দম্ভ দূর হইল। নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলাম। অনুভব করিলাম যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারাই পরস্পরের হৃদয় জয় করা যায়। পতিতোদ্ধারকারী পাদ্রীগিরির দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। পল্লীসভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আরও পরিস্ফুট হইল শিলাইদহে। শিলাইদহে কবি তখন অবস্থান করিতেছিলেন পদ্মার উপর। একদিন তিনি আমায় কুষ্টিয়ার নিকট লালন শা ফকিরের আখড়ায় গিয়া কয়েকটি সংগীত সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। আখড়ায় ছিল সেদিন উৎসব। ফকিরের বহুসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান শিষ্য ও শিষ্যা খঞ্জনি বাজাইয়া নৃত্যের সহিত বাউলদের মতো গান করিতেছিল। সাম্প্রদায়িক ধর্মের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে সহজ সরল ভাবে অনুভব করাতেই এই সংগীতের বিশেষত্ব। শিক্ষিত সমাজের অগোচরে জনসাধারণের মধ্যে বিনা আড়ম্বরে এই সাধক তাঁহার জীবনের সাধনার দ্বারা মিলনের যে সেতু নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিলাইদহে আসিতে অনুরোধ করিয়া আসিলাম।...

'পরদিন অপরাহ্ণে নৌকোর উপর কবি গভীর আনন্দের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর আমাকে বলিলেন, ইহারা লেখাপড়া জানে না। কিন্তু সকলেই জ্ঞানী, বড় বড় কথা এমন সহজভাবে বুঝিতে পারে যে এদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াও তাহা ক্বচিৎ পাওয়া যায়। এই শিলাইদহেই তিনি "বৈষ্ণবী" নামক ছোট গল্প লেখেন। একটি বাস্তব ঘটনা এই গল্পের উপাদান।...

'আমাদের পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে যে সংস্কৃতি (culture) ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্রসমাজের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার আঘাত সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি রহিয়াছে বলিয়াই এই সকল অশিক্ষিত সাধক তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া আত্মীয়তার অনুভূতি লাভ করিত এবং সেই জন্য প্রাণের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিজদিগকে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না।...

'রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন। তিনি জাতির ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তাই তিনি বারবার দেশসেবক



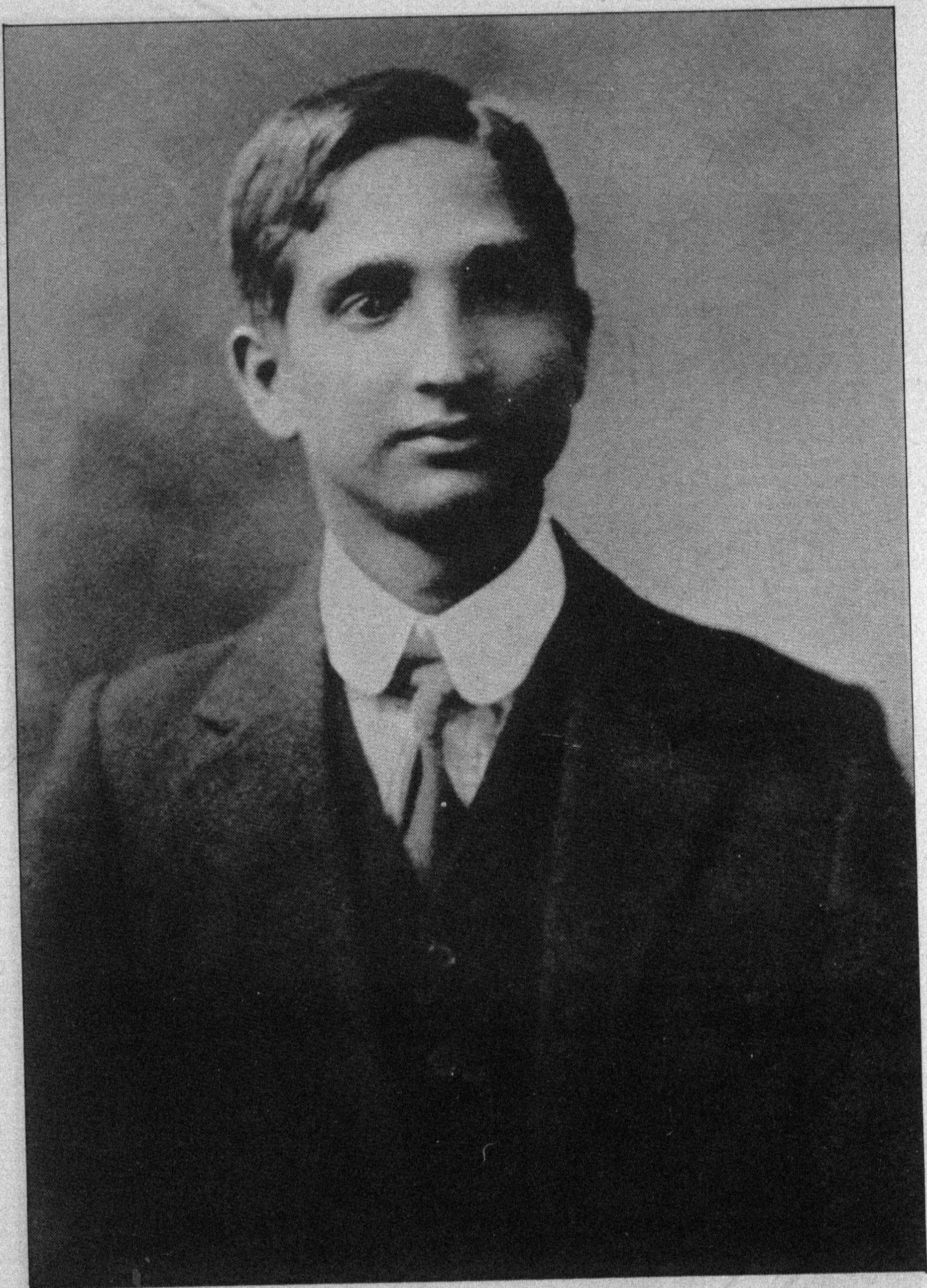
ঠাকুরমার সঙ্গে ডানদিকে ৪ বছরের শান্তিদেব, বাঁদিকে দু' বছরের সাগরময়



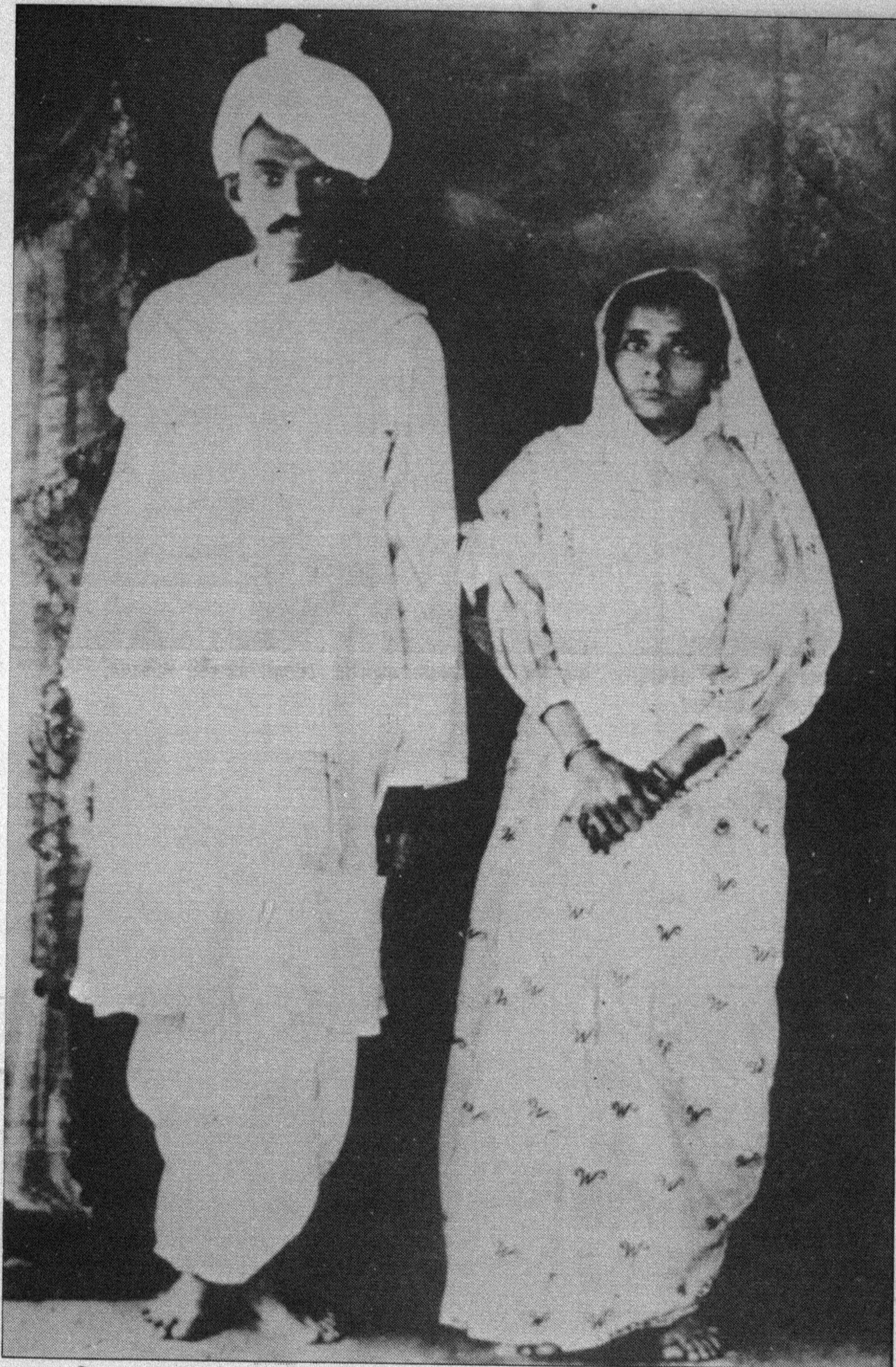
পিতা কালীমোহন ঘোষ



মাতা মনোরমা দেবী



কালীমোহন : ইংলন্ডে, ১৯১২.



মহাত্মা গান্ধী ও কস্তুরবা, ১৯১৫



দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা : রমা কর, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শৈলেশ চক্রবর্তী, শান্তিদেব, পিনাকিন ত্রিবেদী ও উমা রায়



১৯৩৪-এ শ্রীলঙ্কায় 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে নন্দবিহারী ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শিশির ঘোষ, নিবেদিতা ঘোষ, শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, ইদ্রি সিং, যমুনা সেন, পিনাকিন ত্রিবেদী, হৈমন্তী চক্রবর্তী, নবকুমার সিং, রানী চন্দ, নরেন্দ্র সিং। উপবিষ্ট : উমা রায়, নন্দিতা কৃপালনী, অমলা রায়চৌধুরী



'শাপমোচন'-এ ইন্দ্রের ভূমিকায় সাজিয়ে দিচ্ছেন নন্দলাল বসু



ইন্দ্রের ভূমিকায় শান্তিদেব



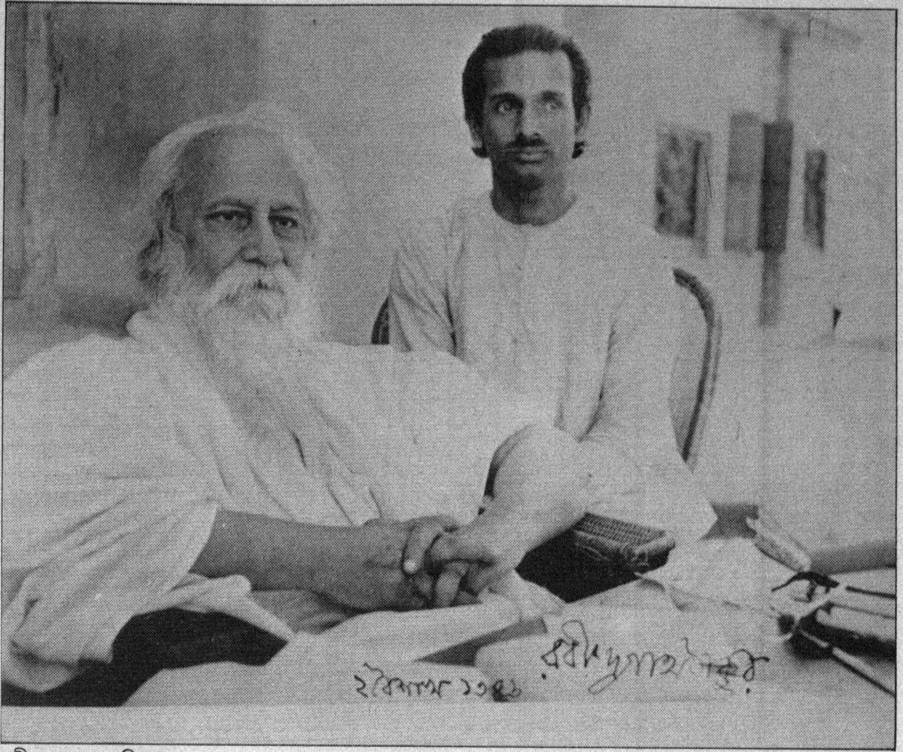
'শাপমোচন'-এ ইন্দ্রের ভূমিকায় শান্তিদেব



'তাসের দেশ'-এ রাজপুত্রের ভূমিকায়



বাউল নৃত্যে শান্তিদেব



রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিদেব

কর্মীদলকে আহ্বান করিলেন—পল্লীসমাজ গঠনের জন্য। গত ১৩১৪ সালে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মিলনের সংগঠন কার্যের জন্য বাঙালি জাতির বরেণ্য নেতৃবৃন্দ পাবনায় সম্মিলিত হন। দলাদলির বাহিরে থাকিয়া দেশের কল্যাণ চিন্তায় নিরত ছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথকেই মিলনযজ্ঞের ঋত্বিক হইতে হইয়াছিল।...

'তখন বাংলার ঘোরতর দুঃসময়। বঙ্গ বিভাগের বেদনায় বাঙালি ক্ষুব্ধ হইয়া বিলাতিবর্জন করিয়াছে। তাহার ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া শাসকজাতি প্রবর্তন করিয়াছে পুলিশ রাজকতা। জেল নির্বাসন ও বেত্রদণ্ড দ্বারা বিলাতিবর্জন ত্যাগ করাইতে তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। আঘাত ও প্রতিঘাতের তাড়নায় দেশে অশান্তির প্রকোপ বাড়িয়াই উঠিল। একদল যুবক অসহিষ্ণু হইয়া বিপ্লববাদ প্রচার করিতে লাগিল।...

'পাবনা সম্মিলনীতে (১৯০৮) রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা বাংলার রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। বিক্ষুব্ধ বাঙালি জাতির অন্তরের বেদনা গভীরভাবে জ্বলন্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার বক্তৃতায়। কিন্তু কবির দূরদৃষ্টি, সেই বিক্ষোভের মধ্যেও বিভ্রান্ত হয় নাই। সে দিনও তিনি সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টায় পল্লীসমাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন—প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে। কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই। দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।...

'নিজের পাঠশালা, শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহদান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে। সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।...

'যে দেশে শতকরা চুরানব্বই জন লোক গ্রামে বাস করে সেই দেশের সমস্যা পল্লীসমস্যা। সেখানেই শক্তির উৎস দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র পল্লী প্রাণহীন অন্নহীন, আত্মকলহে শতধা বিচ্ছিন্ন। ভারতের ধনসম্পদের উৎপত্তি যেখানে, সেখানে বাঁধ দিতে না পারিলে ভারতের ধনরাশির অবাধ প্রবাহ অপর দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়া সেই অনুপাতে নিজেদের দারিদ্র্য বাড়াইয়া তুলিবে—ইহা অনুভব করিয়া রবীন্দ্রনাথ পাবনায় বলিয়াছেন—অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথে আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই, তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।...

'তরুণ তেজোদীপ্ত যুবক সম্প্রদায়ের ত্যাগোজ্জ্বল দেশসেবার জয় ঘোষণা করিয়া তিনি [রবীন্দ্রনাথ] তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তন কর। গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয়, তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর এবং যাহাতে তারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এই কর্মে খ্যাতির আশা করিও না। এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনও উত্তেজনা নাই, কোনও বিরোধ নাই, কোনও ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং

প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকু মাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।...

'রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে উভয় দলের নেতৃবৃন্দের হৃদয় বিচলিত হইল। তখনকার মতো সকলেই দলাদলি বিস্মৃত হইয়া এই সংগঠনমূলক কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহা আর কার্যে পরিণত হইল না।'

পিতার স্বাস্থ্য বরাবরই তেমন ভাল ছিল না। অত্যধিক উৎসাহে শিলাইদহ ও পতিসর প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে ঘোরাঘুরির কারণে কিছুকাল পরেই কাশরোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রয়োজন হয় এক স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁকে রেখে তাঁর চিকিৎসার। গুরুদেব তখন পিতাকে গিরিডি পাঠিয়ে দেন, সেখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল মনে করে। সেখানে তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই বাড়ি করে বসবাস করতেন। অনেক বাঙালি সপরিবারে মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য সেখানে বিশ্রাম করতেও আসতেন, নিজেদের বাড়িতে। এখানকার এই সমাজের প্রায় সকলের সঙ্গেই বাবা অন্তরঙ্গভাবে মিশতে সক্ষম হন। এখানেই 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থের গ্রন্থকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে বাবা নিকট আত্মীয়ের মতো একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। প্রভাতবাবু, তাঁর ভ্রাতা ও ভগিনীরা বাবাকে কালীমোহনদা বলে ডাকতেন এবং প্রভাতবাবুর মা আমার বাবাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

গিরিডি বসবাসকালে, একটু সুস্থ হওয়ার পর মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে এসে কয়েকদিন থেকে যেতেন। এখানকার নির্জন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্রশিক্ষকদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিচয়ে তাঁর মন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়।

শান্তিনিকেতনে যোগদান

বাবা ১৯০৭ সালের বর্ষার সময় শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিলেন। সেই দিনটির স্মৃতিচারণ করে তিনি বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্রদের হস্তলিখিত 'শান্তি' পত্রিকায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অকালে প্রয়াত কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ এবং সে দিনের বিদ্যালয়ের পরিবেশের বিবরণ যে ভাবে লিখে গিয়েছিলেন, তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি— 'প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম আমি এই আশ্রম দর্শন করি। বর্ষাকাল টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাত্রি আটটার গাঢ় অন্ধকারে আশ্রমের গম্ভীর মূর্তি আমার প্রাণে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। ছেলেরা সকলে আহারের আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময়ে একটি অচেনা অতিথি দেখিয়া তাহারা উৎফুল্ল হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বালকদলের মধ্যে একটি প্রিয়দর্শন উজ্জ্বলমূর্তি আমার সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি তাহার সঙ্গে কথা বলিতে উৎসুক হইলাম।...

'এই সুকুমার বালকই আমার হাতমুখ ধোয়ার জল আনিয়া দিল। আহারের পর আমার বিছানা করিতে আসিল। এগারো বৎসরের এই ক্ষুদ্র বালকটির কাছ হইতে সেবা গ্রহণ করিতে আমার সংকোচবোধ হইতেছিল তাই বাধা দিলাম। তাহাতে সে কোমল কণ্ঠে বলিল—এ যে আমাদের কর্তব্য, আমিই বিছানা করে দিচ্ছি। এমন নিষ্ঠার সহিত সে অতিথি-সেবার এ কর্তব্যটি পালন করিতে লাগিল এবং ইহার মধ্য দিয়া তাহার পবিত্র হৃদয়ের এমন একটি মাধুর্য ফুটিয়া উঠিতেছিল যে তাহা দেখিয়া আমি আর নিষেধ করিতে পারিলাম না। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— তোমার নাম কি ? সে উত্তর করিল—শ্রীশমীন্দ্রনাথ ঠাকুর।— তোমার পিতার নাম ? বালক বিনীতভাবে উত্তর করিল—আমার পিতার নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—তুমি এত বড় লোকের ছেলে হয়ে আমার হাতমুখ ধোয়ার জল দিলে ? বিছানা করে দিলে ? তোমাদের এ সব ছোট কাজ করতে ইচ্ছে হয় ?

শমী আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল—সে কি। এ সব কাজ করতে তো আমাদের খুবই ভাল লাগে।—এমন স্মিত হাস্যে সরলভাবে সে এই কথাকয়টি কহিল যে আমি প্রশ্ন করিয়া অপ্রস্তুত হইলাম।'

শান্তিনিকেতন প্রথম দর্শনেই বাবা অভিভূত হয়ে পড়েন। মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিয়ে একদিন আচার্যরূপে গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ, তার ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক ভাষণ এবং গুরুদেবের পূজা পর্যায়ের গানগুলি শুনে তাঁর মনে একপ্রকার গভীর ঐশ্বরিক আবেগের সঞ্চার হল। তিনি সেদিনের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন—'বড়বাবু [দ্বিজেন্দ্রনাথ] প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা করিলেন। সুস্নাত শুভ্র পরিচ্ছদ-শোভিত বৃদ্ধ শুভ্রকেশে প্রাচীন কালের ঋষির মতো। শিশুর মতো সরল অথচ গম্ভীর। উদ্বোধন নাই। sermon নাই। আসিয়াই পিতা নোহসি পাঠ করিলেন। মন্ত্রের প্রতি-অক্ষর উচ্চারণের সময় তাঁর চক্ষু ও মুখ হইতে দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হইতেছিল। গম্ভীর বাণী কোন সুদূর হইতে আসিয়া যেন অন্তরের অন্তঃস্থলকে বিদ্ধ করিতেছিল। কপাট ভেদ করিয়া সেই বাণী আমার হৃদয়ের আনন্দকে জাগ্রত করিল। তারপর তিনি ব্রহ্মসঙ্গীতের দুইটি সঙ্গীত পাঠ করিলেন। তাহাই প্রার্থনা। কী সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী। সব কথাগুলি যেন সমগ্র জীবনের সাধনা। আশ্চর্য মনে হইল। কত বড় বড় sermon-এ মন ভিজে না, গলে না, আর আজকের পাঠ এমনি করিয়া হৃদয়কে নাড়া দিল। বুঝিলাম যাঁদের সাধনা আছে, তাঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র কত জীবন্ত, তাঁহারা যাহা উচ্চারণ করেন তাহার পশ্চাতে কত শক্তি লুক্কায়িত থাকে।'

বাবার ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা

বাবা ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হবার কথা চিন্তা করে গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গুরুদেব তাঁকে সম্মতি দেন। তিনি গিরিডিতে ফিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মমত দীক্ষা গ্রহণ করে, সাধারণসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম হন। তখনকার দিনের অনেক ব্রাহ্মবাড়িতে ব্রাহ্মমন্ত্রগুলি কাচের ফ্রেমে ছবির মতো বাঁধিয়ে গৃহে টাঙানো হত। বাবা সেই রকমের কতকগুলি মন্ত্র কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরমাকে দেন, ঘরে টাঙিয়ে রাখার জন্যে। পরবর্তী কালে বাল্য বয়সে গ্রামে যখন গেছি তখন সেগুলি আমি দেখেছি। ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে ঠাকুরমার সঠিক কোনও ধারণা ছিল না। মন্ত্রগুলি তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেগুলিকে হিন্দু ধর্মের পূজার মন্ত্ররূপেই ভাবতেন। সেই কারণেই যত্নসহকারে সেগুলিকে ঘরে টাঙিয়ে রাখতে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা হয়নি।

এ ভাবে আমাদের গ্রামে এবং গিরিডিতে বেশ কিছুকাল বিশ্রামের ফলে সুস্থ হওয়ার পর, গুরুদেব বাবাকে আর শিলাইদহ অঞ্চলের গ্রামের কাজে পাঠালেন না। ১৯০৭ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুবিভাগে শিক্ষক হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। এখানে কাজে যোগ দেবার কিছুকাল পরে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রামে, গ্রামবাসী বালক ও যুবকদের মধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদনের কাজ, শান্তিনিকেতনের বয়স্ক কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলের দিকে সম্পন্ন করতেন।

আমার শান্তিনিকেতন আগমন

আমার জন্মের ছ' মাস পর ১৯১০ সালে ঠাকুরমা এবং আমার মা-সহ আমি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি। মা'র কাছে শুনেছি, শান্তিনিকেতনে আমরা প্রথম যে বাড়িটিতে উঠেছিলাম, সেটি ছিল নিচুবাংলার 'দ্বিজবিরাম'-এর পুব দিকে যে রাস্তাটি বোলপুরের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেই রাস্তার গায়ে উত্তর দিকে দক্ষিণমুখো খড়ের চালা বারান্দাযুক্ত মাটির বাড়ি। এখনও সেটি আছে। কিন্তু বর্তমানে সেটিকে নানা রকমের বড় গাছ ও আগাছায় ঘিরে ফেলেছে, রাস্তা থেকে কেবল চালাটাই দেখা যায়। এখন ওই বাড়িটিতে বিশ্বভারতীর একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী তার গরু ছাগল নিয়ে সপরিবারে বাস করছে।

মা'র মুখে শুনেছিলাম, আমরা শান্তিনিকেতনে আসার পর গুরুদেব বাবাকে বলেছিলেন, তাঁর মা-সহ স্ত্রী-পুত্রকে একবার যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসেন, তিনি সকলকে দেখতে চান। গুরুদেব তখন থাকতেন 'দেহলি' বাড়ির দোতলায়। পরের দিন বাবা সকলকে নিয়ে গুরুদেবের কাছে যাবার পূর্বে, ঠাকুরমা তাঁর ছ' মাসের নাতির পায়ে, হাতে ও গলায় আমাদের দেশের গ্রামে যেভাবে শিশুদের মুখেভাত বা অন্নপ্রাশনের সময় অলংকার দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হত, সেইভাবে আমাকে সাজিয়ে দিলেন। মা গ্রামের বধূদের মতো শাড়ি পরে, প্রায় চোখের উপর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে, আমাকে কোলে নিয়ে বাবা ও ঠাকুরমার সঙ্গে গুরুদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করার পর, আমার মোটাসোটা কালো চেহারা দেখে গুরুদেব বাবাকে বলেছিলেন, তাঁর পুত্রটি নাকি 'বালকৃষ্ণ'—এ কেষ্টঠাকুরকে কোথায় পেলে! আমাকে তাঁর কোলে নিতে চাইলেন। আমার বাবার মতো ফর্সা রং নিয়ে আমি জন্মাইনি। স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। বেশ একটু মোটাসোটাই ছিলাম। আমাকে গুরুদেবের কোলে মা খুবই শঙ্কিতচিত্তে তুলে দিয়েছিলেন। কারণ, ছ' মাসের শিশু—মা'র কোল ছেড়ে অন্য কোলে গিয়ে যদি ছটফট করি, কিংবা কান্নাকাটি করি, অথবা যদি গুরুদেবের কোল ভিজিয়ে দিই, তা হলে তাঁর পক্ষে তা যে কতখানি লজ্জার বিষয় হবে, সে কথা ভেবে। আমি যতটুকু সময় গুরুদেবের কোলে ছিলাম, তখন নাকি খুবই শান্ত ছিলাম। ছটফট বা কান্নাকাটি কিছুই করিনি, গুরুদেবের কোলও ভিজিয়ে দিইনি। মা প্রায় দমবন্ধ করে একদৃষ্টে গুরুদেব ও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমাকে মা'র হাতে তুলে দিলেন গুরুদেব। মা'র তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো মানসিক অবস্থা। গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মা ও ঠাকুরমা মনে পরম তৃপ্তি নিয়ে সেদিন ফিরেছিলেন।

পরে বাল্যবয়সে ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম তাঁর সঙ্গে গুরুদেবের প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা। সেদিন গুরুদেবের ঋষিতুল্য চেহারা এবং কথাবার্তা শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদির গল্প এবং প্রাচীন কালের মুনিঋষি, তাঁদের আশ্রম সম্পর্কে অনেক কিছু শুনে তাঁর মনের মধ্যে সেগুলির সম্পর্কে যে ছাপ পড়েছিল, শান্তিনিকেতনের চারিপাশের নির্জন বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে নানাপ্রকার গাছপালা পরিপূর্ণ শান্ত পরিবেশে গুরুদেবকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যেন সেই প্রাচীন যুগের মতো একজন মুনিঋষিকেই দেখলেন। শান্তিনিকেতন যেন তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম—এখানে ছাত্রদল ও শিক্ষক-কর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে প্রাচীন যুগের আশ্রমগুরুরূপে তিনি বিরাজ করছেন। এ ছাড়া এই বিদ্যালয়টিকে সকলে বলছেন, 'আশ্রম' এবং প্রতিষ্ঠাতাকে বলছেন 'গুরুদেব'। আমাদের বাবা যে এইরূপ এক আশ্রমগুরুর আশ্রয়ে আছেন, প্রত্যক্ষভাবে তার পরিচয় পেয়ে ঠাকুরমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

বাবার ইংলন্ড গমন

শান্তিনিকেতনে প্রায় এক বছর বাস করার পর আমরা আমাদের দেশের গ্রামে ফিরে যাই। দেশের বাড়িতে ঠাকুরমার আশ্রয়ে ফিরে আসবার কারণ হল, ১৯১২ সালের প্রথম দিকে বাবার ইংলন্ড গমন। তিনি ইংলন্ডের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী অনুশীলনের জন্য ভর্তি হন। ইংলন্ডে এই শিক্ষা-ভ্রমণের আর্থিক খরচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে তাঁর শুভানুধ্যায়ী কিছু ব্যক্তি। বাবা খুবই উৎসাহ ও পরিশ্রমে সেখানকার শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন।

১৯১২ সালের মে মাসে গুরুদেব তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে ইংলন্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। দেশে থাকা কালেই তিনি অর্শ রোগে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। ইংলন্ডে পৌঁছে একটি হাসপাতালে চিকিৎসার্থে ভর্তি হন। সেখানেও তিনি গীতাঞ্জলি যুগের কিছু গান ও কবিতার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের কাজে হাত দেন। গুরুদেব সে সময় সেখানকার বিশিষ্ট কয়েকজন ইংরেজ সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে বাবাকে দূত হিসাবে প্রায়ই কাজে লাগাতেন। এই কাজের দায়িত্ব পেয়ে বাবার সুযোগ হয়েছিল সেখানকার কয়েকজন সুধীজনের সঙ্গে মেলামেশার। সেই সুধীজনের মধ্যে ছিলেন, ডবলিউ. বি. য়েটস, এজরা পাউন্ড, এইচ. জি. ওয়েলস, আর্নেস্ট রীস, হেনরি নেভেনুন, এডউইন বিভান, মে সিনক্লেয়ার, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, স্টফোর্ড ব্রুক, ঈভলিন আন্ডারহিল, অ্যালিস মেনীল, মেসফিল্ড, হাডসন, নেভিনসন, রটেনস্টাইন প্রমুখ। এই সময় সি. এফ. এন্ডরুজের সঙ্গেও বাবার প্রথম পরিচয় হয়। গুরুদেবের কাজ নিয়ে এঁদের কাছে যাতায়াতের সুবাদে তিনি সকলের সঙ্গেই বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। রটেনস্টাইন যখন লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের সভাগৃহের দেওয়ালে টাঙাবার জন্য বারাণসীর গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য আঁকলেন তখন সেই ঘাটের সাধুর ছবি আঁকার সময় বাবাকে তিনি তাঁর মডেল করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে বাবাকে বেশ কয়েক দিন তাঁর স্টুডিওতে গিয়ে সন্ন্যাসী সেজে বসতে হয়েছিল। মধ্যযুগে সন্ত কবীরের দোহার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ এজরা পাউন্ড বাবার সাহায্যে করেছিলেন। গ্রন্থটির পরিচয়পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল—'Certain Poems of Kabir. Translated by Kali Mohan Ghose and Ezra Pound, from the edition of Mr. Kshiti Mohan Sen.'

কিছুদিন পরে বাবা সেখানে খুবই আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়েন। দেশ থেকে যাঁরা তাঁকে নিয়মিত টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের সেই উৎসাহে ভাটা দেখা দেয়। গুরুদেব তা জেনে বাবার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে গুরুদেব সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে চিঠি লিখে বাবার জন্যে টাকা সংগ্রহ করে ইংলন্ডে পাঠাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাতেও কাজ বিশেষ হয়নি। সেই কারণে, গুরুদেব যখন ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ফিরলেন তখন বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

ফিরে এসে গুরুদেব শান্তিনিকেতনের শিশু বিভাগে শিশুদের সার্বিক দায়িত্ব দিয়ে বিদ্যালয়ের কাজে বাবাকে যুক্ত করে দিলেন। ইংলন্ড থেকে ফিরে বাবা নিজেদের গ্রাম বাজাপ্তিতে গিয়ে ঠাকুরমা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে, আমাকে এবং আমার ভ্রাতা সাগরময়সহ মাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। শান্তিনিকেতনে এ বারে উঠলেন 'দেহলি' বাড়ি সংলগ্ন 'নতুন বাড়ি'র একটি অংশে।

আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা, সাগরময় ঘোষের যখন জন্ম হয় আমাদের গ্রামে, তখন বাবা ১৯১২ সালের জুন মাসে ইংলন্ড অভিমুখে— সমুদ্রপথে। তাঁর প্রথম সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে বাবা জানালেন, তাঁর দ্বিতীয় পুত্রটির নাম তিনি দিয়েছেন 'সাগরময়'। সেই থেকেই এই নামে সে পরিচিত।

এই সূত্রে আমার নামকরণের ইতিহাসটিও এখানে বলছি। আমার জন্মের পর বাবা আমার নাম

দিয়েছিলেন 'শান্তিময়'। সে যুগের শান্তিনিকেতনের পরিবেশ এই রকম নাম রাখার কারণ। বাবা ১৯০৭ সালে গিরিডি থেকে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসতেন। সে যুগে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ, গুরুদেব-সহ অধ্যাপক-কর্মীদের জীবনযাত্রার সরলতা এবং নানা প্রকৃতির গাছপালায় পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যে যে আনন্দময় শান্ত পরিবেশের পরিচয় তিনি পেতেন, তা তাঁর মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করত। তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব বাবার মনে প্রতিফলিত হয়—আমার 'শান্তিময়' নামের দ্বারা। এই নামেই আমি তখন থেকে পরিচিত ছিলাম ১৯৩০-এর দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত। এই সময় আমার 'শান্তিদেব' নাম গুরুদেব দিলেন, তাঁর নিজের হাতে লেখা নৃত্য-গীত-আবৃত্তির একটি অনুষ্ঠানের কার্যসূচিতে। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম 'শান্তিময়' থেকে আমার নাম 'শান্তিদেব' করলেন কেন? তিনি বলেছিলেন, এটিই ভাল, এটিই থাকুক। তখন থেকেই আমি 'ময়' শব্দটির পরিবর্তে 'দেব' শব্দটি ব্যবহার করা শুরু করি। 'দেব' যুক্ত নামটিই স্থায়ী হয়ে গেল, 'ময়' শব্দটির কথা আজ আর কেউ জানে না।

বাবার সম্পর্কে গুরুদেবের চিঠিপত্রাদি

১৯১২ সালে ইংলন্ড থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে গুরুদেব বাবার সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'এখানে এসে কালীমোহন এবং দেবলের [নারায়ণ কাশীনাথ দেবল] সঙ্গে দেখা হয়েছে। ...কালীমোহনের সেই জ্বরের ভাব একেবারে ঘুচে গেছে, ক্ষুধার কোনও অভাব নেই, খুব চলে ফিরে বেড়াচ্চে—দেহে দুর্বলতার কোনও লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না—কিন্তু শরীরের দুর্গতি সম্বন্ধে তার সুগভীর নৈরাশ্য কিছুমাত্র কমেনি—এ বিষয়ে জগদানন্দের কাছে সে দীক্ষা গ্রহণ করেছে বলে আমার আশঙ্কা হচ্চে—এতে তার আপাতত আর কোনও অনিষ্ট দেখছি নে, কেবল ওষুধ কেনার অপব্যয় তার ক্ষতি করচে। চিরদিন দুর্বল বলেই বলের প্রতি কালীমোহনের অত্যন্ত একটা লোভ আছে, তাই ওষুধের কথা শুনলেই মনে করে এটা তার না হলেই নয়। পড়াশোনা ওদের বেশ ভালই চলচে, সবচেয়ে সুবিধা দেখচি এখানকার অনেকের সঙ্গে ওর পরিচয় জমেছে, তারা সকলেই ভাল লোক। ওর একটি গুণ আছে, আলাপ করতে ও কিছুমাত্র সংকোচ করে না—এমন কি সভায় দাঁড়িয়ে উঠে অন্য লোকের বক্তৃতার প্রতিবাদ করতেও ওর দ্বিধা বোধ হয় না—এমনি করে এই দুর্বল মানুষটি ঠেলেঠুলে এগোবার রাস্তায় আপন পথ করে নিচ্চে। কালীমোহন যেখানেই আপনার উন্নতিসাধনের কোনও একটি সুযোগের সন্ধান পায় সেখানেই দরজা ঠেলে একরকম করে ঢুকে পড়ে—এমনি করে কালীমোহন এ দেশের একটা ভিতরকার পরিচয় লাভ করতে পারচে, এ সম্বন্ধে অনেক বি. এ. এম. এ. পাস করা অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজে পড়া ছেলেদের চেয়ে ও সুবিধা করে নিতে পেরেছে।'

বাবা ইংলন্ডে গিয়ে লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়াশোনা কালে অর্থের অনটনের কারণে অন্য ধরনের কিছু কাজেও তাঁকে যে যুক্ত হতে হয়েছিল তা জানা যায় সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ১৯১৩ সালের জুলাই মাসের আর একটি চিঠি থেকে। এখানে গুরুদেব লিখেছেন—'কালীমোহন একটা দোকানে দপ্তরির কাজ শিখতে শুরু করেছে। যদি এ কাজে ওর হাত পেকে যায় তাহলে তোমাদের লাইব্রেরির একটা সদ্‌গতি হতে পারবে।'

দেশে ফিরে বাবা আমাদের বাজাপ্তি গ্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন, সে কথা আগেই বলেছি,—সেটা ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে। বলা চলে, আমার নিরবচ্ছিন্ন শান্তিনিকেতন বাস প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই শুরু। তখন থেকেই আমরা পাকাপোক্তভাবে শান্তিনিকেতনবাসী হলেও প্রতি গ্রীষ্মের এবং পুজোর ছুটিতে আসতাম আমাদের বাজাপ্তি গ্রামের বাড়িতে ঠাকুরমার কাছে। গ্রামে আসবার এবং শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার সময় চাঁদপুর শহরে আমাদের মামার বাড়িতেও

দু-চারদিন কাটাতে হত।

আমার জন্মের পূর্বের বর্ণনা যা দিয়েছি, তা আমার ঠাকুরমা, পিসিমা, পিসতুতো দাদা এবং আমাদের মা'র মুখে শুনে। পরে যা বলেছি, তা হল আমার চার বছর বয়সের পর, আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। অর্থাৎ আমার শান্তিনিকেতন জীবন যখন শুরু হয়, সেই ১৯১৩-১৪ সাল থেকে।

এর পরেই শুরু হয়ে যায় য়ুরোপে পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ।

আমার জীবনে গুরুদেব

শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্রজীবন যখন প্রথম শুরু হয়, তখন দেখতাম গুরুদেব-সহ এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছোট বিদ্যাশ্রমটি সর্বদাই এক অনির্বচনীয় আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকত। সারা দিন লেখাপড়া, গান, নাচ, অভিনয়, সাহিত্যচর্চা, কারুকলা, চিত্রকলা, নানা প্রকারের খেলাধুলা এবং বিচিত্র রকমের শারীরিক পরিশ্রমজাত কর্মজীবনের মধ্যে দিনরাত্রি কীভাবে যে কেটে যেত, তা বুঝতে পারতাম না। মনের আনন্দেই সব কিছু করে যেতাম। কখনও কোনও প্রকার ক্লান্তি বোধ করতাম না। এইভাবে কৈশোর জীবন কাটিয়ে যখন যৌবনের প্রারম্ভে নৃত্যগীত ও অভিনয়ের চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লাম, তখন গুরুদেবের প্রকৃত জীবনকে বোঝবার চিন্তা আমার মনে প্রথমে দেখা দিল। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বোধের দ্বারা গুরুদেবকে তখন পর্যন্ত খণ্ডিতভাবেই চিনেছিলাম। অর্থাৎ তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত কেবলমাত্র নাচ-গান-অভিনয় উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি আমার কাছে বিশেষ এক ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত গুরুদেবের জীবনের পরিচয় এইরূপ কয়েকটি দিককেই আশ্রয় করে আটকে ছিল। পরে তিনি যখন আমার দৃষ্টির বাইরে চিরকালের মতো চলে গেলেন, তখন আমার অন্তরে তিনি যেন তাঁর পূর্ণরূপে ধীরে ধীরে প্রতিভাত হতে থাকেন। বিদ্যালয়ে এবং বিশ্বভারতীতে নিরাসক্ত কর্মযোগের সাধনায় গুরুদেবকে বিচিত্র কর্মের মধ্যে যেভাবে যুক্ত থাকতে দেখেছিলাম বা জেনেছিলাম, ওই সময়ের সেই দেখা বা জানার রূপ আমার কাছে যেন বদলে গেল। মনে হল, প্রকৃত গুরুদেবকে সঠিক জানবার প্রবেশপথের মুখে যেন এসে দাঁড়িয়েছি। তার দরজা খুলে অত্যন্ত সন্তর্পণে যখন এগিয়ে চলেছি, তখন আমার মন বলতে লাগল, তাঁর প্রকৃত পরিচয় আমার কাছে যেন ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে। এইরূপ এক অনুভূতি অন্তরে জেগে ওঠার পর আমি আর থামতে পারিনি। কিন্তু তাঁকে যতই জানছি ততই মনে হচ্ছে, এ জানার যেন কূলকিনারা নেই। কবে যে তাঁর সামগ্রিক পরিচয়ের শেষে এসে পৌঁছতে পারব, জানি না। আমার দৃষ্টিতে, গুরুদেবের সামগ্রিক জীবনের প্রকৃত পরিচয়, যেভাবে যতটুকু এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েছে, তাকে আমার সাধ্যমতো আমার এই স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে, প্রকাশ করে বলবার চেষ্টা করেছি, গুরুদেবকে সঠিক জানবার অহংকার মনে না রেখে।

আজ মনে হচ্ছে, গুরুদেবের দ্বারা প্রবর্তিত এবং প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী হল গীতার আদর্শানুযায়ী নিরাসক্ত কর্মযোগের সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের জন্য। তাঁর জীবনের প্রকৃত পরিচয় হল, তিনি ছিলেন উপনিষদের জ্ঞান ও আনন্দমার্গের সাধক। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সাধকদের ভক্তিমার্গের নিষ্কাম প্রেমের সাধনাকেও তিনি একই সঙ্গে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে, ভক্তিমার্গের বিশেষ একদল সাধকের বিরহদর্শনও তাঁর মনকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল।

আমার উপরিস্থ এই বাক্যটিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তা না হলে, অনেকেই হয়তো মনে করবেন যে, কোনও একজনের মধ্যে এইরূপ বিচিত্রপথগামী দর্শনের

প্রকাশ কি কখনও সম্ভব ? এই শতকের আর কোনও সাধক কি এইরূপ সাধনার পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন ? গুরুদেবের সাধন-পথে পরস্পর বিরোধিতার পরিচয় কি সুস্পষ্ট নয় ? কিন্তু, আমি দৃঢ় নিশ্চয় যে, গুরুদেবের সাধনার জীবনে পরস্পর বিরোধিতা কোথাও নেই। তার কথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টায় প্রথমে শুরু করছি, ঔপনিষদিক জ্ঞানমার্গের সাধনার পথে তিনি নিজেকে কী ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন—'বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তির দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়ত। এমন সময়ে উপনয়ন হল। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমার মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে। ...

'এমনি করে ধ্যানের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকমের চিন্তার আনন্দ আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিল। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।'

উপনিষদের বিশেষ কতকগুলি মন্ত্র গুরুদেবের জীবনে কী ভাবে স্থান গ্রহণ করেছিল, তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। তিনি জানাচ্ছেন—'প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্য যে যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। ...

'আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও পিতা নোঽসি এবং অসতো মা—এই দুই মন্ত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে থাকি—করিতে করিতে যে পর্যন্ত না আমার মন এই দুই মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। ...

'আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে জানতে অভ্যাস করেছি। ...

'উপনিষদের বাণী আমি এড়াতে পারলাম না। উপায় যে নেই। বহু শতাব্দীর এইসব মন্ত্র, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাব ও ভাবনার বীজমন্ত্র। আজও যে এরা আমার প্রাণের আশ্রয়।'

জীবনের শেষ দিকে গুরুদেব যখন মংপুতে ছিলেন, তখন একদিন কথা প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীকে তাঁর প্রতিদিনের ধ্যানে বসার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'সেই বড়ো সত্তার মধ্যে দৃঢ়ভাবে সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষের আর কোনও ভয় থাকে না। যখনই কোনও কারণে চঞ্চল হই তখনই বুঝতে পারি আমার সাধনা সম্পূর্ণ হয়নি। তাই আমি ভোরবেলার সূর্যালোকে বসে প্রত্যহ চেষ্টা করি সেই ছোট আমিটার থেকে দূরে যেতে। নিজের কাছ থেকে নিজের যে মুক্তি সেই দুর্লভ মুক্তির জন্য চেষ্টা করি। সে চেষ্টা প্রত্যহ করতে হয়, তা না হলে আবিল হয়ে ওঠে দিন। আর তো সময় নেই, যাবার আগে সেই বড়ো আমিকেই জীবনে প্রধান করে তুলতে হবে। সেইটেই আমার সাধনা।'

প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে গুরুদেব কীভাবে যে ধ্যানে বসতেন, তা প্রত্যক্ষদর্শী অনুরাগীদের বিবরণ থেকেও জানা যায়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর 'কবিস্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'গুরুদেব সূর্য ওঠার আগে থেকেই উঠে বসতেন। বলতেন, শেষ রাত্রে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোট-আমির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড়ো-আমির মধ্যে আপনাকে মিলিয়ে দিতে। পারি নে তা নয়। কিন্তু একটু সময় লাগে। ...

'দেখেছি যে, শেষরাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ তখন সহজে এটা হয়। তাই ঘুমিয়ে এ সময়টা ব্যর্থ করতে ইচ্ছা হয় না। ছেলেবেলায় বাবামহাশয় রাত চারটের সময় ঘুম থেকে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতেন। তখন ভাবতুম কেন আর একটু শুয়ে থাকতে দেন না। এখন তার মানে বুঝতে পারি। ভাগ্যিস তিনি এই অভ্যাস করিয়েছিলেন। এতে যে আমাকে কত সাহায্য করে তা বলতে পারি না।'

প্রশান্তবাবু আরও জানাচ্ছেন—'রাত্রে শুতে যাবার আগেও সেইরকম চুপ করে বসে থাকতেন। বলতেন—সারা দিনের ছোটখাটো কথা, সব ক্ষুদ্রতা, সমস্ত গ্লানি একেবারে ধুয়ে মুছে স্নান করে শুতে যেতে চাই। —এই যে প্রতিদিনের ধ্যানের অভ্যাস বাইরের লোকের কাছে তা জানাতেও যেন একটু সংকোচ ছিল। তাঁর নিজের কাছে এর এমন গভীর মূল্য, পাছে অন্য লোকের কাছে হালকা হয়ে যায়। যাদের সত্যি শ্রদ্ধা আছে তাদের সঙ্গে নিঃসংকোচে আলোচনা করতেন।...

'রাত হয়ত এগারোটা বারোটা বেজে গিয়েছে, তখনও কবি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন।...আবার সূর্য ওঠার আগেই উঠে দেখি কবি পুব দিকে মুখ করে ধ্যানমগ্ন।'

'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী ছিলেন গুরুদেবের স্নেহধন্যা। তিনি তাঁর এক স্মৃতিচারণে গুরুদেব সম্পর্কে বলছেন—'কত ভোরেই যে তিনি উঠতেন জানি না। কিন্তু যখনই উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখেছি তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে, দোতলার ছাদে তাঁর ধ্যানের আসনে বসে আছেন, মুদ্রিত নেত্রে। কখন তিনি ওঠেন জানবার আগ্রহে আরও ভোরে উঠেছি, কিন্তু কখন যে তিনি আসনে এসে বসতেন, তা দেখতে পাইনি।...অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকতেন। সকালের আলো এসে যখন তাঁর মুখের উপর পড়ত, তখন উঠে ঘরে ঢুকে যেতেন।'

উপনিষদের আনন্দ মন্ত্রটিও ছিল গুরুদেবের জীবনসাধনার বিশেষ অঙ্গ। মন্ত্রটি হল—'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশান্তি চ।' এই মন্ত্রটিকে নিজস্ব অনুভূতির দ্বারা সম্পূর্ণ নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে, লিখে গেছেন—

'উপনিষদ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবনের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকল জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দ-সমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তারপরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক-না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে। তারপর কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে, সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।'

উপনিষদের এই আনন্দমন্ত্র, গুরুদেবের পরিপূর্ণ জীবনসাধনার যে অপর একটি আবশ্যিক অঙ্গ ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর সেই মন্ত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা পাঠ করে। সেখানে তিনি, একস্থানে লিখেছেন—'বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা।' গুরুদেব বলতে চাইছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি স্রষ্টা, তিনি নিজে নির্মল আনন্দ উপভোগের প্রেরণায় সব কিছুরই সৃষ্টি করে চলেছেন, প্রকৃত শিল্পীর মতো। সুতরাং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তাঁরই সৃষ্ট মানুষের কর্তব্য হবে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে, সেইরূপ নির্মল আনন্দ উপভোগের পরিবেশ রচনা করা। এর জন্যেই, যুগে যুগে মানুষ নির্মল আনন্দ উপভোগের বাতাবরণ রচনা করে এসেছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। মূর্তিকলা, স্থাপত্যকলা, চিত্রকলা, কারুশিল্প, নিজের বসন-ভূষণের রূপসজ্জা, নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়, গদ্য, পদ্য, নাটক রচনার চর্চা যেভাবে মানুষ করছে, তা যে তাদের সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভেবে নয়, এ কথা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি। বিভিন্ন কলার শিল্পীরা অহেতুক আনন্দ উপভোগের প্রেরণাতেই সব কিছুর সৃষ্টি করে থাকেন। গুরুদেব চেয়েছিলেন তাঁর নিজের জীবনটিকে এইরূপ এক অহৈতুক আনন্দ উপভোগের সাধনায় বিচিত্রপথে নিমগ্ন রাখতে। এটি ছিল তাঁর জীবনের সার্বিক সাধনার অপর একটি বিশেষ অঙ্গ।

গীতার নিরাসক্ত কর্মযোগকে গুরুদেব তাঁর ঔপনিষদিক জ্ঞানমার্গের বিস্তারের সঙ্গে যেভাবে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তাতে তাঁর কর্মচিন্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন—'আনন্দের ধর্ম

যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতা একেই বলেছেন কর্মযোগ।...

'গীতা বলেছেন ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে।...

'এই জন্যেই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন।...

'কর্মেই আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়।...

'ঈশোপনিষদের কবি ঘোষণা করেছেন কর্মের মধ্যেই জীবন, কর্মই আত্মাকে ব্যক্ত করে।'

গুরুদেব বলেছেন—'মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ। জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই।...

'মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্মে যিনি বিশ্বকর্মা, আমি জেনে না জেনে সেই দেবতাকেই মেনেছি।...

'এই মনের মানুষই তো আমাকে একদিন আত্মনিবিষ্ট সাহিত্য সাধনার গণ্ডী থেকে শান্তিনিকেতনের কর্মক্ষেত্রে টেনে এনেছিল।'

এইরূপ নিরাসক্ত কর্মযোগের প্রত্যক্ষ পরিচয় গুরুদেব রেখে গেছেন, তাঁদের জমিদারির শিলাইদহ অঞ্চলে বাসকালে এবং পরে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা। সব মিলিয়ে, একটানা প্রায় পঞ্চাশ বছর নিরাসক্ত কর্মযোগী হিসেবে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। এ সময়ে, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মনে দেশের নানা স্তরের মানুষের সার্বিক উন্নতি কীভাবে সম্ভব তার কথা ভেবেই কর্ম করে গেছেন। কখনও নিজের বা নিজেদের পরিবারের স্বার্থের কথা ভাবেননি।

ভক্তিমার্গের সাধনার ধারাও গুরুদেবের মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর বাল্যবয়স থেকেই। কীভাবে তার সূত্রপাত হয়েছিল, তার বিবরণ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পিতার ধর্মজীবনের সঙ্গে জড়িত ভক্তি বা প্রেমমার্গের কথায়। গুরুদেব বলছেন—'পিতার ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনও বিষয়কেই অবজ্ঞা করেনি—সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ডালহাউসি পর্বতে একবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্বত্য গৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার কণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করতেন, তেমনি আবার জ্ঞান-আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রকটরের তিনখানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কান্টের দর্শন ও গিবনের রোমের ইতিহাস ছিল—তা ছাড়া এ দেশের ও ইংলন্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞান ও কর্মে বিশ্ব-পৃথিবীতে মানুষের যত কিছু পরিণতি ঘটেছে সমস্তই মনে মনে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মেকর্মে সর্বপ্রকার সীমা লঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলি রাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয়নি।'

পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঠিক পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে গুরুদেবের উপরিস্থ উক্তিটি একটি মূল্যবান দলিল বলেই আমি মনে করি। তার কারণ, গুরুদেবের সার্বিক জীবনের যে পরিচয় আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, তাতে পাচ্ছি প্রায় তাঁরই পিতৃদেবের প্রতিচ্ছবি। গুরুদেবের জীবনে অন্যান্য সাধনমার্গের সঙ্গে ভক্তি বা প্রেমমার্গের সাধনার বীজ রোপিত হয়েছিল এই সময়ে—হাফেজের ভক্তির গান ও ব্রহ্মসংগীতের দ্বারা তাঁর বাল্যজীবনেই। পরবর্তী কালে এই সাধনা গুরুদেবের জীবনে কীভাবে বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল, তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

গুরুদেব ভক্তি বা প্রেমমার্গের সাধনপথে, গভীরভাবে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন কৈশোরে, মূলত বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেরণায়। পরে অবশ্য তিনি বৃন্দাবনধামের বৈষ্ণবদের সাধনার

গতি-প্রকৃতিকেও জেনেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকলেও তাকে কখনও অবহেলা করেননি।

আমরা জানি, গুরুদেব যখন বারো-তেরো বছরের বালক, তখন সে যুগের সারদাচরণ মিত্র ও সরকার-কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নামক একটি গ্রন্থ থেকে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করে কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারই প্রেরণায় এবং প্রভাবে, সেই বয়সেই রচনা করেছিলেন, 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামে বিদ্যাপতির অনুসরণে একগুচ্ছ কবিতা। এ যুগেই, গুরুদেব ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার একসঙ্গে বহু পরিশ্রমে 'পদরত্নাবলী' নামে একটি পদাবলী-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। পদাবলী সংগ্রহ ও নির্বাচনের জন্য তাঁদের উভয়কে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ১৩২৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বাংলার বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী সংগ্রহ করে, টীকা সহ সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্বও গুরুদেবকে নিতে হয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য কাজের চাপে ও সময়াভাবে, সেই কাজ শেষ করে প্রকাশ করতে পারেননি। কাজটি অসমাপ্তই রয়ে যায়। ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যে অব্যাহত ছিল তাও জানা যায়।

চৈতন্যদেবভক্ত বৈষ্ণবগণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত হল, চৈতন্যভক্ত অদ্বৈতাচার্যের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেব, কৃষ্ণের অবতাররূপে খ্যাত হয়েছিলেন। 'মুরারির কড়চা', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ইত্যাদিতে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণরূপে এবং তাঁর বাল্যলীলাকেও কৃষ্ণলীলার মতো করে বিবৃত করা হয়েছে। ষষ্ঠদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নবদ্বীপবাসীরা তথা চৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালিরা শ্রীচৈতন্যকেই কৃষ্ণ-অবতাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তৎকালীন দীক্ষিত বৈষ্ণবদের উৎসাহে যে-সব চৈতন্য-চিত্র আঁকা হয়েছে সেখানে চৈতন্যকে তাই কৃষ্ণের মতো করে, প্রেমাবতাররূপে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং গৌরাঙ্গের 'অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে রাধা'—ভাবরূপ আরোপ করে রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপের মাধ্যমে তাঁকে একই সঙ্গে ভক্ত ও অবতাররূপে দেখানো হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বৈষ্ণব ভক্তগণ কিন্তু ভিন্ন পথে তাঁদের ভক্তির গান রচনা করতেন। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণ নিজেদের নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়করূপে ভজনা করতেন। উত্তর ভারতের পুষ্টিমার্গের প্রবর্তক শ্রীবল্লভাচার্য ভজনা করতেন বাল্যরূপের গোপালকৃষ্ণকে। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পুত্র বিঠ্ঠলনাথজি আচার্যরূপে যখন অধিষ্ঠিত হন, তখন এই ভক্তসম্প্রদায়কে বলা হত অষ্টছাপ। বিঠ্ঠলনাথজি তাঁর পিতার মতানুযায়ী চলেননি। তাঁর প্রভাবে অষ্টছাপের আটজন ভক্তকবি রাধা ও কৃষ্ণকে তাঁদের সাধনায় বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। অষ্টছাপের আটজন ভক্তকবি নিজেদের কৃষ্ণের সখা ও সখীরূপে ভাবতেন। তাঁরা রাধাভাবে বা গোপীভাবে কৃষ্ণপ্রেম আকাঙ্ক্ষা করতেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ওই অষ্টছাপ সম্প্রদায়ের আটজন ভক্ত মনে করতেন, তাঁরা দিনে কৃষ্ণের সখা, আর রাত্রিকালে কৃষ্ণের সখী। অসমের প্রখ্যাত বৈষ্ণব শঙ্করদেব ছিলেন বালগোপাল বা কৃষ্ণের বাল্যলীলার সাধক।

অষ্টছাপ সম্প্রদায়ের যুগে প্রখ্যাতা বৈষ্ণব সাধিকা মীরাবাঈকে আমরা পাই। তিনি কৃষ্ণকে পিতম্ (প্রিয়তম) হিসেবে গ্রহণ করে, আজীবন সেইরূপ প্রেমের গান রচনা করে গিয়েছিলেন। নিজেকে তিনি রাধা ভেবে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম নিবেদনের গানই কেবল গেয়ে গেছেন।

মরাঠা অঞ্চলের বৈষ্ণব কবিরা নিজেদের কৃষ্ণের পত্নীরূপে ভজন-সাধন করতেন।

গুরুদেব নিজেও পশ্চিম ভারতের মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কেও খবরাখবর যে রাখতেন, তারও পরিচয় পাই তাঁর শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে। তাঁর সেই ভাষণ থেকে আমরা জেনেছি যে, সে যুগের বৈষ্ণব ভক্ত জ্ঞানদাস তাঁর গানের মাধ্যমে তাঁর ভগবান বা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে, কীভাবে নিজেকে তাঁর পত্নীরূপে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন—

'প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কী স্বামী।'

সেই কবিতা বা গানটিকে ব্যাখ্যা করে গুরুদেব বলেছিলেন-–'আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার

তোমার সঙ্গে বহন করব।... আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে।' গুরুদেব জ্ঞানদাসের আরও একটি গানকে বাংলায় অনুবাদ করে জানাচ্ছেন—তাঁর ভজন-সাধনের প্রকৃত পরিচয়। অনূদিত গানটি হল—

'আমি তোমার ধর্মপত্নী,
ভোগের দাসী নহি।
তোমার কাজে লাজ কী স্বামী,
নিষ্কপট কহি।'

মধ্যযুগের ভারতীয় বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছিল ভক্তি বা প্রেম-সাধনার প্রাবল্য। ভক্তদের পরিচয় থেকে জানা যায়, তাঁরা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে কৃষ্ণের ভজনা করতেন। যেমন, কখনও পত্নীরূপে, কখনও রাধারূপে, কখনওবা প্রণয়ীরূপে কিংবা গোপীরূপে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের লীলা আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায়। গুরুদেব বৈষ্ণবদের ওইসব লীলার পরিচয়ে মুগ্ধ হলেও, তাঁদের মধ্যে নিরাকার পরমাত্মার প্রতি ওই প্রকার ভক্তি বা প্রেম-সাধনার উল্লেখযোগ্য পরিচয়ের অভাব লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু, তিনি তিরিশ বছর বয়সের প্রাক্কালে এর অভাব থেকে মুক্তি পেলেন, বাংলার ভক্তিমার্গের অন্যতম প্রখ্যাত সাধক লালন ফকিরের সাধনপথের পরিচয় যখন পেলেন, তখন জানলেন, লালন নিরাকার এক প্রেমিকের প্রতি তাঁর বিরহদর্শনের কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর এই পথের ভক্তি বা প্রেমসাধনায় কৃষ্ণ, রাধা বা চৈতন্যদেবকে বিশেষ গুরুত্ব তিনি দেননি। গুরুদেব এই সম্প্রদায়ের নিরাকার এক মনের মানুষের প্রতি প্রেমের ব্যাকুলতার পরিচয়ে জানলেন যে, এঁরা এমন একজন পরমাত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত যিনি প্রতিটি মানুষের অন্তরে গোপনে বিরাজ করে অন্তরে অবস্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। স্থায়ীভাবে ভক্তের অন্তরে ধরা দিচ্ছেন না, প্রয়োজনমতো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বা লুকোচুরি খেলছেন। লালন ও তাঁর শিষ্যরা এঁকেই তাঁদের 'মনের মানুষ', 'প্রাণের মানুষ', 'অচিন পাখি', 'অধরা' ইত্যাদি কয়েক প্রকার নামে উল্লেখ করেছেন। এঁদের এই মনের মানুষের প্রতি বিরহ-বেদনাযুক্ত এক বিশেষ দর্শনের বিষয় নিয়ে, শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দিরের এক ভাষণে গুরুদেব যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃতি করছি এই ভেবে যে, এর দ্বারা লালনের বিরহদর্শনকে বোঝা হয়তো সহজ হবে। গুরুদেব বলেছিলেন—'অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনও উপায় নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতর জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ। তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে ॥

'সে যে কে তা তো আপনাকে কোনও সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না—তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনওখানে এসে বন্ধ হবে না। "কোথায় পাব তারে"? কোনও বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া—আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।...

'মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে—এমন করেই তো তার সমস্ত দু'সাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে; যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে, "আমি কোথায় পাব তারে"? সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাকে পাওয়ার মধ্যেই তাকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারে ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে

অবিরত আপনাকে নব নব রূপ উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই যে একটি চিরবিরহ আছে, এ বিরহ তো কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না। জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে, ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে দিকেই মানুষ বলেছে "আমি চিরকালের মতো পৌঁচেছি—আমি পেয়ে বসে আছি"—এই বলে যেখানেই তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই যে তার চিরকালের গান—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

এই প্রশ্ন যে তার তার চিরদিনের প্রশ্ন—

মনের মানুষ যেখানে
বল কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে।

কেন না, সন্ধান এবং পেতে থাকা একসঙ্গে ; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।'

লালন ফকির ও তাঁর শিষ্যদের এইরূপ এক বিরহদর্শনের প্রভাবে গুরুদেব যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই, ১৯২৪ সালে কলকাতায় The Indian Philosophical Congress -এর সভাপতির ভাষণে। ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে 'হিবার্ট বক্তৃতা' দিতে গিয়ে এই বাউলদের কথাই বলেছিলেন সেখানকার বিদেশিদের কাছে। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা বক্তৃতা'য় 'মানুষের ধর্ম' নিয়ে যা বলেছিলেন, তাতেও ছিল তাদেরই কথা। কিন্তু এই বাউলদের বিরহদর্শনের চিন্তাকে তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করে, নিজের জীবনে সাহসের সঙ্গে যেভাবে নিজের গানে প্রকাশ করে গেছেন, তার পরিচয় পাই তাঁর 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য' কাব্যগ্রন্থের গানগুলিতে। তাঁর পরবর্তী ঋতুপর্যায় ও পূজা পর্যায়ের গানেও তিনি একটানা প্রকাশ করে গেছেন একই প্রকার বিরহ-বেদনার কথা, নানাভাবে। যাঁকে ভালবাসার আবেগ অন্তরে অনুভব করেছেন, স্থায়ীভাবে তাঁকে অন্তরে ধরে রাখতে চেয়েছেন, তা যে সম্ভব হচ্ছে না, সে কথা জেনে তিনি হতাশ হয়ে সে পথ ত্যাগ করেননি। বিরহ-বেদনাকে বাউলদের মতোই উপভোগ করে গেছেন। তা হলেও, তিনি কিন্তু লালনদের সীমাবদ্ধ ভাবধারার মধ্যে ব্যাপ্তির পথও দেখিয়ে গেছেন, বাউলদের মূল বিরহদর্শনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা রেখে।

সে যুগের বাউলদের সঙ্গে আলোচনাসূত্রে গুরুদেব বিশেষ করে যে কথাটি জেনেছিলেন তার বিষয়ে তিনি বলেছেন— 'কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম— তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী, আমাকে বলতে পার ? একজন বললে— বলা কঠিন, ঠিক বলা যায় না। আর একজন বললে— বলা যায় বইকি— কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশ— গোড়ায় আপনাকে জানতে হবে। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাকে পাওয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম— তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন ? সে বললে— যার পিপাসা হবে, সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম— তাই কি দেখতে পাচ্ছ ? কেউ কি আসচে ? সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে— সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

গুরুদেব এই কথার জের টেনে বলছেন— 'আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলার পল্লীগ্রামের শাস্ত্র শিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলেনি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে— আর যাবে কোথায় ?'

গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবন তারই এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁর মতো মানুষকে এঁদের কাছে আসতে হয়েছিল। গুরুদেবের মতে— 'মানুষের অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে সে পথে বেরিয়ে

পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন ? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন এবং বাংলার পল্লীগ্রামের বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে— আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড় আপন, তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকে বিশুদ্ধ করে, প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করছে।'

গুরুদেব বলছেন— 'অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না, চারিদিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু, আপনাকেই তার সবচেয়ে দরকার— তার যতকিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাইনি, ওটা পাইনি ; ততক্ষণ যা কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেননা, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই, ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনও জিনিসকেই পাই নে। এমন কোনও আধার থাকে না যার মধ্যে কোনও কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। ...কিন্তু আত্মাকে যখনই পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিন্ত করে ধরতে পারি, তখনই সেই ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে চারিদিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে।'

যে বাউলটি গুরুদেবকে বলেছিল— গুরুর উপদেশ গোড়ায় আপনাকে জানতে হবে, যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। —এই বাক্যটির জের টেনে গুরুদেব উপরিস্থ কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু নিজের গানের মাধ্যমে আপনাকে এই জানা বা পাওয়ার কথাকে গুরুদেব সুরে তালে লয়ে কতখানি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, তার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না।

যেমন—

'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা'

অথবা—

'আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।'

বাংলার লালন ফকির ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরহদর্শনের কথাপ্রসঙ্গে পূর্বে যে আলোচনা করেছিলাম, গুরুদেব তাকে কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর গানের মাধ্যমে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। লালন ও তাঁর শিষ্যের দ্বারা রচিত যে দুইটি গানের উল্লেখ গুরুদেব বিশেষভাবে করেছিলেন, তা হল—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

অপর গানটি হল—

'কথা কয় কাছে দেখা দেয় না,
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে
জনমভোর মেলে না।'

এবার দেখা যাক, বাউলদের বিরহদর্শন গুরুদেবকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, যে কারণে তাঁর গানের মাধ্যমে তার প্রকাশ তিনি ব্যাপকভাবে না করে থাকতে পারেননি —

(১) আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, (২) সে যে মনের মানুষ, (৩) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, (৪) আমার মন যখন জাগলি না রে, (৫) মন রে ওরে মন, তুমি কোন্ সাধনার ধন, (৬) আমার সকল নিয়ে বসে আছি, (৭) কাঁদালে তুমি মোরে, (৮) যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, (৯) আমার হিয়ার

মাঝে লুকিয়েছিলে, (১০) আমার মনের কোণের বাইরে ; ইত্যাদি।

লালন ফকিরের 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি' গানটির সঙ্গে গুরুদেব খুবই পরিচিত ছিলেন। বাউলদের মনের মানুষকে তাঁরা 'অচিন পাখি' নামেও অভিহিত করতেন, আবার 'অধরা'ও বলতেন। তাঁরা দেহের মধ্যে অচিন পাখির আনাগোনা অনুভব করতেন, কিন্তু তাঁকে ধরা যেত না, সেই কারণেই তিনি 'অধরা'ও। বাউলদের এই অচিন পাখিকে নিজের জীবনে স্বীকৃতি দিয়ে গুরুদেব তাঁর গানে বললেন— (১) পাখি আমার নীড়ের পাখি, (২) বনে যদি ফুটল কুসুম, নেই কেন সেই পাখি (৩) কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি (৪) কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায় (৫) আমি কান পেতে রই, ও আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে ; ইত্যাদি।

এইভাবে গুরুদেব উপনিষদের জ্ঞান ও আনন্দমার্গের চিন্তা, গীতার কর্মযোগ, বৈষ্ণবদের ভক্তিমার্গের সাধনার সঙ্গে, বাংলার বাউলদের মনের মানুষের প্রতি বিরহদর্শনকে একত্রে সমন্বয়ের দ্বারা নিজের জীবনকে যে ভাবে পরিচালিত করেছিলেন, তার জন্য তিনি যে নতুন এক দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তক, এ কথা অনায়াসেই বলা চলে। উপনিষদগুলিকে নিয়ে বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে, যার মধ্যে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ও রামানুজাচার্যের ভক্তিবাদ সর্বজনবিদিত। মহাযান বৌদ্ধধর্মের এক শাখাকে সর্বাস্তিবাদী বলা হত। গুরুদেবের দ্বারা প্রচারিত দর্শনকে আমি এ যুগের উপযোগী নতুন সর্বাস্তিবাদী দর্শন যদি বলি তাতে আপত্তি করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। গুরুদেবের এই দার্শনিক ভাবনা শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পিছনে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। তাঁর এই দার্শনিক চিন্তার বিষয়ে আমি যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। প্রথম যুগের ছাত্রদের এন্ট্রান্স ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কার্যসূচির সঙ্গে ব্যাপকভাবে নানা প্রকার সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক বিষয়ের চর্চার যে ব্যবস্থা তিনি এখানে করে গিয়েছিলেন তাঁর এই দার্শনিক ভাবনা থেকেই তা উদ্ভূত।

সর্বাস্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তা

গুরুদেবের এই সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক মতবাদকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি বলেই তিনি তাঁর কাব্যে ও ভাষণে তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

বলেছেন— 'সংসারের তিমিরান্ধকারের মধ্য হতেই আলোকের পথ আবিষ্কার করতে হবে, জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানতে হবে।'

একটি প্রবন্ধে তিনি নিজের এই সর্বাস্তিবাদী দর্শনকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

'এতদিন আমি নিজের আত্মিক নির্জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দকে সংহতভাবে লাভ করবার জন্যে সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলুম। যে কারণেই হোক সেই নিঃসঙ্গতা থেকে আমি বেরিয়ে এসেচি। অতিশয় একান্তভাবে নিজের সত্তার নিগূঢ় মূলে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া আমার চলল না, যে বিচিত্র সংসারে আমি এসেছি, আপনাকে ভুলে সহজভাবে সেখানে আপনাকে লাভ করতে হবে— এই দিকেই আমাকে ভিতর দিক থেকে ঠেলে পাঠালে।...

'আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে— আমি সমগ্রকেই জানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণার দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ করে তবেই সফল হয়ে ওঠে — আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি— সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করে সমস্তর ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ

করে সার্থক হতে পারবে। ...

'এই যে বিচিত্ররূপী সমগ্র, এর সঙ্গে ব্যবহার রক্ষা করতে হলে একটি ছন্দ রেখে চলতে হয়, একটি সুষমা, যদি তাল কেটে যায় তবেই সমগ্রকে আঘাত করি এবং তার থেকে দুঃখ পাই, বস্তুত যখনি কিছুতে উত্তেজনার উগ্রতা আনে তার থেকে আমি এই বুঝি, —ছন্দ রাখতে পারলুম না, তাই সমগ্রের সঙ্গে সহজ যোগসূত্রে জটা পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ করে জটা খোলবার সময় আসে। ...

'এমন প্রায়ই ঘটতে থাকে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে জীবনের সহজ সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে নিজেকে নিরাপদ করা আমার দ্বারা ঘটল না। বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি তাকে কোনও আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে বঞ্চিত করা হবে এই আমার বিশ্বাস। যদি এই বিরাট সমগ্রের মধ্যে সহজ বিহার রক্ষা করে চলতে পারি তবে নিজের অগোচরে স্বতই পরিণতির পথে এগোতে পারব— ফল যেমন রৌদ্রে বৃষ্টিতে হাওয়ায় আপনিই তার বীজকে পরিণত করে তোলে। আমি তাই নানা কিছুকেই নিয়ে আছি— নানাভাবেই নানাদিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, আমি তা অনুভব করিনে। আমি নাচি গাই লিখি আঁকি ছেলে-পড়াই গাছপালা আকাশ আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই। কঠিন বাধা আসে লোকালয় থেকে— এত জটিলতা এত বিরোধ বিশ্বে আর কোথাও নেই। সেই বিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার এই চেষ্টার অবসান হবে না। ...

'আমার নিজের ভিতর থেকে আশ্রমে যদি কোনও আদর্শ কিছুমাত্র জেগে থাকে তবে সে আদর্শ বিশ্বসত্যের অবারিত বৈচিত্র্য নিয়ে। এই কারণেই কোনও একটা সংকীর্ণ ফল হাতে-হাতে দেখিয়ে লোকের মন ভোলাতে পারব না— এই কারণেই লোকের আনুকূল্য এতই দুর্লভ হয়েছে এবং এই কারণেই আমার পথ এত বাধা-সংকুল। এক দিকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সুরুলের দরিদ্র চাষী পর্যন্ত সকলের জন্যে আমাদের সাধনক্ষেত্রে স্থান করে দিতে হয়েছে। সকলেই যদি আপনাকে প্রকাশ করতে পায় তবেই এই আশ্রমের প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে পারবে— তিব্বতী লামা এবং নাচের শিক্ষক কাউকে বাদ দিতে পারলুম না।'

অন্যত্র আর একটি প্রবন্ধে, তাঁর জীবনের সর্বাস্তিবাদী দার্শনিক মতবাদকে প্রায় একইভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন— 'আমি বিচিত্রের দূত। নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর আমি তাঁরই দূত। ...যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে সুখ-দুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালমন্দের দ্বন্দ্বে— তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি। এই আশ্রমের নীলাকাশ উদয়াস্তর প্রাঙ্গণে এই সব বালক-বালিকার লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম। লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ। আমার সার্থকতা।'

উপাসনার গানে লালন ফকিরের বিরহদর্শন

কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১২৯৩ (১৮৮৭) সালের ১১ মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনার জন্যে গুরুদেবকে কিছু গান রচনা করতে হয়েছিল। সেই গানের গুচ্ছে 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে/ হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে' গানটিও ছিল। গুরুদেবের বয়স তখন ২৫ বছর।

ঊনবিংশ শতকের এই দশকেই একই ভাবধারা অবলম্বনে রচিত গুরুদেবের আরও দুটি গান আমরা পাই, যথা— 'আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি ?/ তবু হেরি না তোমার জ্যোতি,/ কেন

দিশাহারা অন্ধকারে ?' অথবা, 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।/ তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি ॥'— এই ক'টি গানের সূত্র ধরে যে প্রশ্নটি মনে জাগে, তা হল, লালন ফকির সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পূর্বেই এইরূপ একটি বিশেষ দার্শনিক চিন্তার খবর গুরুদেব পেয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, 'এই ফকিরদের মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন culture-এর একটা ধারা এদের মধ্যে ফল্গুর মত প্রবাহিত রয়েছে।' বলেছেন, "অন্তরতম যদয়মাত্মা"— উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে মনের মানুষ বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।' এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনার চিন্তা গুরুদেবের মনে লালন ফকির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে উপনিষদের বাণী থেকেই প্রথম উদয় হয়েছিল। উপনিষদের এইরূপ প্রাচীন দার্শনিক চিন্তার প্রবাহ যে বয়ে আসছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়নি ; লালন ফকির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীর নিষ্ঠাসহ আলোচনার পর গুরুদেব তা পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই লালন ফকিরের বিরহদর্শনের চিন্তা অন্তর থেকে গ্রহণ করতে তিনি কোনও প্রকার অসুবিধে বোধ করেননি।

গুরুদেবের সর্বাস্তিবাদী জীবনদর্শনের পরিচয়টিকে এইরূপে সঠিক না জানা পর্যন্ত তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে, বিশ্বভারতী নামে বিরাট প্রতিষ্ঠানের নানা প্রকৃতির শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কোন আদর্শে তিনি একত্র করে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাকে সঠিকভাবে চিনে না নেওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়— এই হল আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ সম্পর্কে আকস্মিক অভিজ্ঞতা

সর্বাস্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত গুরুদেবের জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় আমার কাছে কীভাবে যে একদিন আকস্মিক প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর তিরোধানের কয়েক বৎসর পূর্বে, সে কথা জানিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গটির সমাপ্তি টানব।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে। ১০ সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহরে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পূর্বের প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের অসুখটা পুনরায় ভীষণভাবে চাড়া দিয়ে উঠল। এর আগের দিন পর্যন্ত গুরুদেব ছিলেন খোসমেজাজে। নানাজনের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি কতটা অসুস্থ তা বুঝতে দিচ্ছিলেন না কাউকে। সেই সময় তাঁর সেবাযত্নের সুবিধার্থে তাঁকে রাখা হয়েছিল উদয়ন বাড়ির একতলার দক্ষিণ দিকের একটি বড় ঘরে। হঠাৎ দুপুরে দেখা দিল তাঁর চেতনাহীন অবস্থা। যাকে ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে কোমা। তাঁকে সর্বাঙ্গ সাদা চাদরে আবৃত করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল। চেতনাহীন অবস্থায় আপনা থেকেই কখনও কখনও মূত্রত্যাগ করছিলেন। সেবক-সেবিকারা বিছানার চাদর বদল করে দিচ্ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ করের ব্যবস্থাপনায় দিন ও রাত্রির জন্যে সেবক-সেবিকার দল ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি রাত ৯টা/১০টার পরে গুরুদেবকে দেখাশোনার জন্য যাঁদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সচ্চিদানন্দ রায় (আলু), বিশ্বরূপ বসু ও আমি। ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুরুদেব অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি যে ঘরে ছিলেন, তারই লাগোয়া পুব দিকের একটি ছোট ঘরে প্রবেশের দরজাটি খুলে তাঁর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে মৃদুস্বরে আমরা কথাবার্তা কইছিলাম।

রাত তখন ১২টা কি ১টা হবে। হঠাৎ একটি শব্দ আমাদের কানে এল। গুরুদেবের ঘরে নীল রঙের একটি বাল্‌ব জ্বলছিল। তার সেই ক্ষীণ আলোকে ঘরের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমরা সচকিত হয়ে উঠে দেখি, গুরুদেব তাঁর খাটের এক পাশে নেমে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। সুধাকান্তদা ও সচ্চিদানন্দদা ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন যাতে পড়ে না যান। সেই

অবস্থায় তিনি ক্রমাগত মৃদুস্বরে বলছিলেন, তিনি পাশের টয়লেটে যাবেন। আমি সেই ঘরের দরজায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার দুই চোখ অপার বিস্ময়ে তখন স্থির হয়ে গেছে। দেখলাম— আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহ। আস্কন্ধ লম্বিত শুভ্র কেশদাম ও আবক্ষ বিস্তৃত শুভ্র শ্মশ্রুরাজি। মাথা থেকে শুরু করে দেহ ও পা পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল শুভ্র একটি জ্যোতি। মন বলতে লাগল কোনও এক মহাযোগী ঋষি— যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন পরম বিস্ময়ে অভিভূত। ভাবছি এই জ্যোতির্ময় পুরুষটি কে ? তিনিই কি আমাদের গুরুদেব ? যে মুহূর্তে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল, আমার দৃষ্টি থেকে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষও হারিয়ে গেলেন। দেখলাম, আমাদের প্রতিদিনের দেখা স্বাভাবিক রূপেই তিনি যেন শুয়ে আছেন। যেভাবে সেদিন দেখেছিলাম, সে কথা যখনই মনে জেগেছে, তখন মনে হয়েছে,— তা কি সম্ভব, না এ আমার দৃষ্টির বিভ্রম। কিন্তু কেন জানি না দৃষ্টিবিভ্রমের কথায় মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। মন বলছে, এ সত্য, সবই সত্য। সর্বাস্তিবাদী দার্শনিক আদর্শে পূর্ণ বিকশিত গুরুদেবের মতো জ্যোতির্ময় রূপের প্রকাশ কখনও মিথ্যা হতে পারে না, এই হল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেদিনের কথা যখনই ভাবি, তখনই সে দিনের সেই ছটা আমার মনে পরিষ্কারভাবে বিভাসিত হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম

শান্তিনিকেতনের আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে জানা যায়, গুরুদেবের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বৃদ্ধ বয়সে যখন বিশ্ববিধাতা পরমপুরুষ পরমব্রহ্মের উপাসনা ও ধ্যানের প্রয়োজনে নির্জন পরিবেশের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বোলপুর শহরের উত্তরে বৃক্ষলতাহীন শুষ্ক ও কঙ্কর মিশ্রিত বিরাট প্রান্তর, যাকে অনায়াসে বলা চলে তেপান্তরের মাঠ, তা তাঁর গোচরে আসে। এই বিশাল প্রান্তরের মাঝে ছিল দুটি মাত্র অতি প্রাচীন ছাতিম গাছ। সেই গাছ দুটিকে কেন্দ্র করে মহর্ষিদেব স্থির করেন এই প্রান্তরেই তিনি তাঁর ধ্যানের আসন পাতবেন। এই প্রান্তরটি ছিল, বোলপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে, অজয় নদের উত্তর পারে অবস্থিত, 'রায়পুর' নামক গ্রামের জমিদার— সিংহ পরিবারের। পূর্বে এই পরিবারের নীলকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে মহর্ষিদেবের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সেই সুবাদে ১২৬৯ সালে সিংহ পরিবারের প্রতাপনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে এই প্রান্তরের কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করে, প্রথমে বর্তমান মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত বিরাট দোতলা পাকা বাড়িটি এবং ওই জমির দক্ষিণ পশ্চিমের কোণে আর একটি একতলা তিন প্রকোষ্ঠের একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করান। দোতলা বড় বাড়িটির দক্ষিণমুখী নীচের তলায় ছিল গাড়ি বারান্দা।

এই জমির অন্তর্গত প্রাচীন ছাতিম গাছের পাদদেশে পশ্চিমমুখী একটি মর্মর নির্মিত বেদি রচনা করান। শান্তিনিকেতনে যখন আসতেন, তখন ওই বেদিতে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে ঈশ্বরের উপাসনায় মগ্ন হতেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসে। মহর্ষিদেব শান্তিনিকেতনে শেষবার এসেছিলেন ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে (১৮৮৩ সালে)। এর পরে আর কখনও তিনি শান্তিনিকেতনে আসেননি। কিন্তু শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাঁর মনে ছিল। কলকাতায় বসেই, ঢালাই লোহার ফ্রেমে গঠিত এবং নানারঙের কাচের দেওয়ালযুক্ত মন্দিরটির চিন্তা তাঁর মনে জাগে। একটি বাঙালি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারকে নিযুক্ত করে, তাঁকে মন্দির তৈরির দায়িত্ব দেন। মন্দিরের ভিতরকার মেঝে হল মার্বেল পাথরের, তার বাইরের চারদিকে হল বালি পাথরের একটানা সিঁড়ি। মন্দিরের দক্ষিণের বেড়ার সঙ্গে ছিল মূল প্রবেশদ্বার। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমেও ছিল আরও তিনটি দ্বার। দক্ষিণে প্রবেশদ্বারের মাথায় একটি বড় ঘণ্টা ঝোলানো হল। উপাসনার

প্রারম্ভে ওই ঘণ্টাটি বাজানো হত, যা এখনও হয়। দক্ষিণ দুয়ারের পরেই বাঁধানো ছোট জলাশয়, ছোট একটি উদ্যানও রচিত হয়। মন্দিরটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৯৮ (১৮৯১) সালের ৭ই পৌষের দিনে। মহর্ষিদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর পুত্ররা এবং ভক্তরা ৭ই পৌষের দিনে মন্দিরের উদ্বোধন উৎসবের সূচনা করেন। ১৩০১ (১৮৯৪) সালের ৭ই পৌষের চতুর্থ সাংবাৎসরিক উৎসব-দিনে মহর্ষির ট্রাস্ট ডিড অনুসারে এখানকার বাৎসরিক মেলার সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয়।

৭ই পৌষের দিন উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে হত ব্রহ্মোপাসনা— প্রাতঃকাল এবং সূর্যাস্তকালে একই দিনে দুবার। মেলা বসত ৭ই পৌষ দিনটিতে, এক দিনের জন্য। উৎসবের জন্য কলকাতা এবং বোলপুর, রায়পুর, সুরুল গ্রামের ভক্তরা দু'বেলাই প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন। মন্দিরের উত্তরে ছোট মাঠটিতে গ্রামের নানাপ্রকার বিক্রয়যোগ্য জিনিস নিয়ে দোকানিরা দোকান সাজিয়ে বসত। সেই সঙ্গে সন্ধ্যার উপাসনার পর মন্দিরের ঠিক পুবের ছোট প্রাঙ্গণে কলকাতার আতসবাজিওয়ালারা কয়েকপ্রকার বাজি পোড়াতো। তখনকার দিনের অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের কাছে এই বাজির দৃশ্যই ছিল সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। মেলার কেনাকাটা এবং বিশেষ করে সন্ধ্যার বাজি পোড়ানোর দৃশ্য দেখার জন্য কয়েকশত গ্রামবাসী গরুর গাড়িতে এসে নির্জন শান্তিনিকেতন আশ্রমে এক দিনের জন্যে আনন্দময় এক পরিবেশের সৃষ্টি করত।

আমি বাল্যবয়সে শান্তিনিকেতনে এসে এক দিনের এই ৭ই পৌষের উৎসব ও মেলাকে প্রায় একই রূপে দেখেছি। তবে শুনতাম যে প্রথম যুগের তুলনায় তখনকার দিনে উৎসব ও মেলায় যোগদানের জন্য দোকানপাটসহ জনসমাগম বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিছু পুরনো স্মৃতিচিহ্ন

শোনা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠার কালে উপাসনা মন্দিরটির পুব-দক্ষিণ কোণে একটি নাতিদীর্ঘ জলাশয় খোঁড়া হয়েছিল। খননের সময় তার মাটি ফেলা হয়েছিল তারই গায়ে লাগা পুব পাড়ে, বোলপুরের দিকে যাবার রাস্তার গা ঘেঁষে জলাশয়ের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত। এই মাটির দ্বারা সেখানে তিনটি মাটির ঢিবি গড়ে উঠেছিল। তারই মাঝেরটি ছিল অন্য দুটি অপেক্ষা বড় এবং বেশ খানিকটা উঁচু। এটিরই মাথায় বট গাছের একটি চারা রোপিত হয়। তার গোড়ায় পুবমুখী একটি বেদি রচিত হয়েছিল, প্রত্যূষে নির্জনে উপাসনার প্রয়োজনে। মহর্ষিদেব নিজে ওই বেদিটিতে প্রাতঃকালে উপাসনায় বসতেন কি না, তার সঠিক তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বার্ধক্যে শরীরের শক্তি হারানোর কারণে মহর্ষিদেব শান্তিনিকেতনে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই কারণে প্রশ্ন উঠছে— তবে কার উপাসনার প্রয়োজনে বটগাছের পাদদেশে ওই বেদিটি রচিত হয়েছিল। আমার ধারণা এটি রচিত হয়েছিল গুরুদেবের প্রাতঃকালীন উপাসনার প্রয়োজনে। আমরা জানি ১৯০৪ সালে 'দেহলি' বাড়িটিতে বাস করার পূর্বে গুরুদেব মন্দির-সংলগ্ন দোতলা বাড়িটিতেই বাস করতেন সপরিবারে। তাঁর বারো বছর বয়সে উপনয়নের পর তিনি পিতার কাছ থেকে গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা সঠিক জেনে, প্রাতে একাকী ধ্যানে বসার অভ্যাস তখন থেকেই শুরু করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের দোতলা বাড়িটিতে সপরিবারে বাস করবার সময় তিনি হয়তো ওই বটগাছের তলার স্থানটিকে সূর্যোদয়কালে নির্জনে পুবমুখী ধ্যানে বসবার স্থানের কথা ভেবে ওই বেদিটি রচনা করে সেখানেই ধ্যানে বসতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে আমার বাল্যবয়সে যখনই ওই ঢিবি ক'টির দিকে যেতাম তখন ওই বেদিটিকে ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখেছি। তবু সেটি যে উপাসনা বা ধ্যানে বসবার উপযোগী বেদি ছিল, তা বুঝতে পারা যেত। আমরা তিনটি ঢিবিকে বলতাম পাহাড়। ওই নামেই আমাদের কাছে ছিল ঢিবি ক'টির পরিচিতি।

এ যুগে ওই বেদিটির কোনও চিহ্নই আর নেই। মাটির স্তূপ-সংলগ্ন জলাশয়টিও এখন অবলুপ্ত।

গুরুদেবের শতবর্ষের জন্মোৎসবকালে, তদানীন্তন বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ বাইরে থেকে মাটি ও বালি আনিয়ে জলাশয়টিকে ভরাট করিয়ে দেন। কারণ হল, এটি তখন খুবই অস্বাস্থ্যকর জলাশয়ে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

এ যুগে বোলপুর যাবার পথের ধারের সেই বটবৃক্ষটি তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং প্রচুর ঝুরি নামিয়ে বিরাট আকারে এখনও বিরাজ করছে।

আর একটি বটবৃক্ষ, বোলপুর ও শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তার মোড়ে রোপণ করা হয়েছিল, একই সময়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের যুগে এ বৃক্ষটির যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছিল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের সময় ওই বৃক্ষটির তলে জলসত্রের ব্যবস্থা করা হত। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে তৃষ্ণার্ত পথযাত্রীরা এর ছায়ায় বিশ্রাম করে, বিরাট মাটির জালায় রক্ষিত ঠাণ্ডা জল পান করত। এই জলসত্রের ব্যবস্থা বহুদিন ছিল। পরে বন্ধ হয়ে যায়। বৃক্ষটিও সাম্প্রতিক এক প্রবল ঝড়ে সমূলে উৎপাটিত হবার পর, ডালপালাসহ বিক্রয় হয়ে গেছে।

আমার আশ্রমজীবন

আমার শান্তিনিকেতনবাসের স্মৃতিগ্রাহ্য জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৯১৩/১৪ সালে, যখন বাবা ইংলণ্ড থেকে ফিরে মা-সহ আমাকে ও আমার ভ্রাতা সাগরময়কে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন আমাদের বাজাপ্তি গ্রাম থেকে। আমরা তখন উঠেছিলাম গুরুদেবের 'দেহলি' বাড়ি সংলগ্ন পশ্চিমের 'নতুনবাড়ি' নামে খড়ের চালা-বাড়িটির একটি অংশে। এই বাড়িটির অপর অংশে ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী থাকতেন সপরিবারে। পিয়ার্সনও এই বাড়ির সামনের অংশে ১৯১৬ সালে জাপান যাবার পূর্বে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর পত্নী কমলাদেবী সহ থাকতেন গুরুদেবের 'দেহলি' বাড়ির নীচের তলায়।

'দেহলি' ছিল ইঁটের দোতলা বাড়ি। উপরতলায় থাকতেন গুরুদেব একলা, তাঁর এক ভৃত্যকে নিয়ে।

শান্তিনিকেতনে এবারে এসে, এখানকার গাছপালা বাড়িঘর এবং চারদিকের দিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠের মধ্যে বিদ্যালয়কে প্রথম চিনতে শিখলাম। দেখলাম শালবীথির পূর্বপ্রান্ত যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার দক্ষিণে 'বীথিকা' নামে একটি ছাত্রাবাস। এটি রচিত হয়েছিল, শালবীথির রাস্তার সমান্তরালে পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত। শালবীথির দিকে ছিল তার দুটি প্রবেশদ্বার। তারই মুখোমুখি দক্ষিণদিকে ছিল আরও দুটি। এ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে ছিল দুটি করে জানলা। মাটির দেওয়াল ও খড়ে ছাওয়া ওই ছাত্রাবাসে কোনও কাঠের খাট ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়াল থেকে ছিল এক হাঁটু উঁচু সিমেন্টের বাঁধানো মেঝে। একজন ছাত্র বিছানা পেতে শুতে পারে এমন জায়গা রেখে, প্রতিটি ছাত্রের শোবার জায়গার পাশে এক হাত উঁচু, এক হাত চওড়া, দু-তিন হাত লম্বা সিমেন্টের বেদি ছিল। এর উপরেই ছাত্ররা তাদের বাক্স, খাতা, বই প্রভৃতি রাখত। সকালবেলা বিছানা গুটিয়ে রাখত দেওয়ালের দিকে। দু' দিকে দুটি দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশের পথ ছিল, গৃহের মেঝের সমান্তরালে। দুদিকের মাঝে ছিল পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত একই রকমের চলাফেরার সমান্তরাল পথ। পরবর্তী যুগে মাটির এই ছাত্রাবাসটি বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এখনও তার মেঝের চিহ্নটি আমার চোখে পড়ে।

'বীথিকা' ঘর পার হয়ে শালবীথি ধরে পশ্চিমে খানিকটা এগিয়ে গেলেই একটি খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়ি ছিল। বাড়িটির চারদিক মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। উত্তরদিকে ছিল প্রবেশের দ্বার। বাড়িটিতে জগদানন্দবাবু থাকতেন তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে। তখন তিনি ছিলেন বিপত্নীক। এই বাড়িটির গায়ে-লাগা দক্ষিণে আরও একটি খড়ের চালা-বাড়ি ছিল। তাতেও থাকতেন এক

অধ্যাপক। তাঁর নাম এখন আর মনে নেই। এই দুটি বাড়িই ভেঙে ফেলা হয় অনেকদিন পরে। জগদানন্দবাবু এই বাড়ি ছেড়ে ১৯১৯ সাল নাগাদ চলে যান গুরুপল্লীর পুবদিকের প্রথম বাড়িটিতে। টিনে ছাওয়া সেই বাড়িটি এখনও আছে। এখান থেকে জগদানন্দবাবু পরে গুরুপল্লীর পশ্চিমপ্রান্তে, যেখানে হাতিপুকুর নামে একটি জলাশয় আছে, তার দক্ষিণে নিজে একটি একতলা পাকা বাড়ি করে, তাতে উঠে যান।

১৯১৮ সালে জগদানন্দবাবুর আদি বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি একতলা লম্বালম্বি পাকা বাড়ি রচিত হয় শিশুবিভাগের ছাত্রদের বাসস্থান হিসাবে। পরে এই বাড়িটির নাম দেওয়া হয় 'সন্তোষালয়'। এই বাড়িটি এখনও আছে। এর ভিতর ও বাইরের দেওয়ালের উপরদিকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে কলাভবনের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ছাত্রছাত্রীরা বহু আকারের দেওয়ালচিত্র (Fresco) এঁকেছিলেন বোধহয় ১৯২৯-৩০ সালে। বাড়িটির উত্তরদিকের বাইরের বারান্দায় যে-দুটি নরনারীর মূর্তি দেখি, সেটি অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছবি 'কচ ও দেবযানী' অবলম্বনে রচনা করেছিলেন শিল্পী রামকিঙ্কর। বাড়ির দেওয়ালে এইরূপ চিত্রকলার অলঙ্করণকে নন্দবাবু কলাভবনের শিক্ষার্থীদের পক্ষে আবশ্যিক বলে মনে করতেন বলেই আরও অনেক বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল বিশ্বভারতীর যুগে।

বর্তমানে বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনে এসে আমরা হিন্দিভবন, চিনাভবন ও পাঠভবনের বাড়িগুলির উত্তরে যে রাস্তাটি দেখি, এটি বিদ্যালয়ের যুগের প্রথমদিকে ছিল না। রাস্তাটি পরে তৈরি হয় নেপালচন্দ্র রায়ের উৎসাহে। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মীদের নিয়ে রাস্তাটি প্রথম তৈরি করান। চিনাভবন ও বর্তমান ক্যানটিনের মাঝে একটি নালা ছিল। এই নালা দিয়ে বর্ষার জল প্রবল বেগে বয়ে যেত ভুবনডাঙার বিরাট দিঘি বা জলাধারটিতে। নেপালবাবু গরুর গাড়ি জোগাড় করে, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মীদের দিয়ে ঝুড়ি কোদালের সাহায্যে দূর থেকে রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় মাটি আনিয়ে নালাটির মাপ অনুযায়ী সেখানে মাটি ফেলে সমগ্র রাস্তাটি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ করেন। নেপালবাবুর উৎসাহ ও উদ্যোগে রাস্তাটি নির্মিত হয়েছিল বলেই তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এর নামকরণ করা হয় 'নেপাল রোড'।

শালবীথির দক্ষিণে যে প্রাঙ্গণটিকে আমরা 'গৌরপ্রাঙ্গণ' বলে জানি, পরে এটির নামকরণ করা হয় গৌরগোপাল ঘোষের স্মরণে। তবে নামকরণের যুগে এঁরা ছিলেন জীবিত। গৌরদা শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার কয়েকবছর পরে ছাত্র হিসাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। এন্ট্রান্স পাশ করে নিজের পৈতৃক বাসস্থান চন্দননগরে ফিরে গিয়ে তিনি কলকাতার কোনও এক কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে বি-এসসি পাশ করার পব ১৯১৭ সালে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতার কলেজে পাঠকালে ফুটবল খেলায় পারদর্শী হয়ে প্রখ্যাত মোহনবাগান দলে খেলোয়াড় হিসাবে যুক্ত হন। তিনি আকারে ছিলেন বেঁটেখাটো এবং সুপুষ্ট। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হয়ে তিনি থাকতেন প্রথম যুগের ছাত্রাবাস 'প্রাককুটির'-এর একটি গৃহে। সে যুগে শান্তিনিকেতনে ফুটবল খেলার মাঠ ছিল বর্তমান উদয়ন বাড়ির পূর্ব সীমানা থেকে পুরাতন মেলার মাঠের পশ্চিম সীমানার খানিকটা জুড়ে। যখনই কলকাতার কোনও ক্লাব বা কলেজ আমন্ত্রিত হয়ে ফুটবল খেলতে আসতেন, তখন শান্তিনিকেতন দলের সঙ্গে গৌরদাকেও খেলতে হত। খেলা আরম্ভ হবার পূর্বে, গৌরদা গায়ে শান্তিনিকেতনের জার্সি, হাফ প্যান্ট পরে, দু'পায়ে মোজাসহ ফুটবল খেলার উপযোগী বুট জুতো পায়ে তাঁর বাসগৃহ থেকে যখন বের হতেন, তখন আমরা— বালকদল তাঁকে ঘিরে চলতাম উল্লাসের সঙ্গে। খেলার মাঠে নেমে যখন বুট পায়ে তিনি ফুটবলটিকে আকাশে অনেকখানি তুলে ফেলতেন, তখন আমাদের চিৎকারসহ উল্লাসের সীমা থাকত না। সে যুগে খেলার সুবাদে গৌরদা ছিলেন আমাদের 'হিরো'। গৌরদার আগে পায়ে বুট জুতো পরে খেলতে আমরা আর কাউকে দেখিনি। আমরা শুনতাম ইংরেজদেরই কেবল বুট জুতো পরে খেলার খবর।

শিল্পাচার্য নন্দলাল

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে যখন শান্তিনিকেতনে এসে বাস শুরু করলেন, তখন তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল গুরুপল্লীর পূর্বপ্রান্তে, জগদানন্দবাবুর বাড়ির পিছনের বাড়িটিতে। বাড়িটি ছিল খড়ের চাল, মাটির দোতলা। বহু বৎসর তিনি এ বাড়িতে কাটিয়ে একটি একতলা পাকা বাড়ি রচনা করলেন সপরিবারে বাসের জন্য— শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তার দক্ষিণে। তখন থেকে তাঁর দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এখানেই তিনি ছিলেন।

তখনকার দিনের নাট্যঘরের উত্তরে একটি লম্বা খড়ের চালাঘর ছিল। এটিতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সব কিছুই মজুত থাকত। অর্থাৎ যাকে ভাঁড়ার ঘর বলা যায়। বোলপুর থেকে কিনে আনা হত সব কিছুই। এই ভাঁড়ার ঘরটির দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল একজন কর্মীর উপর। তখনকার অল্পবয়সী ছাত্ররা যখনই সময় পেত, তাঁর কাছে গিয়ে চিঁড়ে বা মুড়ি চিনি-সহ খাবার জন্য আবদার করত। তিনি প্রত্যেককেই একমুঠো করে দিতেন। আমিও এই ছাত্রদলে যুক্ত হয়ে পড়তাম, একমুঠো চিঁড়ে-মুড়ি চিনি-সহ খাবার লোভে। মাঝে মাঝে চিনির বদলে তিনি গুড়ও দিতেন।

প্রথম যুগের ছাত্রাবাস 'প্রাক্‌কুটির'-এর উত্তরে একটি গাব গাছ সংলগ্ন কুয়ো ছিল। তার সঙ্গে লাগোয়া ছিল তিনদিকে তিনটি বড় চৌবাচ্চা। এই কুয়ো থেকে কপিকলে লাগানো দড়ি-বাঁধা টিনের চৌকো আধারে জল তুলে চৌবাচ্চা ভরে দিত একজন সাঁওতাল কর্মী। তবে বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্ররাও এ কাজে খুবই দক্ষতা অর্জন করেছিল। তারাও সানন্দে জল তোলার কাজ প্রায়ই করত। এই কুয়োটিকেই বলা হত গাবতলার কুয়ো। বাঁধানো এই কুয়োটিতে বারোমাস জল থাকত। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহর সময়েও জলাভাব দেখা দিত না।

সে যুগের আরও কিছু কাঁচা বাড়িঘর

এখানকার এই ক'টি বাড়িঘর ও কুয়োর ঠিক উত্তরে একটি রাস্তা আম্রকুঞ্জ থেকে ছিল সোজা পশ্চিমের সীমানা পর্যন্ত। রাস্তাটির গায়ে লাগা পূর্ব-উত্তর প্রান্তে আর একটি মাটির ও খড়ের চালা, অন্যান্য ছাত্রাবাসের মতো লম্বা, ঘর ছিল। সেখানে সপরিবারে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে থাকতে দেখেছি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বেণুকুঞ্জে উঠে আসেন। বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে রচিত এখানকার এই ক'টি বাড়ি এখন আর নেই। হয় তার কয়েকটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়েছে অথবা কয়েকটিকে ভেঙে করা হয়েছে ইঁট সিমেন্টের একতলা পাকা বাড়ি।

মহর্ষিদেব যখন এই প্রান্তরে কুড়ি বিঘা জমি কেনেন তখন দুটি পাকা বাড়িই কেবল তৈরি করেছিলেন। দোতলা বড় বাড়িটি মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ছিল। যেটি এখনও আমরা দেখি। এর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, এখন যেখানে পাঠভবনের অফিস, সেই বাড়িটি তখন নির্মিত হয়। মন্দিরের দক্ষিণে বড় বাড়িটার উত্তর সীমানার গেট থেকে বাড়িটির সামনে পর্যন্ত যে রাস্তাটি এসেছে, তার দু দিকে সারিবদ্ধভাবে আমলকির গাছ লাগিয়েছিলেন। বাড়িটির দক্ষিণের গাড়িবারান্দার পর আর একটি রাস্তা সোজা দক্ষিণে এসে শালবীথিকায় মাধবীকুঞ্জে শেষ হয়েছিল। এই রাস্তার দু'পাশে লাগিয়েছিলেন শিউলিফুলের চারা। আমরা বাল্যজীবনে তার পরিচয় পেতাম। দক্ষিণের এই শিউলি গাছগুলি এখন আর নেই, কিন্তু উত্তরের আমলকির প্রাচীন গাছগুলি এখনও আছে।

এন্ডরুজ ও পিয়ার্সনের বাড়ি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পিয়ার্সন এবং এন্ডরুজ নিজেদের বাসোপযোগী একটি একতলা পাকা বাড়ি তৈরি করান গুরুদেবের 'দেহলি' বাড়ির দক্ষিণের রাস্তার পুবপ্রান্তে। বাড়িটির পুব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ছিল চওড়া বারান্দা। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই বাড়িটিতে বাস করবার সুযোগ পাননি। পিয়ার্সন ১৯১৬ সালে গুরুদেবের সঙ্গে জাপান ভ্রমণে যান। এন্ডরুজকে যেতে হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়।

এই বাড়িটি পরে রথীন্দ্রনাথ কিনে নিয়ে দোতলায় পরিণত করেন। নাম দেন 'দ্বারিক'। এই বাড়িটিতেই বিশ্বভারতীর প্রথম উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়— ১৯১৯ সালে।

কলাভবন-সংগীতবিভাগ

'দ্বারিক' নামাঙ্কিত বাড়িটিতে 'কলাভবন' নাম দিয়ে কলা ও সংগীত শিক্ষার কাজ শুরু হয়। তখন ইংরেজিতে এটিকে বলা হত 'Department of Arts and Music'। উপরতলায় ছিল কলাভবন এবং নীচের তলায় হত সংগীতভবনের কাজ।

বিশের দশকের প্রথম দিকে এই বাড়িটি কলাভবন খালি করে দিয়ে সন্তোষালয়ে উঠে যাবার পর এটি পাঠভবন এবং অন্য বিভাগের ছাত্রীদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হল। তিরিশের দশকে আদি সীমানার বাইরে পশ্চিম দিকে যখন 'শ্রীসদন' নামে মেয়েদের জন্য দোতলা ছাত্রীনিবাসটি তৈরি হল, তখন ছাত্রীরা সেখানে উঠে যাবার পর বিশ্বভারতীর কলেজের ছাত্রনিবাসরূপে পরিণত হয় এই 'দ্বারিক' বাড়িটি। পরবর্তী যুগে এই দোতলা বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়। সেখানে এবং তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণে বেশ কয়েকটি একতলা পাকা বাড়ি তৈরি হয়। কলেজের একদল ছাত্রীর জন্যে ছাত্রীনিবাস নির্মিত হয়— ১৯৫১ সালের পর।

'প্রাক্তনী' ও অন্যান্য বাড়ি

নেপাল রোডের গায়েলাগা দক্ষিণে, এখন যেখানে চিনাভবনের বিরাট বাড়িটি দেখি, সেখানে আমাদের ছোটবেলায় বিদ্যালয়ের যুগে খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি তৈরি করে দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র কৃতীন্দ্রনাথ পত্নীসহ বাস করতেন। বাড়িটির উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে ছিল চওড়া বারান্দা। এই বাড়িটির পশ্চিমে টিনের চালায় তিনদিকে বারান্দাযুক্ত একটি বাড়ি করেছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা। নাম দিয়েছিলেন 'প্রাক্তনী'। বাড়িটি প্রথম তৈরি হবার পর ভাড়া বাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হত। মনে পড়ে, বিশ দশকের প্রথমদিকে এ বাড়িতে এসে উঠেছিলেন রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীর বাবা ও মা। এখানেই বাসকালে নন্দিনীর মা গুরুতর অসুস্থ হন এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এই অবস্থায় সদ্যোজাত কন্যা নন্দিনীকে নিয়ে তার বাবা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েন। তাঁদের সেই বিপদ দেখে প্রতিমাদেবী নন্দিনীকে পালিতা কন্যা হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাব দিলে নন্দিনীর পিতা সানন্দেই সম্মতি দেন। নন্দিনীর মাতা কিছুদিন পরে একটু সুস্থ এবং মানসিক ভারসাম্য খানিকটা স্বাভাবিক হবার পর দেশে ফিরে যান। এই পরিবারটি গুজরাট থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

'প্রাক্তনী' বাড়িটি তিরিশ দশকের শেষদিকে সংগীতভবনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। ১৯৩৯ সালে সংগীতভবনের নিজস্ব বাড়ি নির্মিত হবার পর এই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়। চিনাভবনের

পত্তনের পূর্বে কৃতীন্দ্রনাথের বাড়িটি যেমন ভেঙে ফেলা হয়, পরে 'প্রাক্তনী' বাড়িটিও ভেঙে ফেলা হয়েছিল চিনাভবনের বিস্তারের প্রয়োজনে।

প্রথম যুগের সীমানার দক্ষিণ পশ্চিম কোণের একতলা পাকা বাড়িটির উপরে একটি খড়ের চালা ইঁটের দেওয়াল যুক্ত ছাত্রাবাস রচিত হয় ১৯০৮ সালের কাছাকাছি। এর উপরতলাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বল্লভী'। এটিতে বড় ছাত্ররা থাকত। এই বাড়িটি আমি আমার চার-পাঁচ বছর বয়সেও (১৯১৪/১৫ সালে) দেখেছি। একতলার পূর্বদিকে ছিল দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। একবার বৈশাখের ছুটিতে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ে 'বল্লভী'র উপরতলার সমগ্র চালা ভেঙে পড়ে যায় সামনের রাস্তার উপর। 'বল্লভী' আর রচিত হয়নি। কিছু পরে বিশ্বভারতীর যুগে (১৯২৩ সালে) পুরাতন বাড়িটির উপরে পাকা দোতলা তুলে নীচের পুরনো দিনের বাড়িটিকে আরও বাড়িয়ে নতুন আকারে করবার পরিকল্পনা করা হয়। বিদ্যালয়ের যুগ থেকে বিশ্বভারতীর যুগ পর্যন্ত অনেক দিন এই বাড়িটি এখানকার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এক সময় এর পাকা দোতলাটি কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালয়েও পরিণত হয়। তখন সংগীতভবন কলাভবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুকাল সামনের 'সত্যকুটির'-এ গানবাজনার ক্লাস করত। পুরনো একতলা পাকা বাড়িটির নীচের তলার মাঝামাঝি, দুই মোটা থামের মধ্যবর্তী যে বারান্দাটি এখন আমরা দেখি, সেখানে নাটকের অভিনয়, গানের, নাচের আসর, অন্যান্য সভাসমিতির অধিবেশন যখন হত, তখন তার সামনের রাস্তায় শতরঞ্চির উপর শান্তিনিকেতনের দর্শকরা বসতেন। সে যুগে, এ যুগের মতো দর্শকের ভিড় হত না বলে ওই বারান্দাটিতে খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সব অনুষ্ঠানই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হত। এখন আমরা 'গৌরপ্রাঙ্গণ'-এর পশ্চিম প্রান্তে খোলা যে মঞ্চটি দেখি, সেটি তৈরি হয় গুরুদেবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের সময়। এ যুগে এখানকার বড় বড় সবক'টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় বাইরে থেকে আগত দর্শক-সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই খোলা বাঁধানো মঞ্চটি তৈরি করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের নাট্যঘরের সঙ্গে তুলনায় এ যুগের নাট্যঘরের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এটি এখন উত্তরায়ণের বিচিত্রাভবনের পশ্চিমে অবস্থিত। এর মঞ্চ পূর্বের তুলনায় অনেক বড়। এই নাট্যঘরে একসঙ্গে কয়েকশত দর্শক মেঝের শতরঞ্চির উপর বসে অনুষ্ঠানগুলি দেখতে পারে। কিন্তু এই নাট্যঘর এ যুগের প্রচলিত sound proof নয় বলে শ্রোতারা শব্দদূষণের অভিযোগ তোলায় তার সংশোধন খানিকটা হয়েছে।

প্রথম যুগের সীমানার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের একতলা পাকা বাড়িটি এ যুগে একটি গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, তারই গায়ে লাগা উত্তরে যে খাবার ঘরটি ছিল সেটিকে এ যুগে ভেঙে ফেলে সেখানে একটি লম্বা পাকা ঘর তৈরি করে, তার মেঝে থেকে উপর পর্যন্ত লোহার সেল্‌ফ্ লাগিয়ে, ভাগে ভাগে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও অন্য নানা ভাষার, নানা প্রকৃতির গ্রন্থ সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন থেকেই এই বাড়িটি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানে ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শালবীথির মাঝামাঝি মাধবীকুঞ্জের পর থেকে পশ্চিমের বর্তমান 'পাঠভবন'-এর অফিসবাড়ির দক্ষিণ পর্যন্ত 'গৌরপ্রাঙ্গণ' নামে যে ফাঁকা প্রাঙ্গণটি এবং তার পরেই 'সিংহসদন' ও তার দু'দিকে যে বাড়ি ক'টি দেখা যায়, সেখানে প্রথম যুগে রচিত— 'শমীন্দ্রকুটির', 'মোহিতকুটির', 'সত্যকুটির'— এই তিনটিই ছিল আকারে একই প্রকার। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে শমীন্দ্রকুটিরে একসঙ্গে ছাত্ররা যাতে দ্বিগুণ সংখ্যায় থাকতে পারে, তার কথা চিন্তা করে, ঘরের মধ্যে চৌকো মোটা থাম গেঁথে, তার নীচে এবং উপরে কাঁঠের ফ্রেমে, প্রচলিত খাটিয়ার মতো দড়ি বেঁধে শোবার জায়গা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা কিন্তু খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরে খাটের ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায় করা হয়।

এই ছাত্রাবাসটির নামকরণের একটি ইতিহাস আছে। গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে বাল্য বয়সে দেহত্যাগ করেন। সে যুগের আশ্রমবাসীরা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার

আগ্রহে পূর্বদিকের ছাত্রাবাসটির নাম দেন 'শমীন্দ্রকুটির'।

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন গুরুদেবের মধ্যম জামাতা। মধ্যম কন্যা রেণুকার স্বামী। গুরুদেব ১৯০৩ সালে জামাতার উপর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় পশ্চিমের তৃতীয় ছাত্রাবাসটির সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়।

তিনটি ছাত্রাবাসের মাঝেরটির নাম 'মোহিতকুটির' রাখা হয়েছিল, বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত শিক্ষক মোহিতচন্দ্র সেনকে স্মরণ করে। তিনি ছাড়া ওই সময়কার অন্য আর কোনও শিক্ষকের নামের সঙ্গে অন্য কোনও ছাত্রাবাসকে যুক্ত করা হয়েছিল বলে জানা যায় না। বহিরাগত শিক্ষক মোহিতচন্দ্রের নামে সে যুগে আশ্রমবাসী এই ছাত্রাবাসটির নামকরণের দ্বারা তাঁকে যে সম্মান দেখিয়েছিলেন তার বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে যা জানিয়ে গেছেন তা হল— 'মোহিতচন্দ্র সেন নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ। সিটি কলেজের [কলকাতার] অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গতির দিনে অযাচিতভাবে তিনি পরীক্ষকের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত এক সহস্র টাকা কবির হাতে দিয়েছিলেন। ...মোহিতচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রী, সাহিত্যবোধও ছিল তাঁর অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করে তিনি নূতনভাবে বিষয় বা ভাবের অনুষঙ্গ বিচার করে কবিতাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। .... কাব্যগ্রন্থের যে ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন রবীন্দ্রদর্শন সম্বন্ধে বোধহয় সেটি সর্বপ্রথম আলোচনা। ....

'মোহিতচন্দ্রের আগ্রহে ও উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' কাব্যের ৩০টি নূতন কবিতা লিখেছেন। ...

'সতীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর (১৯০৪) মোহিতচন্দ্রকে কবি আনলেন তাঁর বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ করে। ...

'মোহিতচন্দ্রের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ...শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাবার কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কবি 'বন্ধুস্মৃতি' নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন তা অধ্যাপকের প্রতি তাঁর শেষ অর্ঘ্য।'

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে, স্প্রিং লাগানো লোহার একপ্রকার খাট অনেকগুলি আনা হয়েছিল ছাত্রাবাসে ছাত্রদের শোবার জন্যে। কিন্তু ছাত্ররা ওই খাটগুলির উপর যখন তখন দাঁড়িয়ে লাফালাফি শুরু করে। এর উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় লম্ফঝম্ফ করাটা তাদের কাছে খুবই আনন্দজনক খেলার বস্তু হয়ে ওঠে। এই কারণে ক্রমশ খাটের স্প্রিংগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ায় সেগুলি পরিত্যক্ত হয়।

পুনরায় বলি ওই তিনটি ছাত্রাবাস পরস্পর গায়ে লাগা ছিল না। শমীন্দ্রকুটিরের পর মোহিতকুটিরের মাঝে খানিকটা যেমন ফাঁক ছিল, তেমনই ছিল মোহিতকুটির থেকে সত্যকুটিরের মাঝেও। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই দুটি ফাঁকে ইঁটের দুটি ছোট দোতলা গৃহ রচিত হয় (১৩২৯/১৯২২ সালে)। সেই দুটি গৃহকে বলা হত 'পূর্ব তোরণ' ও 'পশ্চিম তোরণ'। এখানে ছাত্ররা বাস করত। এ দুটি তোরণ এখনও আছে। কিন্তু ছাত্রাবাসরূপে নয়।

সিংহসদন

বিশ দশকের মাঝামাঝি 'রায়পুর' সিংহ পরিবারের প্রখ্যাত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বিশ্বভারতী দেখতে আসেন। তিনি খুশি হয়ে একটি নতুন ছাত্রাবাস রচনার জন্য বিশ্বভারতীকে দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। ওই টাকাতে তখন 'সিংহসদন' রচিত হয়। দোতলা ইঁটের পাকা বাড়ি করবার পরিকল্পনা ছিল। একতলা রচিত হবার পর অর্থাভাবে দোতলা আর কোনওদিন ওঠেনি। বাড়িটির উত্তর-পূর্ব কোণের ভিতর দিক ছিল ছাদে উঠবার সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে একতলার ছাদে আমরা প্রায়ই ওঠা-নামা করতাম। মনে পড়ে একবার ওই ছাদে 'বসন্ত' উৎসবের আগে, বিশ্বভারতীর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা অনেকে মিলে, দুই হাতে কাঠি নিয়ে কাঠিয়াওয়ারি ডাণ্ডিয়া রাসনৃত্যের অভ্যাস

করেছিলাম। ওই নাচটি সেবার বসন্তোৎসবের দিন আমরা দেখিয়েওছিলাম। কাঠিয়াওয়ারের দুটি ছাত্রী ডাণ্ডিয়া রাস জানত। তাদের সাহায্যেই নাচটি ধৈর্যের সঙ্গে প্রায় ১৫ দিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হয়ে, খেলার ঘণ্টার সময় অভ্যাস করতাম।

যেখানে মোহিতকুটির ছিল, সেটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে, সেখানেই ১৯২৪ সালে সিংহসদনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। এটিকে নিয়মিত ছাত্রাবাসে পরিণত করা হয়নি। বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সিংহসদনের প্রথম তলার খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। ভিতরে যে-ক'টি লোহার থাম ছিল ছাদটিকে ধরে রাখবার জন্যে, সেগুলিকে নকশাযুক্ত কাঠের দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এই হলঘরের উত্তরে কাঠের পাটাতনের দ্বারা মেঝের থেকে প্রায় দু'হাত উঁচু একটি মঞ্চ রচিত হয়। সেই মঞ্চেই সভাসমিতি, গানবাজনা, নৃত্য ও নাটকের নানাপ্রকার অনুষ্ঠান আমরা করেছি গুরুদেবসহ একটানা বহু বছর। ১৯৪০ সালে যখন গুরুদেবকে অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি থেকে ডি. লিট. প্রদান করা হয়, তখন তার অনুষ্ঠানও হয়েছিল এই মঞ্চে। গুরুদেবের প্রয়াণের কিছু পূর্বে এই মঞ্চে মহাত্মা গান্ধীকে 'চণ্ডালিকা' আর আগরতলার মহারাজকে দেখানো হয় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। এরই কিছুকাল পরে মঞ্চটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়।

ছাত্রাবাসে নাটকাভিনয়

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের কুড়ি বিঘার সীমানার মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর, যে কয়টি ছাত্রাবাস তৈরি হয়েছিল, তার প্রথমটি হল 'প্রাক্‌কুটির'। একই রকমের লম্বা ঘর। এর উত্তর ও দক্ষিণে ছিল টালিতে ছাওয়া বারান্দা। এই ছাত্রাবাসটি প্রথম যুগের একতলা পাকাবাড়ির পুব দিকে রচিত হয়— লম্বালম্বিভাবে শালবীথির উত্তরে। এরই গায়ে লাগা আর একটি ছাত্রবাস রচিত হয়েছিল, তার নাম ছিল 'নাট্যঘর'। এই গৃহটির পশ্চিমপ্রান্তের এবং পূর্বপ্রান্তের ভিত বা বনিয়াদ ছিল হাতখানেক উঁচু। পশ্চিমদিকের উঁচু ভিতের উপরেই সে যুগের যাবতীয় নাটকের অভিনয় হত, স্টেজ তৈরি করে। Drop Scene বা যবনিকাও ছিল। এই স্টেজে আমার ছোটবেলায় সে যুগের কতকগুলি নাটকের অভিনয়ের কথা আজও মনে পড়ে। দলবলসহ গুরুদেবকে এখানে তাঁর নাটকের অভিনয়ে যেমন দেখেছি, তেমনই গুরুদেবের ওই সময়ের দু'একটি নাটকের বালকদের সঙ্গে বাল্যবয়সেই যুক্ত হবার সুযোগ আমিও পেয়েছিলাম। সংস্কৃত নাটকের অভিনয় এবং বড় ছাত্রদের সাহিত্যসভাও এখানে প্রায়ই হত।

অন্য সময়ে এই মঞ্চে ছাত্ররাই বাস করত। অভিনয় বা অন্য অনুষ্ঠানের দিন নাট্যঘরের সব ছাত্রদের শোবার খাট, বাক্স, বিছানা বাইরে বের করে পুরো ঘরটি খালি করে দিতে হত। মঞ্চের নীচে মেঝেতে শতরঞ্চির উপর দর্শকরা বসতেন। নাট্যঘরের উত্তর ও দক্ষিণে কোনও বারান্দা ছিল না। পরবর্তী যুগে 'প্রাক্‌কুটির' এবং 'নাট্যঘর' ভেঙে ফেলে, একই স্থানে এখনকার একতলা পাকাবাড়ি দুটি রচিত হয়।

বাগানবাড়ি

আরও একটি ছাত্রাবাস রচিত হয়েছিল, বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে— উপাসনা মন্দিরের দক্ষিণে যে জলাশয়টি ছিল তারই দক্ষিণপ্রান্তে। ছাত্রাবাসটির উত্তর ও দক্ষিণে ছিল লম্বা বারান্দা। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বাগানবাড়ি'। সে যুগে এখনকার প্রায় সবক'টি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কায়িক পরিশ্রমে ফুলের ও ফলের বাগান তৈরি করতে হত। এই 'বাগানবাড়ি'র দক্ষিণেও সেইরূপ ছাত্রদের

দ্বারা রচিত একটি ফুলের বাগান ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এই ছাত্রাবাসটিকেই কেন 'বাগানবাড়ি' বলা হত তার কারণ আমার জানা নেই।

বেণুকুঞ্জ

'বেণুকুঞ্জ' নামে আর একটি বাড়ি রচিত হয় বিদ্যালয়ের যুগে। এটিও খড়ের চালা, মাটির বাড়ি। এর আশপাশে বোধ হয় কিছু বাঁশ ঝাড় ছিল বলেই ওই নামটি প্রযুক্ত হয়। বাড়িটি ছিল 'সত্যকুটির'-এর পশ্চিমপ্রান্তে। এই বাড়িটিতে এক সময় দিনেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ পর পর কিছুকাল সপরিবারে বাস করেছিলেন। ভীমরাও শাস্ত্রীও এ বাড়িতে বাস করেছেন। পরে বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁর পত্নীর মৃত্যুর পর এ বাড়িটিতে একটানা বহু বছর ছিলেন। এখনও সে বাড়িটি আছে, কিন্তু বেশ খানিকটা পরিবর্তিত আকারে।

দিনান্তিকা

বেণুকুঞ্জের পাশেই আছে, ১৯৩৫ সালে দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী কমলাদেবীর আর্থিক সাহায্যে গোলাকৃতি একটি ছোট দোতলা বাড়ি— 'দিনান্তিকা' নামে। এটি ছিল অধ্যাপক ও কর্মীদের অপরাহ্নে খেলার ঘণ্টার সময় চা-পানের ক্লাব। এই বাড়িটির দোতলার ভিতরদিকে নন্দলাল বসু কলাভবনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের দিয়ে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করিয়েছিলেন। এই চা-ক্লাবটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় গুরুদেবের চিন ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পর। শ্রাবণ ১৩৩১ (১৯২৪) সালে এটির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের অপরাহ্নে ওই চা-ক্লাবটির জন্যে গুরুদেব যে গান রচনা করেছিলেন এবং সেদিন গাওয়া হয়েছিল, সেই গানটি হল—

'হায় হায় হায় দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল চল চল হে।'
ইত্যাদি

খাবার ঘর-রান্নাঘর

শান্তিনিকেতনের পুরনো চৌহদ্দির পশ্চিম কোণে প্রথম যে একতলা পাকাবাড়িটি রচিত হয়, তার গায়েলাগা উত্তরেই ছিল প্রথম যুগের ছাত্রদের খাবার ঘর ও রান্নাঘর। শান্তিনিকেতনের তখনকার অফিসঘরও ছিল এরই কাছে, পশ্চিম সীমানা ঘেঁষে।

প্রথম যুগের শান্তিনিকেতনের পশ্চিম সীমানার রাস্তার পর থেকে ধানক্ষেত পর্যন্ত গাছপালাবিহীন প্রান্তর অধিগ্রহণ করা হলে রাস্তার গায়ে-লাগা পশ্চিমে তৈরি করা হয় নতুন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রান্নার ও খাবার ঘর। প্রথম যুগের রান্না ও খাবার ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়।

নতুন খাদ্যশালাটি রচিত হল এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে। মাটির বদলে ছিল ইঁটের দেওয়াল এবং সিমেন্টে বাঁধানো মেঝে। উপরে ছিল খড়ের চালা। একবার গরমের দিনে রান্না ও খাবার ঘরের এই চালাটি কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙে পড়ে যায়। বাড়িটি মেরামতের সময়, পুরনো খাবার ঘরটির গা ঘেঁষে উত্তরে একটি বড় ঘর তৈরি হয়। তাতে বসে খাবার ব্যবস্থা করা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন

প্রথায়। ভিন্ন প্রথা শব্দটিকে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

পূর্বে খাবার ঘরে কাঠের পিঁড়ি পেতে, তাতে বসে সকলকে খেতে হত। খাবার থালা বাটি গ্লাস ঘরে থাকত না। প্রত্যেক ছাত্রের ছিল নিজস্ব থালা-বাটি-গ্লাস। এগুলি তারা নিজেদের কাছেই রাখত। খাবার সময় সঙ্গে করে সেগুলি এনে পিঁড়িতে বসে খেতে হত। খাওয়া হয়ে গেলে থালা-বাটি-গ্লাস নিজেরাই নিয়ে গিয়ে কুয়োর জলে পরিষ্কার করে, নিজেদের বাসস্থানে রেখে দিত। রান্না করত কয়েকজন বাঙালি ব্রাহ্মণ। পিঁড়ি পেতে বসবার সময় ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পঙ্‌ক্তি পড়ত ভিন্ন সারিতে। অব্রাহ্মণদের সারি হত ভিন্ন। পুরনো খাবার ঘরের চালা ভেঙে পড়ার পর নতুন বাড়িটি যখন তৈরি হল, তখন পিঁড়ি পেতে বসে খাবার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিবর্তে কাঠের বেঞ্চে বসে খাবার প্রথার প্রচলন করা হয়। বসবার বেঞ্চটির সামনে একটি উঁচু বেঞ্চ থাকত। এতেই থালা গ্লাস প্রভৃতি নিয়ে ছাত্ররা খেত। প্রত্যেক বেঞ্চে একসঙ্গে চারজন করে বসত। এ যুগে থালা ও গ্লাস ছাত্রদের আর নিজেদের কাছে রাখতে হত না। রান্নাঘর থেকেই তা দেওয়া হত। খাওয়া হয়ে গেলে, রান্নাঘরের যাবতীয় ধোয়ামোছার কাজের সঙ্গে, সেগুলিও জলে পরিষ্কার করে রাখার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল ভুবনডাঙার কিছু মহিলা কর্মী। এই ব্যবস্থাটির প্রবর্তন করা হয় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর। তখন থেকেই ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র পঙক্তির ভেদ আপনা থেকেই উঠে গিয়েছিল।

কিছুকাল পরে এই খাদ্যালয়ের পশ্চিমে ছাত্রীদের বাসোপযোগী 'শ্রীসদন' রচিত হল। সেখানে বিদ্যালয়ের এবং বিশ্বভারতীর কলেজের ছাত্রীদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু চারবেলা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ছাত্রছাত্রীদের এক সঙ্গে।

সে যুগের হাসপাতাল ভবনটি ছিল উপাসনা মন্দির-সংলগ্ন জলাশয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, বোলপুর-গোয়ালপাড়া রাস্তার গা ঘেঁষে। যখন ১৯২৩ সালে পিয়ার্সনের মৃত্যুর পর 'পিয়ার্সন স্মৃতি হাসপাতাল' ভবনটি নির্মিত হয় তখন সেই নতুন ভবনটি প্রথমে কিছুকালের জন্য কলাভবনের ছাত্রাবাসে পরিণত করা হয়। পরে জরাজীর্ণ হবার পর সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়।

উত্তরায়ণ

প্রথম মহাযুদ্ধের কালেই শান্তিনিকেতনের সীমানা ক্রমশ বাড়তে থাকে। যেখানে এখন 'উত্তরায়ণ', তখন তা ছিল গাছপালাহীন বহুদূর বিস্তৃত রুক্ষ খোলা মাঠ। ১৯১৯ সালে রথীন্দ্রনাথ সেই মাঠটি কিনে নিয়ে তার মাঝামাঝি অংশে দুটি খড়ের চালা মাটির বাড়ি প্রথমে রচনা করেন গুরুদেবের বাসের জন্য। বাড়ি দুটি এখন আর নেই। পরে সেই অঞ্চলে, গুরুদেবের তিরোধানের কয়েক বছর পূর্বে, পর পর গড়ে ওঠে, 'উদয়ন', 'কোণার্ক', 'শ্যামলী', 'পুনশ্চ' ও 'উদীচী' নামে বাড়িগুলি। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় উত্তরায়ণের পূর্বপ্রান্তে 'রতনকুঠি'। প্রায় একই সময়ে এখনকার 'পিয়ার্সন স্মৃতি' হাসপাতালটি প্রথম তৈরি হয় ছোট আকারে। পরবর্তী যুগে তার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। এখানকার রাস্তাগুলির দুপাশে তৈরি হয় শিক্ষক, কর্মী ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের সপরিবারে বাসোপযোগী কতকগুলি একতলা পাকাবাড়ি। সেগুলি এখনও আছে।

'সিংহসদন' রচিত হবার আগের যে তিনটি ছাত্রাবাসের উল্লেখ করেছি তখন তার দক্ষিণে ছিল একটি প্রশস্ত খোলা মাঠ, এখন পাড়াটিকে আমরা 'গুরুপল্লী' বলি, সেই পর্যন্ত। গুরুপল্লীর বাড়িগুলি রচিত হবার পূর্বে সেখানে পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছিল বাঁশ গাছের ঝাড়। সেগুলিকে উৎপাটিত

করে এই পল্লীটির প্রতিষ্ঠা হয়।

'সত্যকুটির', 'তোরণ', 'সিংহসদন' ও 'শমীন্দ্রকুটির'-এর দক্ষিণের মাঠের শেষ প্রান্তে, যেখানে গুরুপল্লী রচিত হয় সেখানে আমার বাবারও ছিল একটি বাড়ি। গুরুপল্লীর পূর্ব প্রান্তে টিনের চালা-বিশিষ্ট যে-বাড়ি জগদানন্দবাবু করেছিলেন, সে যুগের সেই বাড়িটিই এখনও কোনওরকমে টিকে আছে। বাকি বাড়িগুলি ভেঙে ফেলে, পাকা একতলা বাড়িতে পরিণত করা হয়েছে। পরে এরই পিছনে আর এক সারি অ্যাজবেস্টস-এর চালা-বিশিষ্ট পাকাবাড়ি বিশ্বভারতী তৈরি করেছেন কর্মী ও শিক্ষকদের সপরিবারে বাসের প্রয়োজনে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, শান্তিনিকেতনে প্রথম থেকেই যতগুলি খড়ের চালা মাটির বাড়ি রচিত হয়েছিল, তার মেঝে কিন্তু ছিল সবই সিমেন্টে বাঁধানো।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোলপুর থেকে যে রাস্তাটি শান্তিনিকেতনের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে উত্তরে চলে গেছে, শান্তিনিকেতনের সীমানার প্রবেশের মুখে জলাশয়ের উত্তরে এবং রাস্তার পশ্চিমে, সেখানে 'নিচু বাংলা' নামে যে বাড়িটি আজও আমরা দেখি, সেটি নাকি তৈরি করেছিলেন ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, তাঁর বসবাসের জন্য। বাড়িটির পুবের অংশে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাস করতেন। তাঁরই পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী হেমলতাদেবী থাকতেন বৃদ্ধ শ্বশুরের দেখাশোনার জন্য পিছনের অংশে। সমগ্র বাড়িটি তৈরি হয়েছিল ইঁটের দেওয়ালসহ টালির চালাতে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্বদাই বসে থাকতেন তাঁর বাসগৃহের পুবমুখী বারান্দার একটি কৌচে। তিনি ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর বসবার কৌচের পাশেই থাকত একটি দীর্ঘ নলযুক্ত গড়গড়া বা আলবোলা। নলটি একহাতে ধরে ধূমপান করে যেতেন। তাঁর একটি বিশ্বস্ত অবাঙালি ভৃত্য ছিল, নাম মুনীশ্বর। সে অন্যান্য কাজের সঙ্গে ধূমপানের কল্‌কেটিকে ঠিকমতো সাজিয়ে, আলবোলাটির নল তাঁর হাতে ধরিয়ে দিত। এই বাড়িতে বসেই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বক্তৃতার দ্রুত অনুলিখনের (বাংলা শর্টহ্যান্ড) একটি সহজ পদ্ধতির উদ্‌ভাবন করেছিলেন। আমাদের এক আত্মীয় সেই পদ্ধতিটি তাঁর কাছে শিখে নিয়ে পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতার দ্রুত অনুলিখনের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাগজের নানা আকারের ছোট-বড় বাক্স রচনার জন্য বিশেষ একটি পদ্ধতিরও উদ্‌ভাবন করেছিলেন। এ ছাড়া এখানে বাস করার যুগে তিনি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যালয়ের যুগে, দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকগণ একটি সাহিত্যসভার প্রচলন করেছিলেন। গুরুদেব ছিলেন তার সভাপতি আর অজিতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন সম্পাদক। এই সভাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়মিত যোগ দিতেন। বেশ ক'টি জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধও তিনি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। নিচু বাংলার এই বাড়িতেই তিনি দেহত্যাগ করেন ১৯২৬ সালে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশির কাছাকাছি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বেও তাঁকে হাঁটতে দেখেছি। শেষ দিকে তিনি যখন আর হাঁটতে পারতেন না, তখন তিনি দু'চাকার একটি ঠেলাগাড়িতে করে মাঝে-মাঝে বিদ্যালয়ে আসতেন। গাড়িটি তাঁর পরিচারক মুনীশ্বরই ঠেলে ঠেলে চালাত।

আমার অল্প বয়সে এখানে উল্লেখযোগ্য যে দৃশ্যটি আমি দেখেছি, তা হল গুরুদেব যখনই কলকাতা থেকে দিনের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে ফিরতেন, তখন বৃহৎ দুটি গরুতে টানা একটি চারচাকাওয়ালা চৌকো গাড়িতে বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতনে আসতেন। গাড়িটি কলকাতা থেকে কেনা হয়েছিল শান্তিনিকেতনের জন্য। দেখতাম, সেই গাড়িতে বোলপুর স্টেশন থেকে ফেরার পথে নিচু বাংলার রাস্তার মোড়ে গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে গুরুদেব নেমে পড়তেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের বারান্দায় উঠে, তাঁর পায়ে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম

করতেন। এই দৃশ্য কয়েকবারই আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন আমি পাঁচ-ছয় বছরের বালকমাত্র। তা দেখে এতখানি অভিভূত হয়েছিলাম যে, এখনও চোখ বুজে সেই দৃশ্যের কথা যখন ভাবি, তখন আমার মনে সেই দিনের ছবি পরিষ্কার ভেসে ওঠে।

দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ নিচু বাংলায় থাকতেন না। তাঁকে শান্তিনিকেতনের সকলেই বলতেন দীপুবাবু। তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতনের দোতলা বড়বাড়ির একতলার পূর্বাংশে। একদল ভৃত্য ছিল তাঁর দৈনন্দিন পরিচর্যার জন্য। তখন তিনি ছিলেন চলৎশক্তিরহিত। ভৃত্যের সাহায্যেই তাঁকে চলাফেরা ওঠাবসা করতে হত।

তিনি যে ঘরে থাকতেন, সেখানে একটি গদিওয়ালা কাঠের পালঙ্ক ছিল। বালিশ, মোটা তাকিয়া ও পাশবালিশ থাকত। তাতেই তিনি প্রায় সারাদিনই বসে থাকতেন। সে যুগে বিজলিবাতির প্রচলন ছিল না। পালঙ্কের ঠিক উপরে ঝোলানো ছিল মোটা কাপড়ের একটি ঝালর। গরমের সময়ে একটি ভৃত্য গৃহের প্রবেশ মুখে বসে দড়িতে বাঁধা ঝালরটি নিয়মিত টানত। তার হাওয়ায় ঘরটি ভরে যেত।

দ্বিপেন্দ্রনাথও ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর তামাক সেজে দেবার একটি ভৃত্যও ছিল। সে নিয়মিত সুগন্ধি তামাকে কলকে সাজিয়ে সুদৃশ্য আলবোলার মুখে তা বসিয়ে লম্বা নলটি দ্বিপেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিত।

দ্বিপেন্দ্রনাথের উপর শান্তিনিকেতন পরিচালনার কয়েক প্রকার গুরুদায়িত্ব ছিল। এই বাড়িতে বসেই সে কাজ তিনি খুবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেন। বিশ্বভারতীর প্রথমযুগে তিনি অর্থসচিবের দায়িত্বেও ছিলেন। আশ্রমবাসীরা নানা কাজে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতেন।

দ্বিপেন্দ্রনাথের ছিল দু'টি ঘোড়ায় টানা একটি ফিটন গাড়ি। প্রতিদিন বিকেলে সুসজ্জিত ঘোড়া, কোচম্যান ও ভৃত্যকে নিয়ে বোলপুর শহরে যেতেন। সেখানে ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ও ধনী ব্যবসায়ীদের একটি ক্লাব ছিল। দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন এই ক্লাবের প্রধান ব্যক্তি। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি ফিরে আসতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তিনি একটি ফোর্ড গাড়ি কেনেন,— তাঁর নিজের ঘোড়াসহ গাড়িটি বিক্রি করে দিয়ে। তাঁর ফোর্ড গাড়ির চালক ছিলেন অল্প বয়সী একটি বাঙালি যুবক। আমরা তাঁকে সবাই মল্লিকদা বলে ডাকতাম।

শান্তিনিকেতনবাসী সকলের সঙ্গেই তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ফুটবল খেলায় দক্ষতাও ছিল তাঁর। তখনকার দিনের প্রায় সব ম্যাচেই তিনি খেলার সুযোগ পেতেন। দ্বিপেন্দ্রনাথের ফোর্ড গাড়িটি আমাদের মতো বিদ্যালয়ের অল্প বয়সী বালকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। ১৯২২ সালে আইনানুযায়ী বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর শান্তিনিকেতনের বড় বাড়িটিকে যখন অতিথিশালায় পরিণত করা হয় তখন দ্বিপেন্দ্রনাথ নিচু বাংলার পশ্চিমদিকের অংশে বসবাসের জন্য উঠে আসেন তাঁর ভৃত্যাদিসহ। কিন্তু এখানে আসবার পর তিনি শরীর ও মনের দিক থেকে খুব সুস্থ ছিলেন না। ১৯২৩ সালে এখানেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর পত্নী হেমলতা দেবী, স্বামীর চিতাভস্ম শ্মশান থেকে আনিয়ে নিচু বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাস্তার পাশে একটি বাঁধানো স্মৃতিসৌধ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনা মতো রচনা করিয়ে, সেখানে রেখেছিলেন। সেই সৌধটি এখনও আছে, কিন্তু খুবই অযত্নে ছিল। সম্প্রতি তার সংস্কার করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতন প্রেস

পূর্বোক্ত খাদ্যভবনের সামান্য একটু ব্যবধানে উত্তরদিকে, টিনের ছাউনিযুক্ত ও ইঁটের দেওয়ালের একটি তিনকোণা বড় বাড়ি রচিত হয়। এর এক অংশে ছিল শান্তিনিকেতন প্রেস। সেখানে সে যুগের শান্তিনিকেতন পত্রিকা, দিনেন্দ্রনাথকৃত অনেকগুলি স্বরলিপিগ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

শান্তিনিকেতন প্রেসের বাড়ির আর একটি অংশে ছিল বিজলিবাতি জ্বালাবার জন্য বিরাট একটি ইঞ্জিনসহ ডায়নামো। ইঞ্জিনের বড় চাকার সঙ্গে লম্বা একটি বেল্ট-এর সাহায্যে ডায়নামোটি ঘুরত। এই ডায়নামো থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের আলো ছাত্রাবাসে জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত আলো জ্বলত। তার পর বন্ধ থাকত।

ছাত্রাবাসে কেরোসিনের বাতির আদি ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি ছাত্রাবাসে নানা আকারের কেরোসিনের বাতি জ্বলত। এই বাতি জ্বালাবার দায়িত্ব ছিল কয়েকজন কর্মীর উপর। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে প্রতিটি ছাত্রাবাসে এসে বাতিতে তেল ভরত, নানা আকারের কাঁচের চিমনিগুলিকে পরিষ্কার করে আলো জ্বালিয়ে দিত। অনুরূপ ব্যবস্থা চোখে পড়ত, সে যুগের শান্তিনিকেতনে মূল চৌহদ্দির মধ্যে কয়েকটি রাস্তার মোড়ে এবং রেল স্টেশনের বাইরে এই ভাবেই কেরোসিনের বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ঘোর অন্ধকারে তখনকার আশ্রম আচ্ছন্ন থাকত। শুক্লপক্ষে একটু-একটু করে চাঁদের আলোয় গাছপালায় বেষ্টিত আশ্রম এবং বাইরের দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠের প্রকৃতি চন্দ্রালোকে নতুন সাজে আমাদের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে আমাদের মতো বালকদের মনকেও অকারণ আবেগে মগ্ন করে রাখত।

উপরে বর্ণিত ওই তিন ভাগে বিভক্ত বাড়ির অপর একটি অংশ ছিল বিদ্যাশ্রমের গুদামঘর। এই বাড়িটির শেষ অংশে ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পদার্থবিদ্যার ক্লাস। এই ক্লাসের প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকার যন্ত্রাদি যথাযথভাবে টেবিলে সাজিয়ে রাখা থাকত, তার সাহায্যেই বক্তব্য বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলার সুবিধার কথা ভেবে।

বড় ব্যাসের গভীর কুয়ো

ত্রিকোণা টিনের বাড়ির উত্তরে এ যুগেই খোদিত হয়েছিল বড় ব্যাসের ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা একটি কুয়ো। তার তিন দিকে ছিল কয়েকটি বড় আকারের চৌবাচ্চা। উত্তর ভারতে প্রচলিত পদ্ধতিতে মোটা দড়িতে বাঁধা চামড়ার মোটের দ্বারা কুয়োর জল তুলে সেই চৌবাচ্চা ক'টি ভরে রাখা হত। মোটা দড়িতে বাঁধা জল ভর্তি চামড়ার মোটটি গরুতে টেনে তুলত। এই কুয়োর জল তোলার জন্য ছিল দুটি কর্মী। একজন থাকত মোটের দিকে, অন্যজন ছিল গরুর চালক। আমরাও কখনও কখনও শখ করে মোটের সাহায্যে কুয়ো থেকে জল তুলে, সেই জল ঢেলে দিতাম চৌবাচ্চায়। গরুর চালক হিসেবেও কাজ করতে শিখেছিলাম। আমরা ছাত্রদল নিজেদের জামা-কাপড় নিয়ে কুয়োর ধরে আসতাম। সঙ্গে প্রত্যেকেরই একটি মগ থাকত। গরমের সময় কুয়োর শীতল জলে স্নান করে যেমন আনন্দ পেতাম, শীতকালে চৌবাচ্চার জমা ঠাণ্ডা জলে স্নানের সময়েও কোনও কষ্ট বোধ করতাম না। আমরা স্নানের সময়ে সাবান মাখতাম, শীতকালে খাঁটি সর্ষের তেল ভাল করে

গায়ে মাখতাম। এখানকার এই স্নানের জল নালা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে পড়ত।

কুয়োর পশ্চিমের প্রশস্ত মাঠে, আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই জগদানন্দ রায়ের পরিচালনায় নানা প্রকার ফল ও শাকসবজির খেত তৈরি হয়। সেই ফল এবং শাকসবজি খাবার উপযোগী হলে জগদানন্দবাবু পাঠিয়ে দিতেন রান্নাঘরে।

শান্তিনিকেতনের নতুন রূপসজ্জা

এখন ভোজনালয়ের উত্তরের সেই টিনের বাড়িটি এবং বড় কুয়োটি আর নেই। সমগ্র জমিতে পাঠভবনের ছাত্রীদের বাসোপযোগী নানা আকারের কয়েকটি ছাত্রীনিবাস তৈরি হয়েছে।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ক্রমশ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসোপযোগী স্থানের প্রয়োজনে এবং আরও অন্য কারণে নতুন বাড়িঘর ক্রমশ গড়ে উঠতে লাগল। এখন থেকে খড়েরচালা মাটিরবাড়ি আর নয়। উঠতে লাগল ইট চুন সিমেন্টের তৈরি কয়েক প্রকার একতলা বা দোতলা পাকাবাড়ি— পুরনো চৌহদ্দির বাইরের চারিদিকে গাছপালাবিহীন শুষ্ক প্রান্তরগুলি অধিগ্রহণ করে।

আগেই বলেছি, উত্তরে উত্তরায়ণের বাড়ি ও রতনকুঠির কথা। পুবের বিরাট খোলা প্রান্তর অধিগ্রহণের পর রেললাইনের ধার ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত গড়ে উঠতে লাগল, বিশ্বভারতীর কাছ থেকে লীজ-পাওয়া, বিশ্বভারতী সোসাইটির সদস্যদের বাড়ি। এই অঞ্চলটির নাম দেওয়া হল পূর্বপল্লী। বিশ্বভারতীর পূর্ণ দায়িত্ব ১৯৫১ সালে ভারত সরকার গ্রহণ করবার পর এই প্রান্তরে একে একে গড়ে উঠল নতুন অতিথিশালা, কলেজের ছাত্রাবাস, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবন ও দর্শনভবন। এ ছাড়া, এখানে ছাত্রদের জন্যে আর একটি খেলাধূলার মাঠও হল। এখন প্রতি বছর ৭ই পৌষের বাৎসরিক উৎসবের সময় তিনদিনের যে মেলা বসে, সেটি পূর্বে বসত উপাসনা মন্দির ও ছাতিমতলার উত্তরের ছোট মাঠে প্রথমে একদিনের, পরে দু' দিনের জন্য। গুরুদেবের জন্মশতবার্ষিকীর সময় স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান এই বৃহৎ প্রাঙ্গণটিতে তিন দিনের মেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এবারে আমি প্রাচীন সীমানার শেষে পশ্চিমদিকের বাড়িঘরের কথায় আসছি। ভোজনালয়ের পরেই হল বিরাট দোতলা ছাত্রীনিবাস— 'শ্রীসদন'। তিরিশের দশকে হল কলাভবনের ছোট-বড় বেশ কয়েকটি বাড়ি। ১৯৩৯ সালে কলাভবনের এই বাড়িক'টির পশ্চিমে সংগীতভবন তৈরি হল। এর আগে সংগীতভবনের গান-বাজনা নাচের ক্লাসগুলি হত কলাভবনের 'নন্দন' নামে বড় বাড়িতে। ষাটের দশকে, সুধীরঞ্জন দাশ যখন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়ে যোগ দেন তখন তিনি প্রথমে বিড়লা এবং পরে গোয়েঙ্কার মতো দুজন ধনীকে অনুরোধ করে দুটি বড় দোতলা ছাত্রীনিবাসের টাকা সংগ্রহ করে দুটি বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এরই পরে আরও কয়েকটি ছাত্রনিবাস তৈরি হয়েছিল। এ যুগেই কলাভবনের 'নবনন্দন' নামে আর একটি দোতলা বড় বাড়ি রচিত হল। সেখানে আছে, কলাভবনের গ্রন্থাগার, ম্যুজিয়ম, অফিস ও চিত্রপ্রদর্শনীর উপযোগী কয়েকটি ঘর। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তার ডানদিকে নির্মিত হয় কলাভবন ও সংগীতভবনের বয়স্ক ছাত্রদের ছাত্রাবাস। খানিকটা এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় বহুদিনের পুরাতন সাঁওতালদের পল্লী, যাকে আমরা বলি 'পিয়ার্সন পল্লী'। তারই উত্তরে অনেকখানি জমি অধিগ্রহণের পর সেখানে গড়ে উঠল শিক্ষা ভবন— বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য। এখানে আছে বড় আকারের ছাত্রাবাস, রান্না ও খাবার ঘর, পুস্তকাগার, অধিবেশনের উপযোগী হল ঘর'। শ্রীনিকেতনের রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে পড়বে এন্ডরুজের নামে গঠিত প্রায় পঞ্চাশজন অধ্যাপক-শিক্ষকের সপরিবারে বাসোপযোগী একতলা পাকা বাড়ি। এর দক্ষিণে গোটা

কয়েক দোতলা পাকাবাড়িও বিশ্বভারতী তৈরি করেছেন অধ্যাপক-শিক্ষকদের সপরিবারে বাসের প্রয়োজনে। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে যাবার এই রাস্তার বাঁ দিকের জমিতে একটানা পর পর বাসোপযোগী বাড়ি করে বাস করছেন অনেকে। এর খানিকটা পরে এই রাস্তারই বাঁদিকে অনেকখানি ফাঁকা জমি নিয়ে বিশ্বভারতী থেকে 'বিনয়ভবন' নামে শিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Teachers' Training College'।

নেপাল রোডের গায়েলাগা দক্ষিণে রচিত হল বিদ্যাভবন, চিনাভবন, হিন্দিভবন-এর বাড়ি ক'টি, গুরুদেবের মৃত্যুর কয়েকবছর পূর্বে।

নেপাল রোডের দক্ষিণ-পশ্চিমের খোলা প্রাঙ্গণটিতে স্বতন্ত্রভাবে পাঠভবনের ছাত্রদের ছাত্রাবাস, রান্না ও খাবার ঘর ছাড়াও রচিত হল পাঠভবনের সাহিত্যসভা, নৃত্যগীতের উপযোগী ঘর। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য ও গীতের শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা এখানেই তাদের শিক্ষা গ্রহণ করে। চিত্রকলা ও নানাবিধ কারুকলার চর্চার ব্যবস্থা আছে পাঠভবনের অন্য বাড়িতে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা এখনও হচ্ছে শান্তিনিকেতনের পুরনো সীমানার মধ্যে নানাপ্রকার বৃক্ষের ছায়ায় আসন পেতে মাটিতে বসে। বিশ্বভারতীর কলেজ-শিক্ষার ব্যবস্থা এই খোলা মাঠে বৃক্ষের ছায়ায় গৃহীত হয় না। সেখানে যাবতীয় বিষয়ের পাঠ শিক্ষকরা দিয়ে থাকেন সেখানকার নির্দিষ্ট গৃহের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের আবদ্ধ রেখে।

খোয়াই

মূল শান্তিনিকেতনের এবং তার বাইরের জমিতে বাড়িঘরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতের ফল ও ফুলের ছোট-বড় গাছপালা লতাপাতায় চারিদিক যেভাবে ছেয়ে গেছে, তার জন্য এখন বিদ্যালয়ের যুগের মতো চারিদিকের দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর আর চোখে পড়ে না। খোলা মাঠগুলি বাড়িঘরসহ নানা প্রকৃতির গাছপালায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে শান্তিনিকেতনের যে অঞ্চলটি 'শ্রীপল্লী' বলা হয়, তার চারপাশ থেকে পর পর উত্তরে ছোট-বড় তিনটি বাঁধ বা জলাধার আমরা দেখি। ঠিক এখান থেকে, অর্থাৎ শ্রীনিকেতন যাবার রাস্তার উত্তরেই, বিদ্যালয়ের যুগে আমরা 'খোয়াই' নামে এক প্রকার খাল দেখতাম। সেটি এঁকে-বেঁকে একটানা চলে গিয়েছিল উত্তরে গোয়ালপাড়া গ্রামের গায়ে লাগা 'কোপাই' নদী পর্যন্ত। খোয়াইয়ের দু'পাড়ে দেখা যেত প্রচুর কাশ এবং কেয়া গাছের ঝাড়। বর্ষার দিনে এই খোয়াই দিয়ে চার দিকের কাঁকুরে মাটিধোয়া লাল জল প্রবলবেগে ছুটতো কোপাই নদীর দিকে। ঘনবর্ষার দিনে ক্লাসের পড়া মাস্টারমশাইরা যখন বন্ধ করে দিতেন, আমরা তখন প্রবল আনন্দে বর্ষার জলে ভিজতে ভিজতে খোয়াইতে পৌঁছে তার লাল জলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। প্রবল বর্ষার সময়েও খোয়াইয়ের জলে ডুবে মরবার কোনও ভয় ছিল না। আমরা বেশির ভাগ সময় জলে শুয়ে পড়ে, গড়িয়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে চেষ্টা করতাম। এইরূপ জলক্রীড়ায় আমাদের সঙ্গে অল্পবয়সী মাস্টারমশাইদের মধ্যে কেউ কেউ যোগ দিতেন। বর্ষা ঋতুতে এই অঞ্চলের কেয়া ফুলের জঙ্গলে কেয়াফুল প্রচুর দেখা যেত। অনেক সময় সেখান থেকে সেই ফুলও সংগ্রহ করতাম। কেয়া গাছের পাতার কাঁটা অবশ্য আমাদের অস্বস্তির কারণ ছিল। কেয়া গাছের ঝোপে বিষধর সাপের দেখা প্রায়ই পাওয়া যেত বলে কেয়াফুল পাড়বার সময় আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হত। কিন্তু সাপ চোখে পড়লেও সেখান থেকে পালাতাম না। আমাদের ধারণা ছিল, সাপদের বিরক্ত না করলে তারা কাউকেই আক্রমণ করে না। সুতরাং সাপ যখন আমাদের উপস্থিতির আভাস পেয়ে আমাদের দিকে তেড়ে না এসে আপনা থেকেই নিজেদের গর্তে প্রবেশ করত, তখন কেয়াফুল সহজেই গাছ থেকে পেড়ে নিতে পারতাম।

বর্ষা ঋতুতে খোয়াইয়ের জল সর্বত্র দেখা গেলেও শরৎকাল থেকে তা খুবই কমে যেত। জলের স্রোত চোখে না পড়লেও মাঝে মাঝে জল দেখা যেত। তার দুই পাড়ের নানা স্থানে স্বল্প উচ্চ কাশ ঝাড়ে শরতের রোদে সাদা কাশফুল হাওয়ায় যেভাবে ঢেউ খেলত তা দেখে মনে হত যেন তারা নিজেদের মধ্যে হেলেদুলে খেলা করছে।

এখানকার এই কেয়া ফুল, নেপালচন্দ্র রায়ের স্ত্রী আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন একটি বিশেষ কারণে। তিনি এই ফুলের সুমধুর গন্ধযুক্ত রেণু, পানে খাবার খয়েরের সঙ্গে মিশিয়ে একপ্রকার মশলা তৈরি করতেন। তাকে বলা হত কেয়াখয়ের। তিনি নিজে যেমন পানের সঙ্গে ওই কেয়াখয়ের খেতেন, তেমনই সে যুগের পানপাতায় আসক্ত নারীপুরুষ সকলকেই খাওয়াতেন। সকলেই আগ্রহ নিয়ে সেই পান খেতেন। কেয়াখয়ের তৈরির পদ্ধতিতে সে যুগের যশোর ও খুলনা জেলার মহিলারা নাকি খুবই পটু ছিলেন। নেপালবাবু ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন ওই অঞ্চলের বাসিন্দা। নেপালবাবুর স্ত্রী কেয়াখয়ের তৈরি করতে শিখেছিলেন অল্প বয়সে বাড়ির বয়স্ক মহিলাদের কাছ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর সুগন্ধি কেয়াখয়ের তৈরি করবার সেই প্রথা এখানে বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে এখন কেয়াখয়েরের নামও কেউ জানে না। আমার মতো বৃদ্ধদের মধ্যে হয়তো এর কথা কেউ কেউ এখনও মনে রেখেছেন। তবে শোনা যায়, বাংলাদেশের যশোর ও খুলনা জেলায় এখনও নাকি তা তৈরি করেন মহিলারা।

এতক্ষণ বিদ্যালয় যুগের খোয়াই এবং তৎসংলগ্ন কাশ ও কেয়াফুলের যে বর্ণনা দিলাম তার পরিচয় এখন আর পাওয়া যায় না। বিশেষ করে খোয়াই ও কেয়াগাছ সে যুগের মতো কাছাকাছি আর নেই বললেই চলে। কলাভবনের প্রথম দিকের শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ দিগন্ত প্রসারী খোলা মাঠের মধ্যে মন-উদাসী খোয়াই-এর চিত্র এঁকেছেন। এ যুগে সেই চিত্রগুলি কখনও চোখে পড়লে সেদিনের খোয়াই-এর সেই উদাস-করা স্মৃতির ভারে মন ভারাক্রান্ত হয়।

বাবা—বাগানবাড়ি—ইংলন্ড

বিদ্যালয়ের যুগে দেখা যেত এক-একটি ছাত্রাবাসে একজন করে অধ্যাপক ছাত্রদের সঙ্গে থাকতেন। ক্ষিতিমোহন সেনকে দেখেছি 'বীথিকা' ঘরে ছাত্রদের সঙ্গে থাকতেন, তাদের দেখাশোনা করবার জন্যে। তিনি গৃহের একেবারে পূর্বপ্রান্তে থাকতেন, একটি জানলার ধারে। সেখানে একটি কাঠের ডেস্কে বসে লেখা-পড়াও করতেন। দু' পাশে খাতাপত্র, নানাপ্রকার গ্রন্থাদিও থাকত। আমাদের বাবাও থাকতেন 'বাগানবাড়ি' নামে ছাত্রাবাসটিতে। তিনি কী ভাবে ছাত্রদের সঙ্গে থাকতেন তার একটি সংবাদ আমরা পাই ১৩৬০ (১৯৫৩) সালে সাধনা কর-রচিত 'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়' শীর্ষক একটি গ্রন্থ থেকে। তিনি ১৯০৯/১০ সালের ছাত্রদের হস্তলিখিত পত্রিকা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে আছে— '১৩১৭ সালে ... শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে কালীমোহন ঘোষ মহাশয় তখন আশ্রমের বাগানবাড়ির ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি শুধু ছাত্রদের দেখাশোনা করতেন না তাদের নানাভাবে প্রেরণা দিয়ে গড়ে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন। বাগানবাড়ির সামনে তিনি ছেলেদের বাগান করতে শিক্ষা দেন। এইভাবে বাইরের পরিবেশটির শ্রী ফুটিয়ে তুললেন এবং মনের ফসল সৃজন করবার উৎসাহ দিয়ে বের করালেন 'বাগান' নামে এক পত্রিকা।' সে যুগে আরও কয়েকটি হস্তলিখিত পত্রিকা ছাত্ররা প্রতি মাসেই প্রকাশ করত। 'বাগান' নামক পত্রিকাটি তারই একটি।

ছাত্রদের 'শিশু' নামক একটি পত্রিকায়, ইংলণ্ড বাসকালীন বাবার একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রে ইংলন্ডের খ্রিস্টোৎসবের সময়ে সে দেশের ছোট ছোট শিশুরা কীভাবে আমোদ-প্রমোদ করত তার কথা আছে। চিঠির একস্থানে বাবা লিখেছেন— 'লণ্ডনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের

ছেলেমেয়েরা একত্র হয়ে অদ্ভুত পরীর পোশাক পরে সুন্দরভাবে নাচছে। এক-এক বিদ্যালয়ের এক-এক দল। আমাদের শারদীয় উৎসবে তোমরা নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে ডালি সাজিয়ে নেচে নেচে যে গান করেছিলে, এ সেই ধরনের।'

বাবা যে গানটির উল্লেখ করেছেন সে গানটির প্রথম পঙক্তি হল— 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ'। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর (১৩২৬ আশ্বিন) মাসে যখন বিদ্যালয়ে 'শারদোৎসব' নাটকটি পুনরায় অভিনীত হয় তখন এই গানটির সঙ্গে যে ক'জন ছাত্র নাটকটির বালকের দলে অভিনয় করেছিল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা একসঙ্গে ডালিতে কাশফুলের গুচ্ছ ও শেফালি ফুল সাজিয়ে গানের তালে তাল মিলিয়ে পদচালনায় মঞ্চে প্রবেশের পর প্রদক্ষিণ করেছিলাম, সেও ছিল একপ্রকার নাচ।

শিক্ষা— ব্রহ্মচর্যাশ্রম

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ট্রাস্ট ডিড-এ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। সেই প্রস্তাবানুযায়ী তাঁর পৌত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রহ্মবিদ্যাচর্চাকেন্দ্র' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব মহর্ষিদেবের কাছে উত্থাপন করলে মহর্ষি সানন্দে সম্মতি প্রদান করেন এবং আর্থিক সাহায্যও দেন। বলেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যাকেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। কাজে হাত দেবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, ৩রা ভাদ্র ১৩০৬ (১৮৯৯) সালে।

বলেন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা কীভাবে করবেন তার একটি খসড়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সেটি উদ্ধার করে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন—

'১. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপন করা হইবে।
২. বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে।
৩. আপাতত দশজন ছাত্র বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।
৪. আহারের ব্যয়স্বরূপ মাসিক ১০ টাকা দিলে আরও ২০ জন ছাত্রকে লওয়া যাইতে পারিবে।
৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্টিগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রাস্টিগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপর কোনও অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষেরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।
৬. অধ্যক্ষ-সমিতি ব্রাহ্ম ধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।
৭. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্টিগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ-সভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন, ছাত্র-নির্বাচন, পুস্তক নির্বাচন, শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।
৮. বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে [বর্তমান ৮ম শ্রেণী] পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী [বর্তমান ৭ম শ্রেণী] হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপন হইবে।
৯. ৩য় বার্ষিক শ্রেণী [বর্তমান ৮ম শ্রেণী] হইতে এন্ট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণসহ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ দিবে এবং নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।
১০. সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়-ভবনে বাস করিতে হইবে এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত

সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুকেও যোগ দিবেন।

১১. ছুটির সময় ব্যতীত মাসে তিন দিন অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাটি যাইতে পারিবে।

১২. অভিভাবকগণ প্রতি রবিবার গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন।'

এই সময়ে গুরুদেব সপরিবারে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বাস করতেন। তাঁর পুত্রকন্যাদের পঠন-পাঠনের কথা চিন্তা করে, সেখানেই একটি গৃহবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুদেব চাইছিলেন, কলকাতা শহরের পরিবেশে নির্মিত বিদ্যালয়ে পড়াশোনার যে ব্যবস্থা আছে, তার থেকে তাঁর পুত্রকন্যাদের দূরে রাখতে। সেই কারণেই শিলাইদহে ওই গৃহবিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা। তখনকার সেই গৃহবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনজন, যথাক্রমে শিবধন বিদ্যার্ণব— বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার, জগদানন্দ রায়— অঙ্ক ও বিজ্ঞান এবং লরেন্স নামে একজন ইংরেজ সেখানে ছিলেন— তিনি পড়াতেন ইংরেজি ভাষা।

বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত শিক্ষা পরিকল্পনাটির প্রতি গুরুদেবের সমর্থন ছিল বলেই বোধ হয় তাঁর শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়টিকে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করবার কথা ভেবে প্রথমে যা করেছিলেন, তার কথা মনে রেখে তিনি লিখে গেছেন— 'আমি পিতাকে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।' পিতার সম্মতি পাবার পর শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়টির প্রস্তুতির কাজে হাত দিয়ে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে ১৯০১ সালের অগস্ট মাসের চিঠিতে গুরুদেব জানাচ্ছেন— 'শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না— দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে।' পুনরায় পরের মাসে জানালেন— 'পৌষ মাস হইতে বিদ্যালয়টি খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ

ভারতীয় প্রাচীন যুগের আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শে বিশ্বাসী কলকাতার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শে একটি বিদ্যালয় গড়ার চেষ্টায় ছিলেন। উপাধ্যায় গুরুদেবের খুবই অনুরাগী ছিলেন তাঁর কাব্য ও সাহিত্য পাঠ করে। সেই সূত্রে দুজনের মধ্যে বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল। ব্রহ্মবান্ধব গুরুদেবের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সংবাদ পেয়ে তাঁর কলকাতার বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রসহ শিক্ষক রেবাচাঁদকে নিয়ে গুরুদেবের বিদ্যাশ্রমে যোগ দেন। ব্রহ্মবান্ধবের ছাত্রদের সঙ্গে গুরুদেবের পুত্র রথীন্দ্রনাথও এই ছাত্রদলে ছিলেন। এঁরাই হলেন বিদ্যাশ্রমের প্রথম যুগের প্রথম ছাত্রদল। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকালে গুরুদেব এর নাম দিয়েছিলেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। এই বিদ্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল ১৯০১ সালে—১৩০৮ সালের ৮ই পৌষের দিনে। গুরুদেব এই দিনটিকে নির্বাচন করেছিলেন বিশেষ কারণে। ৭ই পৌষের দিনটি হল, তাঁর পিতৃদেবের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের দিন। ওই দিনটিকে স্মরণ করে সেদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দুবেলা মন্দিরে উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই দিনটির জের টেনে, শুভদিন বলে স্থির করে, পরের দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দীক্ষিত করে, তাদের নিয়ে আশ্রমের শিক্ষার কাজ শুরু করলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায়। কিছুকাল খুবই নিষ্ঠাসহকারে প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদলে এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে শুরু হল লেখাপড়ার কাজ। শান্তিনিকেতনের প্রথম

যুগের সীমানায় পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে যে একতলা পাকাবাড়িটি ছিল, তারই তিনটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করে ছাত্র ও ক'জন শিক্ষক বাস করতেন। প্রারম্ভিক কালে ব্রহ্মবান্ধব এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কটি ছাত্রের জীবনযাত্রার যে ছকটি কেটে দিয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। রেবাচাঁদের লেখায় সে যুগের ছাত্রদের জীবনযাত্রার যে চিত্র আমরা পাই, তাতে আছে—'The ground floor was partitioned into three compartments, one of which served the masters; the second was used as a class-room, and third one could be used by both. Rewachand was boarding master, teacher and manager.

'The students got up at a quarter to five, swept, had a swim in the pond, dressed. The Brahmin boys in white silk, the Vaidyas and Kayasthas in red silk, and the Vaisya lads in yellow silk; the various colours representing the various castes, then they said their individual prayers in Sanskrit, each under a separate tree, had their breakfast which consisted of gram soaked in water and halwa, and dug the ground for cultivation for about half an hour. The classes opened at 7 a.m. with a prayer in which both the masters and the pupils joined. At ten class-teaching was over, the boys had various indoor games or practised on the harmonium or read story books, each according to his taste. At 11-30, they had their lunch, the Brahmins dining separately. At 12-30 the school re-opened. There was recreation for 15 minutes at 3, and the lessons were finished exactly at 4-30. Cricket and football were over by 6-30. The evening prayers being done, as the morning, the boys had lessons in music followed by supper, and exciting games or stories, and when the clock struck 7, all the students were fast asleep.

'The boys were divided into groups according to their attainments and each group with its masters sat under a tree for instruction. The whole scene with its innocent glee and active mirth, its hard struggle and energetic work, its sweet music and disinterested devotedness, reminded one of the happy, glorious days of the ancient acharyas.'

প্রারম্ভিক কালের ছাত্রদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার যে চিত্রটি রেবাচাঁদ দিয়ে গেছেন তার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতের তপোবনের ব্রহ্মচারীদের জীবনকে এখানে প্রবর্তন করবার চেষ্টা কীভাবে তাঁরা করেছিলেন। তাতে গুরুদেবেরও সমর্থন ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জনসমাজকেও তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি। সামঞ্জস্য রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রম ত্যাগ করতে হয়েছিল এক বছরের মধ্যে। অনুমান করা হয় যে, তাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে গুরুদেবের মতভেদই এর কারণ।

ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ যেভাবে এই ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়টিকে কঠোর নিয়ম বেঁধে গড়ে তোলবার কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং এক বছরের মধ্যেই তাঁরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে গেলেন, তার সঠিক কারণ জানা যায়, প্রথম যুগের অধ্যাপক জগদানন্দ রায় এবং প্রথম যুগের ছাত্র রথীন্দ্রনাথের লিখিত বক্তব্য থেকে। জগদানন্দবাবু জানিয়েছেন—'শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। রেবাচাঁদের উপর ছাত্র-পরিচালনার ভার ছিল। তিনি বড় কড়া লোক ছিলেন। ছেলেরা যেমন তাঁহাকে ভালবাসিত তেমনি তাঁহার ভয়ে কাঁপিত। .... রেবাচাঁদের কঠোর শাসননীতি আমাদের কিন্তু ভাল লাগিত না।' রথীন্দ্রনাথ বলেছেন—'রেবাচাঁদ মাস্টারমশাই নিতান্ত সাধু প্রকৃতির ছিলেন, ইংরেজি খুব ভাল পড়াতে পারতেন, কিন্তু কড়া নিয়ম পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। ... বাবা ওই রকম কঠোরতা পছন্দ করতেন না।'

ব্রহ্মবান্ধব নাকি নিয়মিত শান্তিনিকেতনে থাকতেন না, মাঝে মাঝে আসতেন। রেবাচাঁদের উপরেই ছিল এখানকার সব দায়িত্ব। এঁদের দুজনের শান্তিনিকেতন ত্যাগের কারণ সম্পর্কে অন্যরকম সংবাদও শোনা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, জগদানন্দবাবু ও রথীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক। তখনকার বিদ্যালয়ের পরিচালনার চিন্তাভাবনা ও সার্বিক জীবনযাত্রার সঙ্গে গুরুদেবের চিন্তাভাবনার ও কার্যপ্রণালীর পার্থক্য ছিল ব্যাপক। মনের অমিলের কারণেই ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এ সময়ে ছাত্রদের জন্য এখানকার জীবনযাত্রার আরও যে কয়েকটি নিয়ম চালু করা হয়েছিল সেগুলি হল—জুতা ও ছাতার ব্যবহার নিষেধ এবং নিরামিষ আহার ছাত্র ও সকলের পক্ষে ছিল আবশ্যিক। পাঠ আরম্ভের পূর্বে অধ্যাপকদের পদধূলি ছাত্রদের নিয়মিত নিতে হবে।

প্রথম ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক বেতন নেওয়া হত না। ছাত্র ও শিক্ষকদের আহারাদির খরচ গুরুদেবই বহন করতেন। যে কজন শিক্ষক তখন বিদ্যাশ্রমে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মাসিক বেতন গুরুদেব নিজের সংসারের আয় থেকেই সংগ্রহ করে দিতেন। দু'একজনের কাছ থেকে সাময়িকভাবে কিছু আর্থিক সাহায্যও তিনি সেই সময়ে পেয়েছিলেন।

আর্থিক অনটনের চাপে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বৎসরে ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক ১৫ টাকা বেতন নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে ছাত্রসংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে, তার জন্য খরচও বেড়েছে। খরচ নির্বাহের কোনও উপায় না দেখে, গুরুদেবকে নিজের গ্রন্থস্বত্ব এবং পত্নী মৃণালিনী দেবীর মূল্যবান বহু গহনা বিক্রয় করে টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

পূর্বের বিদ্যালয়ের যে তিন শিক্ষক শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন, অর্থাৎ শিবধন বিদ্যার্ণব ও লরেন্স সাহেব শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। রয়ে গিয়েছিলেন একমাত্র জগদানন্দ রায়। এই সময়ে ১৯০২ সালে, যে ক'জন নতুন শিক্ষক শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন, তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অবিনাশ বসু ও কুঞ্জলাল ঘোষ। ১৯০৩ সালে যোগ দিলেন মোহিতচন্দ্র সেন, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র রায়।

গুরুদেবের পর পর মৃত্যুশোক

এ-যুগের প্রথম দশকের প্রারম্ভেই গুরুদেবের পরিবারে একটানা পর পর মৃত্যুজনিত দুর্যোগ ঘটে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছর থেকে গুরুদেবের পত্নী মৃণালিনী দেবী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার সুবিধার্থে শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর গৃহে নিয়ে এসে চিকিৎসা ও পত্নীর সেবায় গুরুদেব যুক্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মৃণালিনী দেবীকে বাঁচাতে পারেননি। তাঁর মৃত্যু হল ১৯০২/১৩০৯ সালের অঘ্রান মাসে। পত্নীর মৃত্যুর বেদনা কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই গুরুদেবের দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা মারা গেলেন ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাঁকে নিয়ে গুরুদেবকে বেশ কিছুকাল, প্রথমে হাজারিবাগ, পরে আলমোড়াতে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু উন্নতি হল না। মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। সেখানেই দেহত্যাগ করেন। গুরুদেব রেণুকার বিবাহ দিয়েছিলেন ১৯০১ সালের অগস্ট মাসে।

পত্নী ও দ্বিতীয় কন্যার অসুস্থতা ও মৃত্যুজনিত কারণে গুরুদেবকে ১৯০২ সাল থেকে একটানা প্রায় এক বছর, অর্থাৎ ১৯০৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের বাইরে থাকতে হয়। কিন্তু সেই নিদারুণ দুঃখের দিনেও তিনি বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। বিদ্যালয়ের পরিচালনা এবং পড়াশোনা সম্পর্কে অধ্যাপকদের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। ওই যুগেই

তখনকার অধ্যাপক কুঞ্জলাল ঘোষকে বিস্তারিতভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে একটি নির্দেশনামা রচনা করে পাঠালেন, যাতে তখনকার অধ্যাপকগণ সেই নির্দেশনামা অনুসারে একসঙ্গে কাজ করে যেতে পারেন। গুরুদেব তাঁর অবর্তমানে অধ্যাপকদের মধ্যে কাজকর্মে বিরোধের আশঙ্কা করতেন। সেই কথা ভেবেই ওই নির্দেশনামাটি তাঁকে রচনা করে পাঠাতে হয়েছিল। এটি লিখে পাঠিয়েছিলেন ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে। এই পত্রটি যে কারণে উল্লেখযোগ্য তা হল, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের ব্রহ্মচারীদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে যেভাবে ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা বেঁধে দেওয়া হত, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জীবনকেও সেই পথে সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে দিতে। গুরুদেবও তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু এতটা কঠোর এবং নিরানন্দময় জীবনযাত্রার মধ্যে এখানকার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হোক, তিনি তা চাননি। সেই কারণেই বহু পৃষ্ঠাব্যাপী ওই পত্রটি রচনা করে, কুঞ্জলাল ঘোষের মাধ্যমে তাঁর মনোভাব সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কাছে জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা অনুষ্ঠান

১৯০১ সালের ৮ই পৌষে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন ছাত্রদের দীক্ষানুষ্ঠান যে-রীতিতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ করেছিলেন, তাতে তাঁদের চিন্তার পরিচয় সঠিক পেতে বোধ হয় কোনও অসুবিধা হবে না। 'ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা অনুষ্ঠান' নামে সেদিন যে মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে শিক্ষক এবং ছাত্ররা কাজে যুক্ত হয়েছিলেন সেইগুলি এখানে উদ্ধৃত করছি। তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁরা দু'জনে কোন পথে ছাত্রদের পরিচালনার কথা ভেবেছিলেন। মন্ত্রগুলি হল—

'ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ঋতংবদিষ্যামি। সত্যংবদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মকে নমস্কার। ঋত বলিব। সত্য বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করুন।

ওঁ আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। যশো জনেহসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোহসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিনংসহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতায়ন্তি, যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোহসি প্র মা ভাহি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব।

আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। ব্রহ্মচারিগণ দম সাধন করুন। ব্রহ্মচারিগণ শম লাভ করুন। আমি যেন লোকে যশস্বী হই। আমি যেন ধনবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য, তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য, তুমি আমাতে প্রবেশ কর। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য, সহস্র শাখা যে তুমি, তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি। জল যেরূপ নিম্নস্থানে যায়। মাসসমূহ যেরূপ সংবৎসরে যায়, হে বিধাতঃ সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক হইতে আমার সমীপে আসুন। তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত কর, আমাকে অধিকার কর।

ব্রহ্মচারিগণ সম্মুখে উপনীত হইলে কহিলেন, সহ নৌ যশঃ সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্।
আমরা একত্রে যশলাভ করি, আমরা একত্রে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্মচারিগণ কহিলেন,

ওঁ ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং। তেনর্ধ্যাসমিদমহম্ অনৃতাং সত্যমুপৈমি।

হে ব্রহ্মপতে, আমি ব্রতপালন করিব। তোমার নিকট প্রার্থনা করি যেন আমি সমর্থ হই।

অর্ঘ্যসমিদ্‌যুক্ত শ্রদ্ধাবান আমি যেন অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হই।

শরীরং মে বিচর্যণম্‌ জিহ্বা মে মত্তমা। কর্ণাভাং ভূরি বিশ্রুরম্‌ শ্রুতং মে গোপায়।

আমার শরীর উপযুক্ত হউক। আমার জিহ্বা অত্যন্ত মধুরভাষিণী হউক। আমি যেন কর্ণে বহু শ্রবণ করি। যে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিব তাহা যেন রক্ষা করিতে পারি।

গুরু। ওঁ সত্যং বদ। সত্য বল।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ধর্ম্মং চর। ধর্মাচরণ কর।

শিষ্য। ওঁর বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। অধ্যয়ন হইতে স্খলিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ·বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ধর্মান্ন প্রমদিতব্যং। ধর্ম হইতে পতিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। কুশল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ভুত্যৈর্ন প্রমদিতব্যং। মহত্ত্বলাভে উদাসীন হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ পিতৃদেবোভব। পিতাকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ আচার্যদেবোভব। আচার্যকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ যানি অনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরানি। যে সকল কর্ম অনিন্দনীয় সেই সকল কর্ম করিবে, অন্য কর্ম করিবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। যান্য স্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরানি। আমাদের যে সকল কর্ম সৎ, সেই সকলই তোমার কর্তব্য, অন্য কর্তব্য নহে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্‌। শ্রিয়া দেয়ম। হ্রিয়া দেয়ম। ভিয়া দেয়ম্‌। সংবিদা দেয়ম্‌। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। শ্রীর সহিত দান করিবে। বিনয়ের সহিত দান করিবে। ধর্মভয়ের সহিত দান করিবে। বুদ্ধির সহিত দান করিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এতদ্‌ অনুশাসনম্‌। এবম্‌ উপাসিতব্যম্‌ এবমুচৈতং উপাস্যম্‌।

ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ, ইহাই অনুশাসন। এইরূপই আচরণ করিবে, এইরূপই আচরণ করিবে।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি
মম চিত্তম্‌ অনুচিত্তম্‌ তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষষ্য
বৃহস্পতিষ্ঠা নিযুনক্তুমহ্যম্‌।

আমার ব্রতে তোমার হৃদয়কে আমার অধীন করি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল থাকুক। আমার বাক্য একমনা হইয়া গ্রহণ কর—বৃহস্পতি ব্রহ্ম তোমাকে আমার সহিত যুক্ত করুন।

হরি ওঁ। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহবীর্যং করবাহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'
ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে, আচার্য ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের উভয়কে ভোগ করুন। আমরা উভয়ে যেন বীর্য প্রাপ্ত হই। আমাদের উভয়ের জ্ঞান অধীত হউক। আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম কার্যপ্রণালী

গুরুদেব কুঞ্জলাল ঘোষকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তা হচ্ছে এই—

'বিনয়সম্ভাষণমেতং—

'আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি, আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্ত মনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রত পালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

'আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষত্বলাভ স্বার্থ নয় পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতার দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠার দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনার জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য ব্রত।

'ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দান প্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

'ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এ সব কার্য ফরমাশমত চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এই জন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

'মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়—অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

'ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনই আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা, তেমনই স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমন কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল, সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারি নাই। আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজননীতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত

মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভাল তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশির অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

'ব্রহ্মচর্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনও লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে ...-র পুত্র ...-র শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে—সেটা দমন করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে-বসনেও শৌখিনতা দূর করা চাই।

'দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনও প্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনও ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড় কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশে যেন প্রত্যহ যথা সময়ে যথা নিয়মে পরিষ্কার তকতকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

'তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনও মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনও পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে সে সময়ে কোনও ছাত্র উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনও অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

'বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

'যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দু সমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনও প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু-আচার বিরুদ্ধ কোনও অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

'আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যেভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র কোনও বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে, মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে ? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব ? সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি ? সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের

মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরের জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রী মন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে—এই জন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।

'যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

'ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এই জন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা বারবার ব্যবহার করিতে পারে।

'ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে ওঁ পিতানোহসি উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষমাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞান শিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেই জন্যই ওই মন্ত্রে আছে—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।

'ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য, মনুষত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদভদ্রং তন্ন আসুব।

'বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই চিত্ত বিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদক সেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল মন্ত্রের মধ্যে ততই গভীরতররূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এই জন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মত না হইয়া যায়, সে জন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশত নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনও মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালই হয়।

'এক্ষণে আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক। মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমত বিদ্যালয়ের কার্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন।

'বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়ালেখা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

'বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতন নির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের

পরামর্শমত আপনি করিবেন।

'মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

'খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষর-সহ আমাকে দিতে হইবে।

'সমিতির প্রস্তাবিত কোনও নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

'সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

'ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনও জিনিস নষ্ট হইলে, হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষর-সহ তাহা জমাখরচ করাইয়া লইবেন।

'আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

'ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

'ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

'বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনওরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

'গোশালায় গরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

'বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারি বাগান আপনার হাতে। সে জন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

'শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে। জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরি সহায়তায় মাঝে মাঝে মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে—কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

'ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীদের জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

'শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যথা প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

'শান্তিনিকেতন-আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনও দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

'জাপানি ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন।

'মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনে অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

'অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনও ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

'বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

'অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন—আপনি সমিতিকে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

'আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনও আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

'বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

'পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

'সমিতি, বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন, আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

'কোনও বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

'কোনও ছাত্রের অভিভাবক কোনও বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে, অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

'গোশালায় গরু মহিষ যে দুধ দিবে, তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

'শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনও বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

'কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

'মাসের মধ্যে একদিন থালা-ঘটি-বাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

'ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

'উপস্থিত মতো এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যক মতো ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

'কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বত-উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

'এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনও অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়া জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনই তাঁহাদেরও কর্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

'আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি, সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকাল পূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

'কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি, তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য—অন্যকে সে জন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো যায় না—এবং এ সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

'আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। বর্তমানের মধ্যে

ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেই জন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেই জন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না—কালের উপরে, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

'আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণ বীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনই আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা ছোটখাটো অভ্যাসদোষ—এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরের ভক্তিও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শিখে।

'আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা, অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অপমান নাই—এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষ রূপে শিক্ষা করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোনও আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সঙ্গত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালার গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণ অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভাল হয়। আমার ইচ্ছা, কয়েকটি পাখি, মাছ ও ছোট জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভাল। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা—এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

'জাপানি ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনও বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এনট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনও ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার যত্ন লইতে পারে—নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনও প্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

'ছাত্রেরা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

'রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভাল হয়।

'সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি, এ জন্য সকল কথা ভালরূপ চিন্তা করিয়া লিখিত পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

'আপনার প্রতি আমার কোনও আদেশ নির্দেশ নাই ; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯/১৯০২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ বিদ্যালয় ত্যাগ করবার কিছুকাল পরই পূর্বোক্ত কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত ও গুরুদেব-প্রণীত 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম কার্যবিলী' শিরোনামে বিদ্যালয়ের বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা-প্রসূত সম্পূর্ণ নতুন যে কার্যসূচিটি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা পরিচালনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেগুলি ছিল খুবই বাস্তবমুখী। কোনওপ্রকার অবাস্তব কাল্পনিক চিন্তার কোনও আভাস তাতে পাওয়া যায় না। এই নির্দেশনামাটি যেভাবে রচনা করেছিলেন তাতে প্রাচীন তপোবনের মতো শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আশ্রমবাসীদের আশ্রমের জীবনযাত্রার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু তিনি ভাল করেই জানতেন যে, পরাধীন ভারত ও তার জনজীবনের চাকরিজীবী সমাজের কথা ভাবলে তাঁর চলবে না। সেই কারণে, এবারকার প্রথম কার্যপ্রণালী রচনায় 'ধর্মব্রত', 'নিষ্ঠা', 'ভক্তি', 'আহ্নিক' প্রভৃতি অংশের সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার নির্দেশনামায় কুঞ্জলাল ঘোষকে যা লিখেছিলেন, তাতে গুরুদেব তখনকার সমাজজীবনকে যে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেননি এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসার সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কথাও তাতে যে ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

প্রথম যুগের ছাত্র—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সে যুগে গান-বাজনা, সাহিত্য ও কাব্যচর্চাকে গুরুদেব কতখানি জোরের সঙ্গে যে স্থান দিয়েছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, গুরুদেবের পুত্র এবং প্রথম যুগের ছাত্র রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথামূলক একটি প্রবন্ধ থেকে। তাতে তিনি লিখেছিলেন— 'আমি আশ্রমের গোড়া থেকে সংশ্লিষ্ট। আশ্রম প্রতিষ্ঠা যেদিন হল তার কথা বেশ সুস্পষ্ট মনে আছে। যদিও তখন আমার বয়স খুব অল্প। ১৯০১ সালের ৮ই পৌষের প্রত্যুষে এখন যে বাড়িতে লাইব্রেরি তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর— আমার মেজ জ্যাঠামহাশয় উপাসনা করে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন আমি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে উপনিষৎ অনেকখানি মুখস্থ করেছি— উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণে যোগ দিতে পেরেছিলুম। সেই সময় যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম খোলা হয়েছিল তার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম— উদ্দেশ্য ছিল গুটিকতক অল্প বয়সের ছাত্র নিয়ে, পুরাকালের ঋষিমুনিদের আশ্রমে যে রকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেইভাবে এখানেও

শিক্ষা দেওয়া হবে। ৮ই পৌষে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হল বটে কিন্তু আসলে আরম্ভ করতে সময় লেগেছিল। তখন শান্তিনিকেতনে দুটি মাত্র বাড়ি ছিল, দোতলা বাড়ি যেটি এখন অতিথিসেবায় ব্যবহার হয় আর লাইব্রেরি বাড়ি। লাইব্রেরি-বাড়ির নলচে-খোল সবই এখন বদলে গেছে। তখন ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি, তিনটি মাত্র তাতে ঘর ছিল। এই অতি ক্ষুদ্রকায় বাড়ি নিয়ে তো আর ইস্কুল হয় না, কাজেই অন্ততপক্ষে একটি ছাত্রাবাস ও রান্নাঘর প্রস্তুত করা দরকার হল।

'পিতৃদেবকে সাহায্য করবার লোক বড় বেশি কেউ ছিল না। শিলাইদা থেকে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে নিয়ে এসে বাড়ি তোলবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। কয়েক মাসের মধ্যে আদিকুটির— এখন যার প্রাক্‌কুটির নাম হয়েছে এবং লাইব্রেরির পিছনে একটি রান্নাঘর তৈরি হয়ে গেল। ডাক্তার মানুষ ইঞ্জিনিয়ারিং করলে যা হয়,— বাড়িগুলি খুব ব্যবহারোপযোগী হয়েছিল বলে বলতে পারি না। আমাদের সেই পুরনো রান্নাঘর পরিবর্তন করেই এখন অফিসঘর প্রস্তুত হয়েছে। বাড়ি হতেই ছাত্র ও অধ্যাপক সংগ্রহ হল। দুই-তিনজন অধ্যাপক ও আমরা পাঁচজন ছাত্র এই নিয়ে একদিন পড়াশুনা আরম্ভ হল। সেই আদিকালের অধ্যাপকদের মধ্যে কেবল জগদানন্দ রায় মহাশয়কেই বর্তমান আশ্রমবাসীরা মনে রাখতে পারেন। দু'এক বছরের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেল— নতুন অধ্যাপকও কয়েকজন নিযুক্ত হলেন। মনে আছে, যখন আমরা ২৫/ ৩০ জন হয়েছি তখনও ওই আদিকুটিরের সংকীর্ণ স্থানে পরম সুখে বাস করেছি— উপরন্তু যে কয়জন অধ্যাপক ছিলেন সকলেই আমাদের সঙ্গে ওই ঘরে বাস করেছেন। এ কথা শুনলে এখনকার ছাত্রদের বিভীষিকা বলে ঠেক্‌বে। এখনকার মতো টেবিল-চেয়ার আলনা-দেরাজ আসবাবপত্রের বিড়ম্বনা কিছুই ছিল না। আহার সম্বন্ধেও তাই— সকালে ছোলাভিজে, দুপুরে কলাইয়ের ডাল ও ভাত খেয়ে কাটাতুম— তার জন্যে কোনওদিন দুঃখ বোধ হয়নি। সে সময় রান্নাঘরে complaint book বলে উপদ্রবের সৃষ্টি হয়নি। ব্রহ্মচর্যের আদর্শ তখন সজীব ছিল— আশ্রমে যারা আসত কৃচ্ছ্রসাধনা করতে প্রস্তুত হয়েই আসত। কিন্তু তার জন্যে আনন্দের অভাব ছিল না। যে কয়জন অধ্যাপক ও ছাত্র আশ্রমেই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাব স্থির করলুম— ছাত্রদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার ও আমি— অধ্যাপকদের মধ্যে সতীশবাবু, সুবোধবাবু ও জগদানন্দবাবু। আর অতিথি একটি এসে জুটলেন— সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়। আমাদের আড্ডার স্থান লাইব্রেরি-বাড়ি,— মাঝখানের ঘরে গুটিকতক বইয়ের আলমারি ও পাথরের চৌকি— আর দু'পাশের দুই ছোট ঘরে আমাদের বাসা। ছুটি আরম্ভ হতেই সতীশবাবু সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন। প্রথম দিনেই আমাদের সকলকে নিয়ে ছাতিমতলায় বসিয়ে মেঘনাদবধ পড়তে লাগলেন। মাইকেলের মহাকাব্য যে এমন উপাদেয় লাগতে পারে তা সেইদিন আমরা পরিচয় পেলুম এবং সকলে মিলে সতীশবাবুকে আমাদের সাহিত্যগুরু মেনে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিলুম। সকালবেলায় তাঁর কাছে সাহিত্য পড়া আর বিকালে সুরেনবাবুর কাছে বিজ্ঞান আলোচনা চলল। সুরেনবাবুর মতো এমন শিক্ষক কখনও দেখিনি। বিজ্ঞানের সুকঠিন তথ্যগুলি সাধারণ ঘরোয়া জিনিসের উদাহরণ দেখিয়ে বিনা যন্ত্রের সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সহজে তিনি বুঝিয়ে দিতেন। পরে কলেজে যখন Chemistry পড়তে হয়েছিল তখন জানতে পারলুম এই গল্পচ্ছলে সুরেনবাবুর পড়ানোর মূল্য কতখানি। তিনি দু'মাসের মধ্যে যে পাকা ভিত গড়ে দিলেন তারই ফলে ইউনিভার্সিটিতে যত Chemistry-র Course নিয়েছি কোনওটাতে ৯৬-এর নিচে মার্ক পাইনি। সতীশবাবুর বাংলা classical সাহিত্য শেষ করতে বেশিদিন লাগল না— তার পরেই Shakespeare ধরলেন— সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসও পড়া হত তুলনার জন্য। এই একটি গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে মাইকেল, নবীন সেন, Shakespeare ও কালিদাস পড়া শেষ করা হয়েছিল শুনে অধিকাংশ পাঠকই বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু কয়জন পাঠকের ভাগ্যে সতীশবাবুর মতো গুরু মিলেছে? তিনি যে বই যেদিন ধরতেন শেষ না করে উঠতেন না, তাঁর পড়াবার এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আমাদের মতো শ্রোতাদেরও কখনও ক্লান্তি বোধ হয়নি। কোনও বইপড়া শেষ হলেই তার সমালোচনা করতেন— বড় বড় সমালোচকেরা কী বলেছেন প্রথমে তা শুনিয়ে তারপর নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। আমাদের কাছে তাঁর নিজের কথাটাই বেশি মূল্যবান মনে হত। সাহিত্য

আলোচনায় তিনি এত বিভোর হয়ে যেতেন যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকত না। একদিনের ঘটনা মনে আছে। সেদিন বর্ষশেষ। বিকেলের দিকে ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখেই আমরা মাঠে বেরিয়ে পড়েছি। তুমুল ঝড় এল— ঝড়ের গতিক দেখে আমরা আর সকলেই পালিয়ে লাইব্রেরির বারান্দায় আশ্রয় নিলুম। সতীশবাবুকে কে সামলায়— তিনি হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছেন। একসময়ে যখন প্রচণ্ড ঝাপটা এল আর না পেরে একটা বটগাছ জড়িয়ে ধরে প্রাণ বাঁচালেন। ঝড় কমতে, ফিরে এলেন আমাদের কাছে— সে কী চেহারা— পাগলের মতো দূর থেকে চিৎকার করছেন— "জানো আজ বর্ষশেষ, কী করছ ঘরের ভিতর—আজ যে ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা"— বলেই অনর্গল সমস্ত কবিতা মুখস্থ বলতে লাগলেন। বাইরে সত্যই "উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য" আর সতীশবাবুর উন্মত্তেরই মতো তার তালে তালে কবিতা আবৃত্তি— আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলুম। যখনই কালবৈশাখীর ঝড় আসে সতীশবাবুর "বর্ষশেষ" কবিতা পাঠের ধ্বনি কানে বাজতে থাকে। কখনও ভুলতে পারব না।'

প্রথম যুগের আশ্রমিক : সুধীরঞ্জন দাশ

সুধীরঞ্জন দাশ বাল্যবয়সে প্রথম শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রমে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন ১৯০৪ সালে। সেদিনের আশ্রমের এবং তার চারিদিকের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন— 'তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনের চারিদিকে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর। আশ্রম-এলাকার দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছিল সবুজ ধানক্ষেত এবং উত্তরে ছিল লাল কাঁকরের খোয়াই। ভুবনডাঙার গ্রামছাড়ানো রাঙামাটির পথ বেয়ে এলেই প্রথমেই দেখা যেত নিচু বাংলা..., আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখা যেত দেহলি..। দেহলিতে গুরুদেব অনেক দিন ছিলেন। উত্তর-পূর্ব কোনায় একটি পুকুর কাটা হয়েছিল কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া সেখানে জল থাকত না। মাটি স্তূপীকৃত হয়ে একটা পাহাড়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। তারই উপরে পুবমুখো একটা উপাসনা-বেদী ছিল মহর্ষিদেবের প্রভাত উপাসনার জন্যে। ওই পুকুরের পশ্চিম পাড়েই ছিল কাচের মন্দির...। তার দক্ষিণে ছিল দোতলা বাড়ি। যেখানে গুরুদেবকে প্রথম দেখি। উত্তর-পশ্চিমে গোটা দুই-তিন ছাতিমগাছ ছিল। তারই নিচে ছিল মহর্ষিদেবের সান্ধ্য উপাসনার বেদী। একটি পাথর দিয়ে বাঁধানো বড় চাতালের উপর একটু উঁচু করা মর্মরবেদী— বেদীর পিছনে দাঁড় করানো ছিল বেদীর মাপে একটি প্রস্তর ফলক। তারই উপরের দিকটায় লেখা ছিল— তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল বেশ বড় টিনের রান্নাবাড়ি, খাওয়া-দাওয়া হত সেখানে।'

সুধীরঞ্জন দাশ তাঁর সময়ের শান্তিনিকেতনের বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন— 'দক্ষিণমুখো ছিল একতলা বাড়ি। তাতে ছিল তিনটি কামরা, একটিতে লাইব্রেরি, একটিতে বিজ্ঞানাগার এবং একটি ছিল অতিথির জন্য। তারই পুবের দিকে উত্তর দক্ষিণে টানা বারান্দাযুক্ত টালির চালাঘর, যেখানে আমরা থাকতাম।... প্রাক্কুটির নাম দিয়ে, বড় ইঁদারাটার উত্তরে ছিল একটি খড়ের ঘর, যেখানে দু'একজন মাস্টারমশায় থাকতেন। আর দু'একটি চালাঘর ছাড়া শান্তিনিকেতনে তখন আর কোনও বাড়িঘর ছিল না। বড় দোতলা বাড়ির দক্ষিণে শিউলিগাছের বীথি চলে গিয়েছিল সামনের ফটক পর্যন্ত। এই ফটকের দুই ধারের স্তম্ভের গায়ে মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা ছিল মহর্ষিদেবের ধর্মমতের কতকগুলি সারমর্মকথা। ফটকের উত্তরে ছিল বৃত্তাকারে একটি মাধবী ফুলের লতানে গাছ, যার নিচে বসত অঙ্কের ক্লাস। তারই পুবে ছিল আম্রকুঞ্জ...। একসার শালগাছ ছিল আশ্রমের দক্ষিণ সীমানা— তারই গায়ে ছিল লাল কাঁকরের রাস্তা "দেহলি" থেকে লাইব্রেরি বাড়ি পর্যন্ত।...

'আমি যখন প্রথম আসি তখন মোহিতবাবু— মোহিতচন্দ্র সেন ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ। ...আমার

যাওয়ার কিছুদিন পূর্বেই সতীশচন্দ্র রায় মারা যান [১৯০৪ সালে]। জগদানন্দবাবু ...আশ্রমের দক্ষিণ গেটের বাইরে একটি খড়ের ঘরে থাকতেন তাঁর ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে। ...সুন্দর বেহালা বাজাতেন জগদানন্দবাবু। ...গুরুদেবের মধ্যম জামাতা [সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য] আশ্রমে থাকতেন। তিনি বিকেলের দিকে আমাদের শরীরতত্ত্ব পড়াতেন। খেলাধুলায় ছিল তাঁর খুব উৎসাহ। ...দিনুবাবুর [দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর] কথা কী বলব। ...তিনি আমাদের গান শেখাতেন, মাঝে ইংরাজিও পড়াতেন। ...

'আমি শান্তিনিকেতনে যাবার কিছু পরেই এলেন শাস্ত্রীমশায়— বিধুশেখর শাস্ত্রী। ...তিনি হরিবাবুর [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] সঙ্গেই প্রথমে থাকতেন। অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। স্বপাক খেতেন। ...বড় ছেলেদের সংস্কৃত পড়াতেন। আরও কিছুদিন পরে এসেছিলেন নগেন আইচ মহাশয়। তিনি এসেছিলেন ড্রইং মাস্টার হয়ে। ...নগেনবাবু আমাদের বাংলাও পড়াতেন। ...তিনি আমাদের নদী কবিতাটি মুখস্থ করিয়েছিলেন। জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে পড়েছি মনে পড়ে। ...

'আমার আশ্রমবাসের গোড়ায় আমরা একুনে পনেরো কি ষোলোটি বিদ্যার্থী সেখানে একত্রে বাস করতাম। ...গুরুদেবের ছোট ছেলে শমী [শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর] আমাদের সঙ্গে পড়তেন। শমী হুবহু গুরুদেবের মতো দেখতে ছিলেন। গানও করতেন চমৎকার। ...আমি যাবার দিন-দুই-তিন আগে এসেছিলেন একটি ছিপ্‌ছিপে রোগা ধবধবে রঙের ছেলে। তার নাম নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। শুনেছিলাম তাঁর বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়, মা ছিলেন ব্রহ্মদেশীয়। ...ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে দেবলদা কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় একবার অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে ছিলেন। ...বহু বৎসর পরে শান্তিনিকেতনে যখন প্রথম পোস্ট-আপিস খোলা হল, দেবলদা হয়ে পড়লেন পোস্টমাস্টার। ...

'একটি সাঁওতাল ছেলেকে মনে পড়ে— সে রোজ সন্ধ্যায় লণ্ঠনগুলিকে ঝেড়ে মুছে ঘরে ঘরে দিয়ে যেত। রান্নাঘরের ভাণ্ডারী বিপিন। ...ওর ছিল এক অ্যাসিস্ট্যান্ট, নামটা তার ভুলে গেছি। নুন জল লেবু পরিবেশন করত সে। স্পষ্ট মনে আছে, রোগা লম্বা সতীশ ঠাকুর আর মোটা চণ্ডী ঠাকুরকে। রাঁধত কিন্তু ভাল। ...প্রতি বুধবার আসত "সাবু" আর "হোরি আব্বাস"। সাবু ছিল ধোপা ...তার বাচ্চা গাধাটার 'পরে চড়েনি এমন ছেলে কমই ছিল। ...

'আর মনে আছে লিক্‌লিকে রোগা, দন্তহীন, গালে-টোলখাওয়া এক বৃদ্ধকে। সে খাটো ধুতির উপর চামড়ার কোমরবন্ধ পরে খালি গায়ে লাঠি হাতে বোলপুর আর শান্তিনিকেতন যাতায়াত করত দিনে দু'বার করে। সে ছিল আমাদের ডাকহরকরা। ...

'সে নাকি বীরভূমের নামকরা ডাকাত দলের সর্দার। ছেলেদের এবং মাস্টারমশায়দের বাড়ির চিঠি সেই সর্দার বোলপুর ডাকখানা থেকে নিয়ে আসত আর দিয়ে আসত। এখনও মনে পড়ে ছিপ্‌ছিপে, রোগা, বয়সের ভারে ঈষৎ অবনত বৃদ্ধ মানুষটি হেঁটে আসছে রাঙামাটির পথ বেয়ে— হাতে তার লম্বা লাঠি, কোমরে তার চামড়ার কোমরবন্ধ, কাঁধে তার ডাকের ঝুলি। আমরা অনেক সময় তাকে ধরে বসতাম, সর্দার, সেই হুঙ্কারটা একবার শুনিয়ে দাও-না। ... মনমেজাজ ভাল থাকলে সর্দার দাঁড়িয়ে পড়ত— মাথায় গামছাটি বেঁধে দুই হাতে বড় লাঠিটা ধরে বারকতক পাঁয়তারা কষে ও লাঠিটা বন্‌বন্ করে ঘুরিয়ে সে আচমকা ডাক ছাড়ত— "হারে রে রে রে রে"। শুনে আমাদের গায়ে দিত কাঁটা।'

সুধীরঞ্জন দাশ তাঁদের প্রতিদিনের ছাত্রজীবনের কার্যসূচির যে বিবরণ দিয়ে গেছেন, তারও কিছু উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তিনি জানাচ্ছেন— 'আমাদের দিন শুরু হত সূর্যোদয়ের পূর্বে, অতি প্রত্যুষে, যতদূর মনে আছে গ্রীষ্মকালে সাড়ে চারটেতে এবং শীতকালে পাঁচটা বাজলে'। ঘুম থেকে উঠে বিছানাটি ঝেড়ে গুছিয়ে রাখতে হত আর সেই সঙ্গেই নিচু গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতাম—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব

মঙ্গল্য বিঘ্নো ভবদাঞ্জযৈব
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রা মনুবর্তয়িষ্যে।

কেই বা লোকেশ এবং চৈতন্যময় অধিদেবতারই বা স্বরূপ কী—কে তখন তা জানত।... কিন্তু এটুকু ভূপেনবাবু [ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল] বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম নিয়ে দিনের কাজে লাগতে হয়।...

'অন্ধকার থাকতেই আমাদের প্রাতঃকৃত্য সেরে নিতে হত। তারপর পালা করে নিজেদের ঘরটি পরিপাটি করে ঝাঁট দিতে হত। তার পরে পড়ত স্নানের ঘণ্টা। গাবতলায় বড় কুয়োর ধারে, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক— ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হত। ...কেরসিনের টিনের মুখে কাঠের এড়ো শক্ত করে পেরেক দিয়ে আটকিয়ে তার মধ্যে দড়ি বেঁধে কোদো [ভৃত্য] কুয়ো থেকে জল তুলে বাঁধানো চৌবাচ্চাগুলি ভরে দিত এবং আমরা মগে করে জল তুলে গায়ে মাথায় দিতাম।... পরে আমরা যখন বড় হলাম তখন আমরা নিজেরাও জল তুলেছি কোদোর অনুকরণে।...

'স্নান সেরে যে যার পট্টবস্ত্র ও চাদর পরে নিতাম।... উপাসনার ঘণ্টা পড়লেই নিজ নিজ কম্বলাসনে পছন্দমত নির্জন জায়গায় পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য উপাসনায় বসতে হত। উপাসনার তাৎপর্য কিছু জানা ছিল না।... এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম যে শুদ্ধদেহে শান্ত চিত্তে ভগবানের নাম করতে হবে।... ঘণ্টা পড়লেই সবাই উঠে পড়ে আসনটি ঝেড়ে নিতাম— ঠিক তখনই দেখতাম যে দেহলির দিক থেকে গুরুদেব ধীর পদক্ষেপে হেঁটে আসছেন।... আমরা সারি দিয়ে দাঁড়াতাম এবং লাইনের সামনে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যুক্ত করে গুরুদেব প্রার্থনা করতেন, ওঁ পিতা নোহসি! পিতা নো বোধি! আমরাও তাঁর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমগ্র স্তোত্রটি উচ্চারণ করতাম।...

'সমবেত উপাসনার পর পট্টবস্ত্র ছেড়ে ধুতি কি পাজামা কি প্যান্ট, আর শার্ট কি পাঞ্জাবি এবং তার উপর গেরুয়া আলখাল্লা পরে নিতাম। তার পরেই পড়ত জলখাবারের ঘণ্টা। সকালবেলায় কোনওদিন পেতাম ভেজানো ছোলা কিংবা ভেজানো কাঁচা মুগের ডাল। এঁখো গুড় অথবা আদা নুন দিয়ে ছোলা বা কাঁচা মুগ মন্দ লাগত না খেতে। কোনওদিন বোঁদে, কোনওদিন জিবে গজা, কখনওবা মোহনভোগ। তারপর দুই হাতা দুধ। ...বিকেলে জলখাবারটা হত সকালের সঙ্গে মানিয়ে। অর্থাৎ সকালে মোহনভোগ হলে বিকেলে বোঁদে কি গজা, আর সকালে বোঁদে কি গজা হলে বিকেলে পেতাম মোহনভোগ। ...তবে মাঝে মাঝে লুচি ও একটা কিছু ভাজি পাওয়া যেত। ...তারপর যেতে হত পড়ার ক্লাসে। ...শান্তিনিকেতনে ক্লাসঘরে টেবিল চেয়ারের বালাই ছিল না। ...আশ্রমের এক-একটি নির্জন স্থানে পল্লবিত তরুছায়ায় মাস্টারমশায়কে ঘিরে নিজ নিজ কম্বলাসনে বটুবিদ্যার্থী আমরা বসতাম বইখাতাপত্র নিয়ে— সেই ছিল আমাদের ক্লাস। ...ভগবৎ কৃপায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল গুরুদেবের কাছে পড়বার।... ছোট ছোট ছেলেদের তিনি পড়াবার ভারও নিতেন, ছোটদের পাঠ্যপুস্তকও রচনা করতেন। "ইংরাজি সোপান" বলে দু-তিন খণ্ড ইংরেজি ভাষাশিক্ষার বই তিনি লিখেছিলেন। মুখে মুখে আমরা তাঁর কাছ থেকে ইংরেজি শিখতাম। তাঁর নির্দেশমত হরিবাবু [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] লিখেছিলেন "সংস্কৃতপ্রবেশ"। ...গুরুদেব কখনও পড়াতেন ইংরেজি কখনও বাংলা।...

'সাড়ে দশটা কি এগারোটার সময় সকালের ক্লাস শেষ হয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা আসত। তখনকার দিনের ছেলেদের জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে আমরা প্রত্যেকে নিজের থালা বাটি গেলাস নিয়ে সার বেঁধে খাবারঘরের দিকে রওনা দিতাম। গুরুদেব মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে বসে খেতেন।... মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় পাওয়া যেত গরম ভাত এবং চায়ের চামচের দু'চামচ ঘি। ডাল হত বেশির ভাগ অড়হর, মাঝে মাঝে মুসুরি এবং কদাচিৎ মুগ। তার সঙ্গে দিত পাতলা পাতলা আলু ভাজা কিংবা ঢেঁড়স ভাজা ও কদাচিৎ পটল ভাজা। বর্ষার দিনে যখন আলু বেশি পাওয়া যেত না তখন কুচি কুচি কচু ভাজাও খেয়েছি। একটা কুমড়োর ঘ্যাঁট এবং শেষে

বেশ কড়া করে সাঁৎলানো আলুর ঝোল। তাতে মাঝে মাঝে পটলও পড়ত। ঝোলটা ছিল খুব মুখরোচক।... এই সঙ্গে রাত্রের খাবারের তালিকাটা দিয়ে ফেলি। ভাত কি হাতরুটি যার যেমন রুচি। রুটিতে একটু ঘি মাখানো থাকত। ডাল হত অড়হর কি ছোলা। তার সঙ্গে পাওয়া যেত নরম করে আলু পেঁয়াজ ভাজা নয়ত আলু-পোস্ত। মাঝে মাঝে আলুর বদলে ছোট ছোট দিশি পেঁয়াজ দিয়ে পোস্ত। তারপর সেই আলু-পটলের ঝোল। দ্বিতীয়বার করে ডাল আর ঝোল পরিবেশনের রীতি ছিল দু'বেলাই। রাত্রে দুই হাতা করে দুধ বরাদ্দ ছিল প্রত্যেকের। আহারান্তে নিজের থালা বাটি গেলাস মেজে তুলে রাখতে হত। ...দুপুরের খাওয়া শেষ হলে পালা করে অতিথি-সেবায় লাগতাম। ...খাবার পর দিবানিদ্রার রেওয়াজ ছিল না। যে যার নিজের তক্তপোষে, গুটিয়ে-তোলা বিছানায় ঠেসান দিয়ে বিকেলের পড়াটা ঝালিয়ে নিতাম।...

'বিকেলে আবার ঘণ্টা-দুই ক্লাস হত। এই সময়ে বেশির ভাগ হত জগদানন্দবাবুর ল্যাবরেটরি ঘরে গিয়ে বিজ্ঞানচর্চা। ...সত্যবাবু [সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য] পড়াতেন ফিজিওলজি।...

'এখানে আর একটা কথা মনে পড়ছে, তার উল্লেখ করি। বর্ষার দিনে কালো মেঘে অম্বর মেদুর হয়ে যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামত তখন আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে মাস্টারমশায়দের একজনের সঙ্গে বের হয়ে পড়তাম বৃষ্টির ধারায় ভিজে শরীরটা জুড়াতে। বৃষ্টির জল তখন মাঠের থেকে খোয়াইয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর নানা ছোট ছোট ধারায় এগিয়ে গিয়ে পরস্পর মিলে মিশে মোটা ধারা হয়ে ছুটেছে কোপাইয়ের দিকে। বানের টানে ভেসে যেতাম কত কেয়াঝোপের পাশ দিয়ে, কত কাশফুলে ঢাকা উঁচু পাড়ের তলা দিয়ে। ...আশ্রমে ফিরেই কাপড় ছেড়ে আমাদের খেতে হত গরম আদার চা।...

'বিকেলে ক্লাস শেষ হলে জলযোগ সেরে ছুটতাম সকলে খেলার মাঠে।... কোনও কোনও ছেলে বাগান করত। একটু-একটু জমি এক-একজনকে বিলি করা হত। কেউবা করত অড়হর ডাল, কেউবা করত চিনে বাদামের চাষ, আবার কেউবা লাগাত ঢেঁড়স।...

'আগেই বলেছি আমাদের প্রত্যেকের একটি করে কাঠের কাজের হাতিয়ার-ভরা বাক্স ছিল। একজন জাপানি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর কাছে আমরা ছুতোরের কাজ খানিকটা শিখেছিলাম। নিজেদের জন্যে ডেস্ক, শেল্‌ফ্‌ ও ছোট আল্‌না চলনসই রকম তৈরি করে নিতে শিখে গেলাম।...

'এক-একদিন পালা করে মাস্টারমশায়রা গল্প বলতেন। অজিতবাবু, সত্যবাবু এবং জগদানন্দবাবুর গল্পের আসর ভর্তি থাকত।... জগদানন্দবাবুর গল্পের তুলনা ছিল না— যেমন তাঁর বলার ভঙ্গি, তেমনই চিত্তাকর্ষক তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। ...পরে আমাদের সেই ছেলেবেলায় এক ধূমকেতু বেরোল— নাম তার শুনলাম হেলি কমেট [১৯১০]— কী প্রকাণ্ড তার লেজ। সে নাকি পঁচাত্তর বছর পর একবার করে আসে।... ঠিক এই সময়টার কিছু পূর্বে গুরুদেবের অনুরাগী বন্ধু ত্রিপুরাধিপতি বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্যে একটা মস্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র অনেকগুলি গ্রহনক্ষত্রের চার্ট দিয়েছিলেন। তন্ন তন্ন করে সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা... গ্রহনক্ষত্রের কোথায় কী আছে... সব দেখে নিতাম। জগদানন্দবাবু আমাদের এ বিষয়ে যে-সব গল্প বলতেন সেগুলিই পরে ছেপে বের হল 'গ্রহনক্ষত্র' নাম নিয়ে। ...মাঝে মাঝে গুরুদেব নিজেও গল্প বলতেন। তিনি খুব মনোরম করে গল্প বলতে পারতেন।...

'মাঝে মাঝে অভিনয় হত। খুব ছোট বয়সে হত "মুকুট"। একটু বড় হলে আমরা করতাম হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের এক-একটা নক্‌সা।...

'অভ্যাগত অতিথিদের সেবার কাজেও আমাদের লাগতে হত। পৌষ-উৎসবের সময় এক-একজন ছেলে এক-এক ঘরের অভ্যাগতদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন পালা করে। অতিথিদের বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এখানে ওখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া— এই ছিল ছাত্রদের কর্তব্য।...

'আমাদের এক-এক ঘরে এক-একজন ছেলে এক-এক সপ্তাহের জন্যে ক্যাপটেন বা দলপতি নির্বাচিত হতেন। ...তাঁর ক্ষমতা যেমন ছিল তাঁর কর্তব্যও ছিল অল্প নয়। ঠিক সময়ে ছেলেরা ঘুম থেকে উঠলেন কি না, ভাল করে ঘর ঝাঁট পড়ল কি না, বিছানাগুলি পরিষ্কার করে গুটানো হল কি

না,— এ সবই ছিল তাঁর দায়িত্ব। তারপর সার বেঁধে ছেলেদের নিয়ে যাওয়া খাবার ঘরে কি মন্দিরে— এও ছিল তাঁর কাজ। ...

'আর এক ছিল বুধবারে বুধবারে সাবু (ধোপা) যখন আসত— ধোপাবাড়ির কাপড় মিলিয়ে নেওয়া, কাপড় ধুতে দেওয়া। আশ্রমের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করলে কিংবা অন্য ছেলের উপরে কোনও অন্যায় ব্যবহার করলে অভিযুক্ত আসামীকে হাজির হতে হত বিচারসভায়। সে সভায় বিচারপতি হয়ে বসতেন ওই ক্যাপটেন। পরে যখন আরও ছেলে বেড়ে গেল এবং আরও ঘর তৈরি হল তখন সকল ঘরের ক্যাপটেনরা মিলে এই বিচারসভায় বসতেন। তাঁরা বিচার করে যা রায় দিতেন সেটা গ্রাহ্য করতেই হত। ...আমাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন এইরকম করে ভালভাবেই চলত। ...

'মাস্টারমশায়দের মধ্যেও এক-একজন এক-একসময়ে সর্বাধ্যক্ষ হতেন। ...নিজেরাই একজনকে সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচন করতেন। ...অধ্যাপকসভা ছিল— সেখানে মাস্টারমশায়রা বসে ছেলেদের কল্যাণকর বিষয়গুলির আলোচনা করতেন। গুরুদেব অনেক সময় অধ্যাপকসভায় নানা নতুন প্রস্তাব করে আলোচনা ধরিয়ে দিতেন এবং মাস্টারমশায়দের মতামত জেনে নিতেন। ...

'প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা হত। মন্দিরে প্রবেশ দরজার উপরকার লোহার খিলানের মাঝখান থেকে একটি বড় ঘণ্টা সেকালে ঝুলত। উপাসনার মিনিট-পাঁচেক আগে থাকতে গুরুদেব সেই ঘণ্টাটি বাজিয়ে সকলকে উপাসনায় ডাকতেন। ...গান গেয়ে উপাসনা আরম্ভ হত। ভিন্ন ভিন্ন বুধবারে ভিন্ন গান হত। কখনও হত পুরানো গান, কখনও হত গুরুদেবের সদ্যরচিত ব্রহ্মসংগীত। ... গানের পরে গুরুদেব উপাসনার প্রারম্ভে সুললিত স্বরে মন্ত্র পাঠ করতেন। ...

'গুরুদেব এক-এক বুধবারে উপনিষদের এক-একটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করতেন ও শেষে উপদেশ দিতেন। ...গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে ক্ষিতিমোহন সেন মশায় [১৯০৮ সালের পর] মন্দিরে উপাসনা করাতেন। ...মন্দিরের মধ্যে ফুলের সুবাস, ধূপের পবিত্র গন্ধ, বেদ-উপনিষদের মন্ত্রের বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য এবং ব্রহ্মসংগীতের আনন্দ-হিল্লোলিত ঝংকার একত্রে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব স্বর্গলোক সৃষ্টি করত।'

সুধীরঞ্জন দাশ আরও জানিয়েছেন— 'প্রায় দুই বছর আশ্রমবাস সাঙ্গ হলে আবার গ্রীষ্মের ছুটি এল। ...আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। ...ফলে সে বছর ছুটির পর আমার আর আশ্রমে ফেরা হল না। ...১৩১৫ [১৯০৭/ ০৮] সালের পূজার ছুটির শেষে ফিরে গেলাম ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। আমার বয়স তখন সবে চৌদ্দ। ...

'আশ্রমে ফিরে নানা রকমের পরিবর্তন লক্ষ করলাম। ছাত্রসংখ্যা কিছু বেড়েছে। প্রাক্‌কুটিরে জায়গার সংকুলান হয় না, তারই পুব দেওয়ালের গা থেকে টানা লাইনে নূতন ঘর তৈরি হয়ে গেছে। পুবের অংশটার মেঝের কতকটা এক ফুট কি দেড় ফুট উঁচু করে রাখা হয়েছিল। ...

'৭ই পৌষের দিন-তিনেক আগে থাকতেই লোকসমাগম শুরু হল। কত দূর গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে পসরা বোঝাই করে কত দোকানী-পসারী আসতে লাগল। ...কী বিরাট জনসমাগম। ৭ই পৌষের মেলা এই অঞ্চলের লোকদের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। ...কবির লড়াই বা যাত্রাগান শুনে শেষ রাত্রে সবাই সেই আসরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। ...সাঁওতাল নরনারীর নৃত্য চলত মৃদঙ্গের তালে তালে রাত-দুপুর পেরিয়ে। ...

'মন্দিরে সন্ধ্যার সময় উপাসনা করলেন গুরুদেব নিজে। মন্দিরের সমস্ত ঝাড়গুলিতে মোমবাতি জ্বালানো হল এবং তার আলো কাঁচের মধ্যে তারার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ...

'রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট ছোট দল বেঁধে এক-একজন মাস্টারমশায়দের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা বাজি দেখতে গেল। ...অনেক রাতে প্রাক্‌কুটিরে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়া গেল। সারা দিন ভলান্টিয়ারি করে এবং রাত্রে বাজি পোড়ানো দেখে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ল ঘুমে।'

বিনোদন পর্ব

বিকেলে খেলাধুলার পর হাত-পা ধুয়ে ছাত্ররা জড়ো হতেন সে যুগের লাইব্রেরির বারান্দায়, বিনোদনচর্চায়। অধ্যাপকেরা যোগ দিতেন ছাত্রদের সঙ্গে। এ সময়টিকে বলা হত 'বিনোদন পর্ব'। 'পর্ব' শব্দটি গুরুদেব প্রবর্তন করেন ইংরেজি Period শব্দটির পরিবর্তে। দৈনিক ক্লাসের ৪৫ মিনিট সময়কে First Period, Second Period প্রভৃতি না বলে, পরিবর্তে প্রবর্তিত হল প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব প্রভৃতি শব্দগুলি। এই কারণেই সন্ধ্যায় বিনোদনের সময়কে গুরুদেব বললেন, বিনোদন পর্ব। প্রথম থেকেই সংগীত ও অভিনয়াদি বিনোদনের নানা বিষয়কে গুরুদেব পড়ালেখার ক্লাসের মতো সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন।

বিনোদন পর্ব বিষয়ে জগদানন্দ রায় লিখেছেন— 'সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে এবং অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তকপাঠ, গল্প ও নানারকম খেলা করিতেন। ...প্রত্যেক দিনই তিনি কি প্রকারে নূতন নূতন বিষয় লইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, আমরা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। আজকাল যাহাকে Sense Training বলা হয়, গুরুদেব আমাদের বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রথম তাহার সূত্রপাত করেন। ...লাইব্রেরি ঘরে ছেলেরা হেঁয়ালি নাট্যের অভিনয় করিত। তাহার ব্যবস্থাও গুরুদেবকে করিতে হইত। ...নূতন গান হইলেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের সন্ধ্যাসভায় তাহা গীত হইত। কেহই বঞ্চিত হইত না।'

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— 'উপাসনার পর লাইব্রেরির বারান্দায় আমরা একত্র হতুম। বাবা যখন উপস্থিত থাকতেন— কখনও গান, কখনও গল্প, কখনও খেলাধূলা করে ছাত্রদের বিনোদন করতেন।'

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— 'সন্ধ্যা উপাসনার পরে ছেলেদের চিত্তবিনোদনার্থে কবি বিনোদন পর্ব প্রবর্তিত করেছিলেন। প্রাক্‌কুটিরের উত্তর দেওয়ালের জানালার নিকটে একটি ছোট টেবিল-হারমোনিয়ম ছিল। কবি সন্ধ্যায় ওইখানে আসিয়া হারমোনিয়মের সুরের সহিত বালকগণকে লইয়া গান করিতেন। শিশুরা দুইপাশে দাঁড়াইয়া কবির সুরে সুর মিলাইয়া গান গাহিত।'

সে যুগের এক ছাত্র জানাচ্ছেন— 'সন্ধ্যাবেলায় আমাদের কোনও কাজ থাকিত না এবং বিনোদনের জন্য নানারকমের আয়োজনও ছিল। যথা হেঁয়ালি নাট্য, তর্কসভা, গান, গল্প, sense training, তারা-পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। মোহিতবাবু [মোহিতচন্দ্র সেন] আসিবার পর আমাদের সান্ধ্যসভা আরও জমিয়া উঠিল। তিনি Victor Hugo, Tolstoy প্রভৃতি বড় বড় লেখকের গল্প হইতে আমাদের উপযোগী করিয়া গল্প বলিতেন। অধ্যাপক সুবোধ মজুমদার, জগদানন্দবাবু ও সত্যবাবুর কাছে আমরা অনেক গল্প শুনিতাম।'

১৯০৭ থেকে ১৯১১ সালের একজন ছাত্র লিখেছেন— 'সন্ধ্যার পর বিনোদন সভায় সত্যবাবু, জগদানন্দবাবু, অজিতবাবু [অজিতকুমার চক্রবর্তী] গল্প বলিতেন— সংগীত, আবৃত্তি ও অভিনয় হইত। কোনও কোনও দিন আমাদের মধ্যে দুই দলে ভাগ হইয়া একটি বিশেষ প্লট খাড়া করিয়া হেঁয়ালি নাট্য রচনা করা হইত এবং সর্বসমক্ষে অভিনয় করা হইত। চট্ করিয়া চোখে দেখিয়া একটা জিনিসের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বলা, হাতে অনুভব করিয়া কোনও জিনিসের ওজন বলা, অনেকগুলো জিনিস এক পলকের মধ্যে দেখিয়া কতগুলি এবং কি কি দেখিয়াছি তাহা বলা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করানো হইত।'

পূর্ণিমার রাত্রে বিশেষভাবে গান বাজনা আবৃত্তি ও অভিনয় যে হত তার কথাও সে যুগের ছাত্ররা বলে গেছেন।

১৯১৩-১৪ সালে পিয়ার্সন সাহেব শান্তিনিকেতনে থাকাকালে ছাত্রদের জীবনচর্চা দেখে লিখেছিলেন— 'রাত্রিতে খাবার আগেকার এক ঘণ্টা হল বিনোদন পর্ব। এই পর্বে কখনও আবার ছেলেরাই কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।...

'সন্ধ্যাবেলার বিনোদন পর্বে ঘরোয়া পরিবেশে তিনি [গুরুদেব] যখন নিজের রচনা পাঠ করেন তখনই তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। অভিনয়ের সময় ছেলেদের তিনি যে শুধু অভিনয় করাই শেখান তা নয়, তাঁর নিজের রচিত গান কি করে গাইতে হয়, তাও শিখিয়ে দেন।'

১৯১৯ সাল পর্যন্ত যে বিনোদন পর্বের কাজ ভালভাবে চলেছিল, তখনকার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। যেমন, 'গুরুদেব এখন প্রায় দিনই সন্ধ্যাবেলায় ছেলেদের ঘরে আসিয়া তাঁদের সঙ্গে নিত্যনূতন খেলা করেন। ভোরবেলা যায় তাঁর ক্লাসে পড়াইতে, দুপুর যায় "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় লেখা লিখিয়া এবং ক্লাসে পড়াইয়া। সন্ধ্যাবেলা যায় ছেলেদের সঙ্গে গল্প ও খেলা করিয়া।' এইভাবে বিনোদন পর্বটি প্রথম থেকেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার কার্যসূচিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল।

স্বতন্ত্রভাবে অভিনয় ও গানের প্রাধান্য ছিল অত্যধিক, শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিবেশে। জগদানন্দ রায় জানাচ্ছেন— 'বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে দুই-তিন বৎসর ১লা বৈশাখে যে-উৎসব হইত, তাহার কথা আজও ভুলি নাই। ... বেশ মনে পড়ে লাইব্রেরির বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন এবং পাশের ঘরে জলযোগের আয়োজন হইতেছিল। গুরুদেব "আমারে করো তোমার বীণা" গানটি গাহিলেন। ...তারপর যখন রাত্রি চারিটার সময় মন্দির হইতে মৃদঙ্গের শব্দ এবং রাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাতী রাগিণীর সুর কানে আসিত, তখন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতাম। ...

'সতীশবাবুর [সতীশচন্দ্র রায়] আয়োজনে Midsummer Night's Dream-এর যে-অভিনয় হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট মনে পড়ে। ইহার রিহার্সল হইত উত্তরায়ণের পশ্চিমের খোয়াইয়ের ভিতর। ...

'ইহার অনেক দিন পরের [১৯০৮] একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরির উপরকার দোতালা খড়ের ঘরে [বল্লভী] থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে সেখানে কিছুকাল থাকিতে হইয়াছিল। হয়ত ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ওই ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নূতন নূতন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। ...

'সন্ধ্যার পরে সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেইসব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ "শারদোৎসব" নাটক [১৯০৮]। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন সন্ধ্যায় "শারদোৎসব" পড়িয়া শুনাইলেন।'

১৯০২ সালে অভিনীত প্রথমবার 'বিসর্জন' নাটকের কথা স্মরণ করে রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'এনট্রান্স পরীক্ষা তখন নিকটবর্তী তবু নিয়মিত আমাদের মহড়া চলল। আমাদের অধ্যাপকেরা আতঙ্কিত হয়ে বাবার কাছে দরবার করলেন যে অভিনয়ের পরিকল্পনা যদি অগৌণে বাতিল না করা হয় তা হলে পরীক্ষা পাস করার আশা সুদূর পরাহত। বাবা কিন্তু এঁদের কথায় কান দিলেন না। মহড়া চলতে লাগলো আগের মতো। ...

' "শারদোৎসব" অভিনয় যখন প্রথম হল [১৯০৮], আশ্রমের চেহারা অনেকখানি পাল্টে গেছে। ...অভিনয়ের জন্য লোক বাছাবাছির ব্যাপারে বাবা খুব সতর্ক ছিলেন...। তাঁর ইচ্ছাক্রমেই তখনকার দিনে অভিনয়ের মহড়া হত খোলা জায়গায়— তিনি চাইতেন আশ্রমবাসী সবাই এসে দেখুক, শুনুক, শিখুক। আশ্রমের শিক্ষার এও একটি অঙ্গবিশেষ। এইভাবে শিল্পকলার বোধ, সংগীতের চর্চা প্রভৃতি ধীরে ধীরে আশ্রমের জীবনে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছে। শিক্ষকরূপে এইখানেই বাবার কৃতিত্ব। তখনকার দিনে গানের জন্য কোনও আলাদা ক্লাস ছিল না। কিন্তু আশ্রমের প্রায় সকলেই গাইতে পারত। গান ছিল আবহাওয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত। ...

'শারদোৎসবের সাফল্য বাবাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। ফলে অল্প দিনের মধ্যে পর পর "প্রায়শ্চিত্ত" [১৯০৯], "রাজা" [১৯১১] ও "অচলায়তন" [১৯১৪] রচিত ও শান্তিনিকেতনে

অভিনীত হয়। বিদ্যালয়ের এক-একটি পর্বের শেষে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেন বিদ্যালয়ের কৃত্য হয়ে ওঠে।'

তখনকার শান্তিনিকেতন : সার্বিক জীবনযাত্রা

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দশকের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে আরও কয়েকজন তাঁদের সে সময়ের সার্বিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গেছেন, এবারে তাকে একত্রিত করে সাজিয়ে দিচ্ছি।

ছাত্রদের প্রতিদিনের কর্মজীবন আরম্ভ হত অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে freehand ব্যায়াম করে, নিজেদের বিছানা গুছিয়ে, ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ, পরে নিকটবর্তী বাঁধে গিয়ে স্নান ও সাঁতার শেখা। কিংবা কুয়োতে গিয়ে নিজে জল তুলে স্নান করা। ছোটদের জন্য জল বড়দের তুলে দিতে হত। ছাত্ররা প্রথমে রান্নাঘর থেকে জলখাবার নিয়ে অধ্যাপকদের ঘরে দিয়ে এসে, তারপর তারা নিজেরা খেতে যেত। চারবেলা রান্নাঘরে খেতে যাবার সময় ছাত্ররা নিজেদের থালা-বাটি-গ্লাস সঙ্গে করে নিয়ে যেত এবং খাওয়ার পর আবার তা নিয়ে আসত। প্রতিবারই ব্যবহারের পর নিজেরাই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখত। নিজেদের জামাকাপড় কাচত নিজেরাই। প্রতি সপ্তাহে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে রান্নাঘরের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে হাটবাজার করা, খাদ্যের তালিকা করা, খাবার সময়ে সকলকে পরিবেশন করা এবং খাবার ঘর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নিত। ছাত্রসম্মিলনী ও বিচারসভা গঠন করে ছাত্ররা নিজেদের কর্মসূচি ও নিয়মাবলী রচনা করত। ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম পালন বা কর্মে অবহেলা দেখলে বিচারসভায় তা নিয়ে আলোচনার পর তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা হত। ফুটবল, ক্রিকেট, কুস্তি, যুযুৎসু, কপাটি, ধাপসা, লাঠিখেলা চর্চা করত ছাত্ররা। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রায় এক মাস আগে থেকে চলত তার প্রস্তুতি। ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ, ঘানি চালিয়ে তেল বার করা, কাঁসার কাজ, মাটির পুতুল তৈরির শিক্ষা দেওয়া হত। মাটির বাড়ি তৈরি, মাটি কেটে ডোবা বোজানো, রাস্তা তৈরি করার কাজও ছাত্ররা করেছে। প্রতি ছাত্রাবাসের সংলগ্ন জমিতে ফুলের বাগান তৈরি করতে হত ছাত্রদের। তা নিয়ে প্রতিযোগিতাও হয়েছে। নানাপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হত ছাত্রদের। প্রতি বৎসর ৭ই পৌষের উৎসবের কয়েকদিন আগে থেকে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ রেখে শান্তিনিকেতনের যাবতীয় রাস্তা, প্রাঙ্গণ, মাঠঘাটের আবর্জনা ছাত্ররা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করত। বিদ্যালয়ের অতিথি অভ্যাগতদের পরিচর্যায় পূর্ণ দায়িত্ব পড়ত ছাত্রদের উপর। বনভোজন, শিক্ষামূলক ভ্রমণের দায়িত্ব এরাই নিত। প্রথম যখন বিদ্যালয়ে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয় তখন ছাত্ররা যাতে নিয়মিত তার সবরকম কাজ শেখবার সুবিধা পায় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। 'অভয়ব্রতী' নাম নিয়ে অধ্যাপক ও ছাত্ররা দল ভাগ করে নিকটবর্তী গ্রামে নিয়মিত গিয়ে নৈশবিদ্যালয় গঠন করে নিরক্ষরদের পড়াত। পীড়িতদের মধ্যে ওষুধ বিতরণ করত, ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে শিক্ষামূলক ছবি দেখাত, ভাঙা ঘর মেরামত করা এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইতিহাসের গল্প শোনাত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে প্রভাতফেরির দল গঠন করে ছাত্র ও অধ্যাপকরা নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে গুরুদেবের স্বদেশি গান গেয়ে দেশাত্মবোধ জাগাবার চেষ্টাও করেছেন।

সাঁওতাল গ্রামে ছাত্র ও অধ্যাপকদের কর্মপ্রচেষ্টা

যুগের দ্বিতীয় দশকের ছাত্ররা নিকটবর্তী একটি সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে, তাদের মধ্যে কীভাবে কাজ করত, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে আছে— 'রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সহিত পরিচিত হইতে বলেন। কারণ এই গ্রামবাসিদিগের সকল সমস্যা জানার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে প্রকৃত শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরাজি ১৯১০ সালে কতিপয় ছাত্র ও অধ্যাপক সাঁওতাল গ্রামে কার্যারম্ভ করেন...। আশ্রমের তৎকালীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ এই সময় তাঁহাদের যোগাইতেন উৎসাহ ও প্রেরণা। ....এই সময় আকস্মিক এক বিদেশি বন্ধুর সাহায্য মিলিল। ...এই বিদেশি বন্ধু হইতেছেন ....উইলিয়ম পিয়ার্সন। ইংরাজি ১৯১৪ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি প্রতিদিন বৈকালে এই গ্রামে আসিতেন ও তাহাদের অসুখে-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন।....

'সেই সময়ে আশ্রমের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় সাঁওতালদিগের মধ্যে যে বালকটি লেখাপড়া শিখিল তাহার নাম শ্রীশুক্লা মারাণ্ডী। শান্তিনিকেতনের ছাত্রগণ তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া কলিকাতা হইতে বই বাঁধাইবার কার্য শিখাইয়া আনিল। সে বর্তমানে তাহার জীবিকা অর্জন করিতেছে এবং নানাবিধ সংস্কারের কার্যে প্রধান সহায়ক হইয়াছে।'

উক্ত বিবরণেই রয়েছে— 'বছরে একবার 'আনন্দবাজার' নামে নানাবিধ জিনিসের দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের দোকান এবং বিনোদনের নানারূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করত ছাত্ররা।'

১৩২৬/১৯২০ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত সংবাদে আছে— কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয় 'কারখানা-ঘর প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। কারখানা ঘরের মধ্যে দরজির কাজ, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ চলিতেছে। দুইটা ঘানিতে সম্প্রতি সরিষার তেল করা আরম্ভ হইয়াছে। .... ছাত্ররা কেহ কেহ বই বাঁধানোর কাজ শিখিতেছে।'

বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রচলিত বিষয়

পূর্বোক্ত চৈত্র মাসের সংবাদ থেকে আরও জানা যায় —'বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার বিষয় হিসেবে বাংলা ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সংস্কৃত, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি প্রভৃতি সবই ক্লাসে পড়ানো হত। ক্লাসেই অধ্যাপকরা ছাত্রদের পড়ালেখা শেষ করিয়ে দিতেন। ...গুরুদেব অধ্যাপকদের বলতেন, ক্লাসে এমনভাবে পড়ানো হবে যাতে কোনও ছাত্রকে আর ঘরে গিয়ে পড়তে না হয়।'

সে যুগের একজন ছাত্র লিখেছেন— 'পড়ার সময় যেটুকু নির্দিষ্ট ছিল তাহা আমাদিগকে কখনও পীড়িত করে নাই।'

আর একজন জানাচ্ছেন— 'আমাদের সময়ে ছেলেদের ক্লাসের পড়া ক্লাসেই অধ্যাপক মহাশয়গণ করাইয়া লইতেন— বাড়িতে পড়া মুখস্থ করার রীতি ছিল না।'

ক্লাসে শ্রেণী বিভাগ তুলে দিয়ে গুরুদেব ছাত্রদের পড়ানোর একটি নতুন প্রথার চলন করেছিলেন। অর্থাৎ, যে-ছাত্র যে-বিষয়ে যতখানি অগ্রসর বা জ্ঞান লাভ করেছে তাকে তদনুযায়ী ক্লাসে বসে পড়ালেখা করতে দেওয়া হত। ৭/৮ বছরের বালক শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়ে ইংরেজি ভাষার শিক্ষা প্রথম শুরু করল প্রথম বর্ষের ছাত্রদের সঙ্গে। কিন্তু বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে তার জ্ঞান ইংরেজি ভাষা অপেক্ষা অধিক থাকায় বেশি বয়সের ছাত্রদের ক্লাসে যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে পড়ত। প্রথম যুগে বাৎসরিক পরীক্ষার চলন ছিল না। প্রতি ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট

সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে গুরুদেব চেষ্টা করতেন। তিনি মনে করতেন ছাত্রসংখ্যা অধিক হলে ঠিকমত পড়ানো সম্ভব হয় না। অধ্যাপকদেরও ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে না।

বিদ্যালয়ে গুরুদেব-প্রবর্তিত ভাষাশিক্ষার বৈশিষ্ট্য

বিদ্যালয়ের প্রথম ৮/১০ বছর গুরুদেব ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কখনও কখনও পালা করে এক-একটি ছাত্রাবাসে থেকেওছেন। নিজে ক্লাসে গিয়ে, কীভাবে ভাল পড়ানো যায় তা নিজে পড়িয়ে বুঝিয়ে দিতেন অধ্যাপকদের। একজন ছাত্র এ বিষয়ে বলেছেন —গুরুদেবের 'সর্বদা দৃষ্টি থাকিত আমরা যাহাতে ভাষাশিক্ষা করিতে পারি অথচ সাহিত্য-রস হইতে বঞ্চিত না হই। তিনি আমাদিগকে Walt Whitman, Keats, Wordsworth, Emerson ও Lamb প্রভৃতির কবিতা ও গদ্য পড়াইয়াছিলেন। এইগুলিকে তিনি আমাদের ধারণার অগম্য বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই।' গুরুদেব-প্রবর্তিত ভাষাশিক্ষার বিবরণ দিয়ে আরও লিখেছেন— 'ইংরাজি বা সংস্কৃত কোনও নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত না। ....আমরা মুখে মুখে অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে সরল সংস্কৃত এবং ইংরাজি বাক্য রচনা. শিক্ষা করিতাম এবং তাহাই আবার আমাদের খাতায় তুলিয়া রাখিতাম। ... মুখে মুখে অনেক সময় ইংরাজি কবিতার বাংলা অনুবাদ টুকরা টুকরাভাবে করিয়া শিক্ষকগণ আমাদিগকে তাহা পুনরায় ইংরাজি পদ্যে তর্জমা করিতে আদেশ করিতেন। এমনি করিয়া আমরা আমাদের অত্যন্ত অল্প বয়সে ইংরাজি সাহিত্যের অনেক সরস ও প্রসিদ্ধ কবিতা শিখিয়াছিলাম।'

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পড়ানোর বিষয়ে আর একজন বলেছেন— 'আমাদের কাছে একটা ইংরাজি গল্প পড়িতেন এবং বুঝিতে পারি কিনা দেখিতেন। যে যে জায়গায় বুঝিতাম না, সেখানে অর্থ বলিয়া দিতেন, তাহার পর সেটি আমাদের ইংরাজিতে লিখিতে হইত কিংবা বাংলা ক্লাসে বাংলায় লিখিতে হইত।'

গল্পচ্ছলে বিজ্ঞানের নানা বিষয় পড়াতেন জগদানন্দ রায়। তিন ইঞ্চির একটি টেলিস্কোপ ছিল তাঁর সঙ্গী। রাত হলেই বসে বসে নানা গ্রহনক্ষত্র দেখতেন, ছাত্রদের ডেকে এনে তা দেখাতেন।

ক্লাসের পড়ার বাইরে জ্ঞানচর্চার আরও এক প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন গুরুদেব। ছোট, মাঝারি ও বড় ছাত্রদের নিয়মিত সাহিত্যসভা, হাতে-লেখা পত্রিকা এবং তর্কসভা বা ডিবেটিং ক্লাস ছিল এর সহায়। এ সবের আয়োজন, পরিচালনা প্রভৃতির পূর্ণ দায়িত্ব থাকত ছেলেদের উপর। প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই এসব অনুষ্ঠিত হত। ছাত্ররা নিজেরাই সভা সাজাত, সভাপতি নির্বাচন করত, পাঠ ইত্যাদির কার্যসূচি স্থির করত। গুরুদেব নিজে বহুবার এইসব সভায় উপস্থিত থেকেছেন, সভাপতিত্ব করেছেন ছাত্রদের উৎসাহে এবং আগ্রহে। ছাত্ররাই পাঠক, শ্রোতা এবং সমালোচক। হাতে লেখা পত্রিকাগুলিতে ছাত্রদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্রকলা থাকত। কিন্তু গুরুদেব ও অধ্যাপকদের রচনা থেকেও পত্রিকাগুলি বঞ্চিত হত না।

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের আলোকে বিদ্যাচর্চা

দেশের প্রচলিত তখনকার বিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের পরিচয় লাভের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গুরুদেব এ দিকটির প্রতি খুবই সতর্ক ছিলেন। ভিন্ন প্রথায় এর চর্চার বা শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করলেন বিদ্যালয়ে। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের মর্ম বালকদের পক্ষে গ্রহণ করা কখনই সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই মহৎ জ্ঞান বা চিন্তাকে স্বীকার করার শিক্ষা তাঁরা তখনই গ্রহণ করতেন, বিদ্যালয়ে

সকাল ও সন্ধ্যায় চুপ করে কিছুক্ষণ ধ্যানে বসে থাকার পর ছাত্ররা সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে সমবেত কণ্ঠে বৈদিক শ্লোক আবৃত্তি করতেন। শ্লোকগুলির ভাবার্থ বাংলায় ছাত্রদের বলে দিতেন গুরুদেব নিজে অথবা অধ্যাপকরা। বুধবার এবং বছরের কতকগুলি বিশেষ দিনে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে, একসঙ্গে মন্দিরে বসে গুরুদেব মন্ত্রোচ্চারণ, তার ব্যাখ্যা এবং উপদেশের দ্বারা উপাসনা করতেন। মহাপুরুষদের জন্মদিনের এবং মৃতজনের স্মরণের উপাসনায় নানারূপ উপযোগী মন্ত্র আবৃত্তিসহ আলোচনা করতেন গুরুদেব ও অন্য অধ্যাপকরা। এইসব উপাসনায় ছাত্ররা ভারতীয় নানারূপ উচ্চচিন্তার কথা শুনেছে, মন্ত্রোচ্চারণ করেছে এবং উপযোগী গানের পর গানও গেয়েছে। সর্বদাই এসবের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ছাত্রদের পক্ষে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান, গুরুদেবের বক্তৃতা বা গুরুদেবের পূজা পর্যায়ের গানগুলির প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তবুও তারা এটুকু বাল্যবয়সেই বুঝত যে, এর মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে শ্রদ্ধা করতে হয়। এইভাবে পরিপূর্ণ জীবনবোধের চর্চায় মন্দিরের উপাসনা ছিল ছাত্রদের পক্ষে এক ধরনের ক্লাসের মতো। এইরূপ ব্যবস্থা বিংশ শতকের অন্য কোনও সরকারি বা বেসরকারি বিদ্যালয়ে কেউ দেখেননি।

মন্দিরে নিয়মিত উপাসনাকে গুরুদেব কতখানি মর্যাদা দিতেন বোঝা যাবে নিম্নোক্ত ঘটনাটি থেকে। ১৯৪০-এ গুরুদেব অসুস্থ থাকায় বুধবারের সকালে মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিতে পারতেন না। ডাক্তারদের বিশেষ নিষেধ ছিল। সে সময়ে মন্দিরের উপাসনায় আচার্যের কাজ করতেন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। বিশ্বভারতীর একদল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং কিছু তরুণ অধ্যাপক মন্দিরের উপাসনায় যোগদান করা ওই সময়ে বন্ধ করে দেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, এ যুগে এসবের প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। সংবাদটি গুরুদেবের কানে পৌঁছলে তিনি খুবই বিচলিত হয়েছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর বুধবারে মন্দিরের উপাসনা শুরু হল। কিন্তু কলেজের বয়স্ক ছাত্রছাত্রী এবং কিছু তরুণ অধ্যাপক পূর্বের ন্যায় উপাসনায় যোগদানে বিরত থাকেন। ২৪ জুলাই ১৯৪০ ছিল বুধবার। আমি উপাসনা আরম্ভ হবার বেশ কিছু আগে গিয়ে এস্রাজের সুর বেঁধে নিচ্ছিলাম। গানের ছাত্রছাত্রীদের উপাসনার গান গাওয়ানোর দায়িত্ব ছিল আমার। হঠাৎ দেখি গুরুদেবের গাড়ি মন্দিরের পশ্চিম দুয়ারের কাছে এসে থামল। গুরুদেব ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, চাদর গলায় ঝুলিয়ে ভিতরে বসে আছেন। আমি এস্রাজটি নামিয়ে রেখে দ্রুত গুরুদেবের দিকে যখন এগিয়ে যাচ্ছি, তখন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে আমাকে বললেন, গুরুদেব আজ কারও কথাই শুনলেন না। মন্দিরে উপাসনা করবেন বলে জোর করেই চলে এসেছেন। কাউকে বলতে বারণ করেছেন। আমাকে গুরুদেবের কাছে থাকতে বলে তিনি দৌড়ে চলে গেলেন সকলকে খবর দিতে। কিছুটা দেরি ছিল বলে গুরুদেবকে গাড়ি থেকে নামতে বারণ করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর এইরূপ অসুস্থ শরীরে মন্দিরের উপাসনার জন্য কেন এলেন। তিনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন, তাঁর শক্তিতে যতদিন কুলোবে ততদিনই তিনি মন্দিরের উপাসনার দিন আসবেন। আমি উত্তরায়ণের শ্যামলী বাড়ির সামনে উপাসনার প্রস্তাব পেশ করি। তিনি কিছুতেই তা গ্রহণ করলেন না। ইতিমধ্যে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতীর বয়স্ক ছাত্রছাত্রী ও তরুণ অধ্যাপকদল আসতে লাগলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত যেমন আসে, তারা এসে গেল। গাড়ি থেকে গুরুদেবকে আমরা ক'জন ধরে নামিয়ে এনে, মন্দিরের পশ্চিমদিকের চৌকিটির উপরে তাঁকে বসিয়ে দিয়েছিলাম।

সেদিন গুরুদেব অত্যন্ত জোর দিয়ে যা বলেছিলেন তাকে বলা চলে যুগের প্রতি সতর্কবাণী। সেদিনে তাঁর ভাষণটি সংক্ষিপ্তাকারে 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থে বক্তৃতারূপে মুদ্রিত আছে। তাঁর সেদিনের মূল উপদেশ ছিল, শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমের শিক্ষার্থীদের ভারতের যুগান্তব্যাপী সাধনার অমৃত উৎসকে জানার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে। দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে তাকে বহন করে নিয়ে যাবার আনন্দিত উদ্যম তিনি এযুগে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি মনে করেন, যেন বর্তমানকালে

সব কিছুকেই সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন স্পর্ধা। এই শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধার দ্বারা, ভারতের চিরন্তন অমৃতের উৎসকে প্রত্যাখ্যান না করে, একে স্বীকার করে নিতে হবে।

আনন্দচর্চা

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে আনন্দচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল নাচ-গান অভিনয়ের। যার কথা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিভিন্নজনের স্মৃতিকথনে সে যুগের শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশ্রমে আনন্দচর্চার বিবরণ পাওয়া যায়। সেখান থেকে কিছু নির্বাচিত স্মৃতিকথন এখানে উদ্ধৃত করছি।

১৯১৩ সালের বর্ষার সময় সি এফ এন্ডরুজ প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। সে দিনের কথা স্মরণ করে এন্ডরুজ বলেছিলেন—'Each morning, we began very early. The choir [Vaitalik] were round sometimes even before 4-30 A.M. ...on the otherhand with Dinu Babu's [Dinendranath's] glorious voice and perfect memory of the poet's songs, the musical and dramatic sides were very well developed. In the evenings, there were abundant opportunities for drama—often made up on the spur of the moment; and the literary clubs were almost as numerious as the school classes. The youngest boys had their own Sahitya Sabha.

'When the Mohan Bagan came over, we had a holiday for the whole day...In the evening, after the match was over, we would have songs and dramatic performance.

'On every Purnima, if the weather was fine, we used to go out to some favourite spot in the country and take our evening meal there. Afterwards, we would spend the rest of the evening in the moonlight with all its entrancing beauty while we listened to songs and music.

'In the early afternoon, the boys would be busy with their rehearsing of the play they were going to perform, and the teachers took their parts along with the boys.'

ক্ষিতিমোহন সেন ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। সে যুগের বিদ্যালয়ের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন—'In the evening he [Rabindranath] would sit among them [students] and entertain them in various ways. He would extemporise stories, talks and poems for them, or would make them act dramas, read poems or essays. These informal gatherings...where both teachers and pupils gave free play to their creative expression, were most important element in the education of children. Towards the success of these educative entertainments the genious of the late Dinendranath Tagore and Ajit Kumar Chakravarty contributed not a little. Sometimes these soirees were arranged in some neighbouring Sal forest or on the undulating waste of the neighbouring Khoai land.'

উইলি পিয়ার্সন জানিয়েছেন— '...at the end of each term, arrangements are made for staging one of the poet's plays. The teachers and boys take different parts, and the play is staged in Santiniketan, visitors coming from Calcutta to see it, especially if the poet is himself taking part. The poet coaches the actors himself, first reading the

play aloud, and then reading it over with those who are to take part. During the days when the play is being rehearsed there are not many classes held, for the boys of the whole school are always present at the rehearsals. The final day is a busy one for the stage has to be prepared and there must be a dress rehearsal. To this the boys are not admitted, as it would take away the freshness of the play if they were able to see a too nearly perfect performance of it beforehand. But when it begins there is great enthusiasm amongst visitors and boys alike, as the songs and dance reveal the spirit of the play to the delighted audience. In this way the ideals of the poet are assimilated by the boys, without their having to make any conscious efforts. In fact they are being educated into the sub-conscious mind, and this is one of the main principles of Rabindranath Tagore's method of education. English plays are also sometimes given, as well as Sanskrit, and it is remarkable to see what histrionic powers the Bengali boys has, even when he has to act in a foreign tongue. When the play is in Bengali then they are in their element, and they seem to have such aptitude for acting that the smaller boys often get up plays of their own without any assistance from the master. At the beginning of 1916 there was a performance of the poet's new play 'A Spring Festival' in Calcutta, and a number of the younger boys, aged from eight to ten, took part in the chorus. They did not have to do any acting, but merely sang the songs and took part in the dances, so that they were practically in the position of spectators on the stage. After the play was over, these small boys surprised us by giving one evening a performance of the whole play, each boy taking one of the characters with such perfect mimicry of those who had taken part in Calcutta that the performance was irresistible. Every shade of humour and seriousness was reproduced to perfection by these pigmy actors.'

বিদ্যালয়ের আরম্ভকাল থেকেই গান ছিল এখানকার পূর্ণাঙ্গ জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। গুরুদেব এবং দিনেন্দ্রনাথের সাহায্যে এইসব অল্পবয়সী বালকেরা গুরুদেবের যাবতীয় গান গাইতে শিখত, কঠিন বা সহজ বলে বাছ-বিচার করা হত না। ছাত্ররাই ছিল এখানকার গানের অনুষ্ঠানগুলিতে গুরুদেবের প্রধান সহায়। বিনোদন পর্বে অভিনয়, মন্দিরে উপাসনা ও অন্যান্য সভাসমিতির জন্য বিচিত্র পর্যায়ের গান তারা শিখত। কিন্তু আনন্দ উপভোগের উপায়রূপে ছাত্ররা নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে তার ব্যবহার কীভাবে করত পিয়ার্সন তারও বিবরণ দিয়ে বলছেন—
'During the day I came to know others of the teachers, and listened to some of the boys singing, for the poet's songs occupy a large part of school-life.

'In the evening, as it was a moonlit night, we went out, boys and teachers as well, to a wood about a mile away from school. We sat in a circle under the trees and the boys sang.

'Occasionally excursions will be planned, either for the boys of the whole school, or for several days to some place of historical interest, in which case only a few selected boys will go accompanied by two or three of the teachers. In the former case we go to some place within easy reach of the ashram, and taking our food with us, cook it by the side of a river or under the trees in a wood. The whole day is spent in the air, and singing and games form the chief part of the programme.

'The boys are awakened before sunrise by the singing of one of the poet's songs

by a band of singers.

'The sound of the boys' voices, as they came back form their evening meal of their dormitories, had ceased when in the stillness there arose the sound of singing. It was a group of boys who, every evening before they retire to bed, sing one of the poet's songs. Gradually they approached the house where we were sitting, and as they turned away, the sound receded getting fainter and fainter until died out altogether.'

গুরুদেব নিজে বলেছেন— 'Songs are composed, not specially made to order for juvenile minds. They are songs that a poet writes for his own pleasure. In fact, most of my 'Gitanjali' songs were written here. These, when fresh in their first bloom are sung to the boys, and they came in crowds to learn them. They sing them in their leisure hours, sitting in groups, under the open sky on the moonlit nights, in the shadows of the impending rain in July.'

শান্তিনিকেতনের শেষবর্ষ, নববর্ষ, বুধবারের উপাসনা, ঋতু উৎসব, পূর্ণিমা উৎসব, ৭ই পৌষের উৎসবের উপাসনা, বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক অধিবেশন, ১১ই মাঘের উপাসনা, মহাপুরুষদের স্মরণসভা, গুণী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা প্রভৃতি বিচিত্র উৎসবানুষ্ঠানে সর্বদাই গেয়ে এসেছে ছাত্ররা। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির মাঘের উৎসবেও ছাত্রদের গান গাইতে নিয়ে গেছেন গুরুদেব। ১৯১৬ সালে কলকাতায় 'ফাল্গুনী'র যখন অভিনয় হল তার গানের জন্য একদল ছাত্রকে বেছে নিয়ে গিয়েছিলেন গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথ। 'ডাকঘর' নাটকের ছাত্রদের গান এবং অমলের ভূমিকায় যে-ছাত্রটি ছিল তার অভিনয় দেখে কলকাতার দর্শকেরা খুবই খুশি হয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ছাত্রদের গান শেখাতেন গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথ। কয়েকবছর পরে অজিত চক্রবর্তী অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন, গান শেখাবারও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হিন্দি উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের প্রথম দশক পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু গুরুদেবের মনে যে সে ইচ্ছা ছিল তা জানা যায় পরবর্তী একটি ঘটনা থেকে।

বৈতালিক দল গঠন

বাংলা ১৩১৮ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ফাল্গুন সংখ্যায় একটি সংবাদে আমরা জানতে পারি যে, গুরুদেব '৪ঠা ফাল্গুন আশ্রম হইতে বিদায় লইয়াছেন। আশ্রমে প্রাতঃ সন্ধ্যায় জাগরণকালে ও রাত্রে শয়নের পরে বিশ্রামকালে কয়েকটি গায়ক বালকদিগকে লইয়া একটি বৈতালিক দল তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। ...ইহাও একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হইয়াছে।' এই সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, দু'বেলা বৈতালিক গানের প্রথা এবারেই প্রথম প্রবর্তিত হল। এর পরে গুরুদেব গিয়েছিলেন ইংলন্ডে। সময়টি হল গুরুদেবের নোবেল পুরস্কারের যুগ। ইংলন্ডে বাসকালে শান্তিনিকেতনের অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে ছাত্রদের সাংগীতিক জীবনের সংবাদও তিনি নিতেন। এই সময়ে গানের সংবাদ দিয়ে অজিত চক্রবর্তী গুরুদেবকে লিখছেন— 'গান শেখানো এবং বৈতালিকদের প্রভাতে ও রাত্রে দুইবার আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া সংগীত বেশ চলিতেছে। ছেলেদের উৎসাহ ক্রমে জন্মিতেছে।' উত্তরে গুরুদেব তাঁকে লিখলেন —'আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধহয় কমে এসেছে, সেটা ঠিক হবে না ; ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহে ওটা একটা প্রধান

অঙ্গ। শান্তিনিকেতনের বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে, তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান। ...ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয়, কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যাবে। সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়। কিন্তু বেতন দিয়ে একজন গাইয়েকে যদি তোমরা জোগাড় করতে পার তো মন্দ হয় না।' এর উত্তরে অজিতবাবু জানিয়েছিলেন— 'গানশিক্ষা আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব তা বিদ্যালয়ে হচ্ছে, ভোরে এবং রাত্রে বৈতালিক দলও গান নিয়মিত করছে। তবে আমার শিক্ষার দ্বারা আর বেশি কিছু হয় না। বিদ্যালয়ের আর্থিক টানাটানি এত অধিক যে গায়ক নিযুক্ত করার কথা এখন উত্থাপন করাই শক্ত।' নতুন একজন গায়ক জোগাড় করবার কথার দ্বারা গুরুদেব রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষকের কথা বলেননি, তিনি চাইছিলেন হিন্দুস্থানি সংগীতের একজন শিক্ষক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রসঙ্গ

১৯১৬ সালে আমেরিকায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিষয়ে বক্তৃতাকালে, ছাত্রদের অভিনয়ের কথায় গুরুদেব বলেছিলেন — 'Those who have witnessed these boys playing their part in dramatic performances have been stuck with their wonderful power as actors. It is because they never directly trained in the histrionic art. They instinctively enter into spirit of the plays in which they take part, though these plays are not mere schoolboy dramas. They require subtle understanding and sympathy. With all the anxiety and hypercritical sensitiveness of an author about the performance of his own play, I have never been disappointed in my boys, and I have rarely allowed teachers to interfere with the boys' own representation of the characters. Very often they themselves write plays or improvise them and we are invited to their performance.'

কালীপদ রায়

১৯১০ সালের জুন মাসে নেপালচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে প্রথম যোগ দেন। তিনি সপরিবারে এসেছিলেন। তাঁর আট বছরের পুত্র কালীপদ রায়কে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। কালীপদ রায় এই আশ্রমে একটানা প্রায় নয় বছর পড়াশোনা করে তখনকার দিনের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯১৯ সালে। পরে তিনি কলেজে পড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় চলে যান। তিনি তাঁর এখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জীবনের বেশ কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই গ্রন্থটি থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি। তাঁর লিখিত বিবৃতি থেকেও জানা যায়, তখন বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছিল বিদ্যালয়ে অধ্যাপক সংখ্যাও। তখন ক্লাসের নীচের দিকে কোনও শ্রেণীবিভাগ ছিল না। কোনও সীমিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়ে শেষ করতে হবে এমন কোনও নিয়ম তখন ছিল না। যে-বিষয়ে যে যে ছাত্র পারদর্শিতার সঙ্গে অগ্রসর হত সব সময়ে তাকে আরও অগ্রসর হতে উৎসাহ দেওয়া হত। ফলে একই বছরে কোনও ছেলে হয়ত বিভিন্ন বর্গে পড়ত। যেমন, সে ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, বিজ্ঞান ও প্রকৃতি পরিচয়ে যে শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল, গণিতে ভর্তি হয়েছিল তার এক শ্রেণী উপরে, ইতিহাসে আরও উপরে।

তখন অনেকগুলি বর্গ ছিল। চতুর্থ বর্গ থেকে নীচের বর্গ। প্রয়োজনে বছরে ছ'মাস অন্তর প্রমোশনের ব্যবস্থা ছিল। ক্লাস 'এইট' পর্যন্ত গুরুদেবের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতিতে পড়ানো হত। তারপরের দু'বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্য বিষয় পড়িয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দেওয়া হত। এই দুটি বর্গের নাম ছিল যথাক্রমে, 'প্রিপারেটরি' ও 'ম্যাট্রিকুলেশন' ক্লাস। কোনও বর্গে ছয়-সাতটির বেশি ছাত্র ছিল না। বেশি হলে সেই ক্লাস ভাগ করা হত।

ছাত্রাবাসগুলির তিনটি ভাগ ছিল। আদ্য, মধ্য ও শিশুবিভাগ। প্রত্যেক ছাত্রাবাসে একজন করে গৃহাধ্যক্ষ এবং একজন তাঁর সহকারী থাকতেন।

ছেলেদের ছিল সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। বিচারসভা, আশ্রম-সম্মিলনী গঠন করে নিজেদের পরিচালনা নিজেরাই করত। খেলাধুলাসহ সব বিষয়ে একজন ছাত্র-সম্পাদক থাকত। প্রতিদিন দু'জন ছাত্র রান্নাঘরের ম্যানেজার হত। ছাত্ররা অতিথি পরিচর্যা করত। যেদিন যাদের উপর এ সবের দায়িত্ব পড়ত তাদের ক্লাসে যেতে হত না। কোনও ছাত্র নিয়ম ভঙ্গ করলে ছাত্রদের বিচারসভায় তার বিচার করে শাস্তি দেওয়া হত। জেনারেল বা ক্যাপ্টেন-এর ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদকেরও ক্ষমতা কম ছিল না।

প্রতিদিনের ক্লাস ছাড়াও মন্দিরে উপাসনা, অন্যান্য উৎসব, বৈতালিক গান, সন্ধ্যায় বিনোদন পর্ব, খেলাধুলা, অভিনয়, সাহিত্যসভা, হাতে-লেখা পত্রিকা প্রভৃতিতে তখনকার ছাত্রজীবন ছিল ঠাসা।

কালীপদ রায় আরও জানিয়েছেন, ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে গুরুদেব তাঁদের বাংলা এবং ইংরেজি কাব্য ও গদ্য পড়িয়েছেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিদ্যালয়ের যুগে নির্বাচন করা হত না। ১৯১২ সালের পূর্বে প্রমোশন প্রথা ছিল না। ওই সালে প্রথম তা প্রবর্তন করা হয়।

১৯১৩ সালে পুজোর ছুটির আগে দিনেন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাটকটির অভিনয় করান ছাত্র ও অধ্যাপকদের দিয়ে। প্রায় দু'মাস ধরে অভিনয়, গান ও নাচের মহড়া চলেছিল দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায়। গুরুদেবের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ আসার পর সাতদিন ধরে আশ্রমবাসীরা আনন্দানুষ্ঠানে মেতেছিলেন।

ছাত্রদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুবিধার্থে গুরুদেব প্রথমে ইংরেজিতে রচিত বিভিন্ন প্রকার ছোটগল্প, পত্রিকার নানা সংবাদ প্রভৃতির সংকলন করে ১৯১৮ সালে অনুবাদচর্চা নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বাংলাভাষায় সেগুলিকে অনুবাদ করে একই নামে আর একটি পুস্তিকাও ছাপিয়ে ছিলেন।

আমার শিক্ষা ও কর্মজীবন

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমটি প্রতিষ্ঠার পর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ যে-আদর্শে বা যে-পথে প্রথমে এটিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, পরের বছর গুরুদেব তার বেশ খানিকটা পরিবর্তন কীভাবে করলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রায় দেড় দশকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে আরও কতখানি পরিবর্তন হয়েছিল, সে বিষয়ে সেই সময়কার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যা জানিয়ে গিয়েছিলেন, প্রথম থেকেই সেগুলিকে পরপর সাজিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবনের পরিচিতিটিকে সঠিক তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এই কথা ভেবে যে, গুরুদেব যুগ ও সমাজকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিদ্যালয়কে গড়তে চাননি, এই কথাটি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টায়। তিনি নিজেই ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের বলে গিয়েছিলেন— 'প্রাচীন তপোবনের গুরুগৃহের শান্ত সমাহিত আদর্শটি প্রভাবিত করেছিল আশ্রমের প্রথম যুগের শিক্ষাপদ্ধতিকে। তারপর যুগের প্রয়োজনে ক্রমশ এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়ও মেনে নিতে হয়েছে যুগের

দাবিকে। ... সবকিছু সত্ত্বেও আমাদের মূল আদর্শটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। আমি চাই তোমরা সেই আদর্শটি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করো।'

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পূর্বে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে একটি চিঠিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা যেভাবে জানিয়েছিলেন তাতে প্রাচীনকালের তপোবনের শিক্ষাদর্শের প্রতি গুরুদেবের মনে যে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত। সেই পত্রখানির উল্লেখ আমি আগেই করেছি।

এ যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ কলকাতায় তপোবনের শিক্ষার আদর্শে একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে নিজেদের আগ্রহে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করেন। প্রথম যুগের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের জন্য কঠোর নিয়মকানুনে বাঁধা জীবনপ্রণালী রেবাচাঁদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ শান্তিনিকেতনের এই বিদ্যাশ্রমটির ছাত্রদের জুতা ও ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাদের নিরামিষ আহারকে করেছিলেন সার্বজনিক। আগেই বলেছি, ছাত্ররা হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ, জাতিভেদ যাতে মেনে চলেন তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। আগে এও জানিয়েছি, প্রতিদিন ক্লাসের সময় ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পরতে হত সাদা সিল্ক, কায়স্থদের লাল, আর বৈদ্য ও অন্যান্যদের পরতে হত হলদে রঙের সিল্ক এবং আহারাগারে ছিল ব্রাহ্মণদের ভিন্ন পঙ্‌ক্তি। তখনকার ছাত্রদের সারাদিনের নানাপ্রকার কর্মজালে জড়িত যে বিবরণ রেবাচাঁদ-লিখিত বিবৃতি থেকে পাওয়া যায়, তারও উল্লেখ পূর্বেই করেছি। কিন্তু রেবাচাঁদের বিবরণীতে প্রতি বুধবার এবং অন্যান্য বিশেষ দিনে মন্দিরে উপাসনার কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু জানা যায়, প্রাতে স্নানান্তে প্রতিদিন উপাসনা হত বিদ্যালয়ের একটি ঘরে। সেখানে শিক্ষক ও ছাত্ররা একত্রে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করত।

গুরুদেব এ যুগের কথা স্মরণ করে, একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন— 'ব্রহ্মবান্ধব তখন আমার সহায় ছিলেন। কোনও কালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়নি।' কিছু মতভেদের কারণেই ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদকে এক বছর পরেই শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে হয়। এ বিষয়ে জগদানন্দ রায় ও রথীন্দ্রনাথ সে কথা জানিয়ে গেছেন, তার উল্লেখ পূর্বে করেছি।

সে যুগে ভোরে ও রাত্রিতে বৈতালিক গান হত বলে জানা যায় না। সুধীরঞ্জন দাশ ১৯০৪ সালে যখন ছাত্র হিসেবে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন, তখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও বৈশ্য প্রভৃতি ছাত্রদের মধ্যে জাতিভেদজনিত, তিন রঙের সিল্কের কাপড় প্রভৃতি পরা উঠে গিয়েছিল। কিন্তু ক্লাসে যাবার আগে ছাত্রদের সকলকে একরঙা একটি জোব্বা যে পরতে হত তার কথা তিনি বলে গেছেন। এই সময়ের আরও কিছু ছাত্র, তাঁদের এখানকার জীবনযাত্রা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যা বলে গিয়েছেন তারও উল্লেখ আগে করেছি একথা ভেবে যে, আমি ১৯১৪ সালে যখন শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলাম তখনকার কথা আমার স্মৃতিতে যতটুকু এখনও জাগ্রত আছে তার সঙ্গে বিচারের সুবিধার্থে। এ যুগে যে-সব অধ্যাপক সপরিবারে শান্তিনিকেতনে থাকতেন, তাঁদের পুত্রকন্যা বা আত্মীয়-স্বজনরা অন্য ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রাবাসে থাকত না। তারা সকলে বাবা-মার সঙ্গেই থাকত। কিন্তু যথাসাধ্য ছাত্রাবাসের ছাত্রদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের চলতে হত। আমি বাবা-মার সঙ্গে বাড়িতে বাস করলেও সেই নিয়মকে যথাসাধ্য মেনেই চলেছি। সেই বয়সেই এখানকার নানাপ্রকার নান্দনিক বিকাশের কার্যসূচির সঙ্গে যেভাবে যুক্ত ছিলাম তার কথা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি বলে এখানে তার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আমার চার বছর বয়স থেকে প্রায় সতেরো আঠারো বছর পর্যন্ত লেখাপড়ার সঙ্গে আমার জীবন কীভাবে কেটেছে এবং পরে যখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তার সঙ্গে কোন পথে আমার জীবনকে আমি যুক্ত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং গুরুদেব আমাকে কোন্ পথে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং কতখানি কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, তাঁর সার্বিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আমার স্মৃতিচারণার এই অংশটির সমাপ্তি রেখা টানব।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি অল্পবয়সী শিশু থেকে মোট দশ পর্বে বিভক্ত ছিল। আমি যখন ভর্তি হয়েছি, তখন প্রথম পর্ব থেকে অষ্টম পর্ব পর্যন্ত গুরুদেবের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখাপড়া পরিচালিত হত। শেষের নয় ও দশ পর্বের পড়া চলত সরকার-প্রবর্তিত ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্যসূচি অনুযায়ী। প্রথমদিকের পড়াশোনা হত Direct Method বলতে যা আমরা বুঝি— ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা পড়ানো হত সেই পদ্ধতিতে।

গল্প বলার ছলে পড়ানো হত ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন প্রভৃতি। আমি যখন বিদ্যাশ্রমের পাঠ শুরু করি তখন 'ইংরেজি সোপান', 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' নামক গুরুদেব-রচিত গ্রন্থকটির মাধ্যমে আমাদের ভাষা শেখানোর চেষ্টা করা হত। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষারও একটি গ্রন্থ ছিল আমাদের জন্য। কিন্তু সেটির সাহায্যে কীভাবে আমাদের পড়ানো হত, তার কথা এখন আর মনে পড়ে না। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক একটি বেশ মোটা গ্রন্থ ছিল, তার থেকে ব্যাকরণের বিষয়গুলি হরিচরণবাবুর সাহায্যে বুঝে যে মুখস্থ করতে হত তার কথা মনে পড়ে। এই যুগে 'শ্লোক পুষ্পাঞ্জলি' নামে আর একটি গ্রন্থের কথা মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের ছোট ছাপাখানাটি বিশ্বভারতীতে প্রতিষ্ঠার পরে সেখান থেকেই তা ছাপা হয়েছিল। এটি ছিল পাতলা পনেরো ষোলো পৃষ্ঠার বই। পাতাগুলি নীল রঙের। তাতে অনেকগুলি চার থেকে আট পঙ্‌ক্তির সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত হয়। বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে সেই শ্লোকগুলি পড়ে মুখস্থ করতে হত। তারপরে শাস্ত্রীমহাশয় চেষ্টা করতেন আমাদের মুখ দিয়ে বাংলায় তার অর্থ বলাতে। এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত পঠনপাঠনে, আমাদের পক্ষে তার অর্থ বুঝে নিতে বিশেষ অসুবিধা হত না। বিদ্যাশ্রমের শিক্ষাগ্রহণের সময় যখন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় খানিকটা লিখতে শিখলাম, তখন থেকে একটি পর্বে যেটুকু ইংরেজি পড়ানো হত, তা খাতায় লিখতে হত। বাংলার ক্ষেত্রেও যে বই যতটুকু এক পর্বে পড়ানো হত, সেই অংশটিকে সংক্ষেপে খাতায় নিজের ভাষায় লিখে রাখতাম। ইতিহাস, ভূগোল, এমনকী কেমিস্ট্রি পর্যন্ত, গ্রন্থ থাকলেও, মাস্টারমশায়রা তা দেখে পড়াতেন না— পড়াতেন মুখে গল্প বলার ঢঙে। যেটুকু মাস্টারমশায়রা ক্লাসে বলতেন, ততটুকু নিজেদের খাতায় লিখে রাখতাম। খাতার লেখাগুলি মাস্টারমশায়রা দেখে সংশোধন করতেন। কোনও শব্দের বানান ভুল লিখলে, ভুল সংশোধনের জন্য সঠিক বানানটি খাতায় প্রায় পঞ্চাশবার লিখতে বলতেন।

গুরুদেব শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমে শিক্ষাপদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে অনুবাদ করার দ্বারা ভাষাশিক্ষাকে প্রাধান্য দিতেন। ১৯১৭ সালে 'অনুবাদচর্চা' নামে ইংরেজি অনুবাদের একটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন, যে-ক্লাসের ছাত্ররা ইংরেজি ভাষায় খানিকটা দক্ষতা লাভে সমর্থ হয়েছিল তাদেরই কথা ভেবে। ছোট ছোট নানাপ্রকার পূর্ণবাক্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে এই গ্রন্থে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ক্লাসে পূর্ণ বাক্যটি প্রথমে পড়ে শুনিয়ে তারপর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ধরে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মুখে মুখে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেবার চেষ্টা করা হত। গুরুদেব যখন নিজে পড়াতেন তখন তিনি প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে অনুবাদ করতে বলতেন। সে অসমর্থ হলে বা সঠিক অনুবাদ না করতে পারলে দ্বিতীয় জনকে বলতেন চেষ্টা করতে। এই পদ্ধতিতে ক্লাসের প্রায় সবক'টি শিক্ষার্থীর মনে সঠিক অনুবাদের আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত করবার চেষ্টা করতেন। শিক্ষার্থীরাও গুরুদেবের ক্লাসে এই কারণে মনঃসংযোগ হারাত না। একটা প্রতিযোগিতার মতো হারজিতের মনোভাব সকলের মনে জেগে উঠত। তাদের মনে নির্ভুল সঠিক অনুবাদের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করে গুরুদেব খুবই প্রীত হতেন। লক্ষণীয় বিষয় ছিল অনুবাদের ভালমন্দ বিচার করে কাউকে নিরুৎসাহ করতেন না।

বাংলা ভাষায় অনুরূপ পূর্ণবাক্য সংগ্রহ করে 'অনুবাদচর্চা' নামে আরও একটি গ্রন্থ একই সময়ে মুদ্রিত হয়, বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদে শিক্ষাপ্রদানের প্রয়োজনে। বাংলা ভাষার ক্লাসের সময় গদ্য ও পদ্য পাঠ যতটুকু হত, তাকেও খাতায় লিখতে হত। প্রতিটি খাতায় ত্রুটি সংশোধন করানো হত শিক্ষার্থীদেরই দ্বারা। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভালমন্দ বিচারের দ্বারা গুরুদেব কাউকে নিরুৎসাহ করতেন না। মাস্টরমশায়রাও এই পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতেন। তবু বলব, গুরুদেবের কাছে

ক্লাস করে যে আনন্দ পেতাম, সেইরূপ আনন্দ অন্য মাস্টারমশায়রা আমাদের মনে জাগাতে পারতেন না।

যখন সাত/আট বছরে পা দিয়েছি তখন শুনলাম গুরুদেব নাকি এই বিদ্যাশ্রমের আকারের পরিবর্তন বা বৃদ্ধি ঘটাবেন। সেটা যে ঠিক কোন পথে ঘটবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবার বয়স ও বুদ্ধি আমার তখন ছিল না। একদিন শোনা গেল, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হবে 'বিশ্বভারতী'। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে নানা বিষয়ের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ছাত্রছাত্রীরা যোগদানের অধিকার পাবেন এই বিশ্বভারতীতে। কেবল আমাদের মতো অল্পবয়সী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্বভারতী নয়। পরে যখন বয়স বেশ খানিকটা বেড়েছে, তখন জেনেছিলাম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামের বিদ্যালয়টিকে এই বিশ্বভারতীর একটি অংশ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল, দুই ভাগে বিভক্ত করে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়টির ছাত্রদের প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় নিজেদের ইচ্ছামত গাছের তলায় বা প্রাঙ্গণে আসন বিছিয়ে মিনিট দশেক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হত এবং তা শেষ হয়ে গেলে একত্রে নির্দিষ্ট স্থানে এসে সমবেতকণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে হত সে কথা আগেও বলেছি। কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল তার প্রকৃত কারণ আমি তখন বুঝতে পারতাম না। এখানে পড়তে হলে এই নিয়মটি যে অবশ্য পালনীয়, তখন এইটুকুই কেবল বুঝতে শিখেছিলাম। এ ছাড়া প্রতি বুধবার সকালে, বর্ষশেষ ও নববর্ষের দিন, ১১ই মাঘের উৎসব, ৭ই পৌষের উৎসবসহ আরও কয়েকটি বিশেষ দিনে এখানকার মন্দিরে যে উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল, সবেতেই অল্পবয়সী শিক্ষার্থীদেরও যোগদান করা ছিল আবশ্যিক। এইসব উপাসনার সময় গুরুদেব মন্দিরের আচার্যরূপে যা বলতেন, তা তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দুই খণ্ডে মুদ্রিত, কিন্তু সেই বয়সে তার একবর্ণও আমাদের মাথায় ঢুকত না। দিনুবাবুর নেতৃত্বে গুরুদেব-রচিত পূজা পর্যায়ের গান হত। গানের দলের সঙ্গে যখন তা গাইতাম, তখন তার প্রকৃত মর্মার্থ বোঝবার বোধ যে সেই বয়সে আমার ছিল না, সে কথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি। গুরুদেব আমাদের অবস্থা সবই বুঝতেন। কিন্তু তার জন্যে আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধির ছাত্রছাত্রীদের ধ্যানে বসা এবং মন্দিরের উপাসনা থেকে মুক্তি দিতে কেন চাইতেন না,— সে বিষয়ে গুরুদেব নিজে একটি চিঠিতে লিখেছেন— 'এখানকার শিশুশিক্ষার আর একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোট ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড় মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে, সবচেয়ে বড় যে আদর্শ মানুষের আছে— তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকাল সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনও বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে আর কিছু না হোক একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোট ছেলেরা একটি বড় জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।' এখানকার কাচের মন্দিরে উপাসনার সময়েও আমাদের মতো বালখিল্যদের যোগদান করা কেন যে আবশ্যিক বলে গুরুদেব মনে করতেন, উপরের চিঠিটি থেকে সে কথা বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের উপাসনাও ছিল আমাদের মতো বালকদের শিক্ষাজীবনের একটি প্রাথমিক ক্লাসের মতো।

পুনরায় ফিরে যাচ্ছি 'বিশ্বভারতী' নামে এখানকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বৃদ্ধির কথা গুরুদেব কেন ভেবেছিলেন, তার কথায়। ১৯১৬ সালের মে মাস থেকে ১৯১৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত গুরুদেব জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, সে দেশে কতকগুলি বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণে। সে দেশে বাসকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বিস্তার কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছেন, তখন তাঁর মনে বিদ্যালয়ের বিস্তারের ছবি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তার কথা তখনকার একটি চিঠিতে পরিষ্কার করে তিনি জানিয়েছিলেন। গুরুদেব লিখেছেন— 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের

যোগসূত্র করে তুলতে হবে। স্বজাতির সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে— ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন International Co-operation যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ওই বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ওই জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলবে— এই আমার মনে আছে —সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ওইখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।'

জাপান ও আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের তখনকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর স্থাপনানুষ্ঠান প্রথম কীভাবে এবং কোথায় হয়েছিল তার কথা পূর্বেই বলেছি।

বিশ্বভারতীতে বয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয় ১৯১৯ সাল থেকে।

সে সময়ে বিশ্বভারতীর উচ্চশিক্ষা বিভাগের পড়াশোনার সূত্রপাত যেভাবে হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক জানতে হলে আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের শিক্ষাপদ্ধতি কী প্রকার ছিল তার আলোচনা প্রথমে করবার প্রয়োজন আছে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি অনেকগুলি বৌদ্ধযুগের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক বিবরণ। সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণে নিযুক্ত হত উপনিষদের যুগের ধর্মপ্রাণ শিক্ষার্থীরা। বুদ্ধদেব যখন ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার পরীক্ষার্থীদের জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠু নিয়মের দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে 'বিনয় পিঠক' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়। বুদ্ধদেব ও তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক স্বর্গগত প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁর একটি গ্রন্থে আমাদের অবগতির জন্য যে-তথ্য রেখে গেছেন, তাতে তিনি জানাচ্ছেন— 'ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের বিধিগুলির উপরই বৌদ্ধ-বিনয়-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য পালন করা, সত্যকথা বলা, অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করা উভয় ধর্মেরই মূলসূত্র। নির্দিষ্ট সময়ে লব্ধ ভিক্ষায় দেহ পোষণ করা, সকল প্রাণীর উপর সমদৃষ্টি, অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণায় সময় অতিবাহিত করে মুক্তি কামনা, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক উভয়েরই লক্ষ্য। ....ভিক্ষু হচ্ছে মুক্তিকামী বা মুক্ত। নিজের গুরু ব্যতীত আর কোনও ব্যক্তির আদেশ তাকে মানতে হয় না।'

আরও জানা যায় যে, তপোবনের শিক্ষাধারার সঙ্গে যুক্ত ব্রহ্মচারিগণ যেভাবে তাঁদের গুরুর সঙ্গ করে, গুরু ও তাঁর পরিবারের সেবা যত্নের দ্বারা নিজেদের জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা মেটাতেন, বৌদ্ধযুগের নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী প্রভৃতির মতো বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিক্ষু ছাত্রদের মধ্যেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। গুরু যেমন শিষ্যদের জীবনের ভালমন্দের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাদের পরিচালিত করতেন, শিষ্যরাও তাঁদের আচার্যের সেবাযত্ন করতেন, গুরুকে পিতার মতো শ্রদ্ধা-ভক্তির মন নিয়ে।

বৌদ্ধ যুগের আচার্যরা যুগে যুগে ভারতবর্ষের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশে শিষ্যদলসহ যেতেন, তখন তাঁরা তাঁদের সঙ্গে কেবল ধর্মীয় পুথিই নিয়ে যেতেন না, নৃত্যগীত অভিনয়ের চর্চায় পারদর্শী শিষ্যদেরও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যেতেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহায় হিসাবে। ভারতবর্ষে অজন্তার মতো দেওয়ালচিত্রে পারদর্শী শিষ্যরাও গুরুদের সঙ্গে যেতেন সেখানকার গুহাগুলিকে বুদ্ধের জীবন-সম্পৃক্ত নানাপ্রকার মূর্তি দেওয়ালচিত্র ও অলঙ্করণ শিল্পের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম ও চিন্তায় সেখানকার জনগণের মনকে সর্বদাই আধ্যাত্মিক আনন্দরসে মগ্ন রাখার আকাঙ্ক্ষায়।

বৌদ্ধ ভিক্ষুছাত্ররা বড় বড় বিহারে এসে কেবল ধর্মানুশীলন বা ধর্মচর্চায় জীবন কাটাতেন না, তার সঙ্গে তাঁদের চর্চা করতে হত, তাঁদের প্রতিদিনের জীবনচর্যার বিচিত্র বিষয়ের ! এই কারণে প্রতিটি বিহারে ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও দর্শনের চর্চায় প্রাধান্য থাকলেও তার সঙ্গে জড়িয়েছিল বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিদ্যা। সবক'টি বিদ্যার উপযুক্ত আচার্যকেও নিয়োগ করা হত ওইসব বিহারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীরা আসত দেশ-দেশান্তর থেকে দলে দলে। তারা নিজেদের ইচ্ছামত শিক্ষাগ্রহণের কারণে গুরু নির্বাচন করে, তাঁর পরিচর্যায় তাঁদের কাছে বিদ্যাগ্রহণে নিযুক্ত থাকত। এক

সঙ্গে একাধিক বিদ্যার চর্চার প্রয়োজনে একাধিক অধ্যাপককে গুরু হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করত। কিন্তু শিষ্যরা তাঁদের প্রতিদিনের যাবতীয় জীবনচর্যার কাজও নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। এ যুগের মতো সিলেবাস রচনা করে ধাপে ধাপে উচ্চশিক্ষার শেষে পৌঁছে দেবার মতো কোনও কার্যসূচি ছিল বলে জানা যায় না। সে যুগে যে-কোনও শিক্ষণীয় বিদ্যার শেষ আছে বলে গুরুরা বা তাঁদের শিষ্যরা মনে করতেন না। অনেকে একটানা বহু বছরের চেষ্টায় নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাকে আহরণ করতেন। আবার অনেকে নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যা আহরণে সমর্থ হলে বিহার ত্যাগের অনুমতি পেতেন।

খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে আরবদের অভিযানের ফলে ভারতের নানা স্থানের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি যখন সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ এবং লুপ্তপ্রায় হল, তখন দেখা গেল হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানা তীর্থস্থানে হিন্দুধর্মের শিক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় 'টোল' ও উচ্চস্তরের ভাষা, ধর্ম ও দর্শন শিক্ষার জন্য 'চতুষ্পাঠী' নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। বড় বড় গ্রামেও এইরূপ দুই স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানেও ছাত্রদের নানা অঞ্চল থেকে এসে নিজেদের ইচ্ছামত শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করে নির্বাচিত গুরুর কাছে তাঁদের শিক্ষাগ্রহণ করতেন। এ শিক্ষার ধারা হল গুরুমুখী শিক্ষা। তপোবনের যুগ থেকে বৌদ্ধযুগের শেষ অবধি এ ধারা ছিল অব্যাহত। এখনও তা আছে নানা তীর্থস্থানে। গুরুদেব যখন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সঙ্গে উচ্চস্তরের নানাপ্রকার ভারতীয় বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন, উপনিষদের যুগ থেকে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মধর্ম ও বানপ্রস্থের পদ্ধতি এবং বৌদ্ধযুগের 'নালন্দা' প্রভৃতি বিখ্যাত বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বিশ্বভারতীর উচ্চশিক্ষাকে নানা ভাষা ও নানা বিদ্যার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ১৯২০/২১ সালে গুরুদেব বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে যখন দেশে ফিরলেন, তখন তিনি বিশ্বভারতীর উচ্চশিক্ষাকে তপোবন ও বৌদ্ধবিহারের আদর্শে বিভিন্ন বিদ্যার খ্যাতনামা আচার্যদের সংগ্রহ করে এনে প্রাচীন ধারানুযায়ী গুরুমুখী বিদ্যার শিক্ষাধারাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নিজের দেশের প্রাচীন মহতী বিদ্যার নানা শাখাকে একত্র করে বিদেশের বিদ্যার সঙ্গে সমন্বয় করবার পথ দেখিয়েছিলেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর দ্বারা রচিত 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' সংস্কৃত বাক্যটিকে বিশ্বভারতীর মুখ্য মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, বিশ্বভারতীর মূল আদর্শের কথা চিন্তা করে।

১৯২১ সালে একটি অধিবেশন ডেকে বিশ্বভারতীকে আইনকানুন দ্বারা বিধিবদ্ধ করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২২ সালে তাকে সরকারি আইনানুযায়ী রেজিস্ট্রি করা হয়। কিন্তু রেজিস্ট্রি করবার আগে যেভাবে বিশ্বভারতীকে রূপ দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা গুরুদেবকে না-জানিয়ে করা হয়েছিল বলে শোনা যায়। কারণ সে যুগে যে-কমিটির উপর সংবিধানটি রচনার দায়িত্ব পড়েছিল, তাঁরা গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ না করেই যে তা রচনা করেছিলেন, তা জানা যায় তখনকার বিশ্বভারতীর কর্মসচিব (Registrar) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা গুরুদেবের এক চিঠি থেকে। গুরুদেব তাঁকে জানাচ্ছেন— 'রথী, বিশ্বভারতীর বিদ্যায়তনের শিক্ষা প্রভৃতির যে আদর্শ খাড়া করা হয়েছে সে সম্বন্ধে অনেক তর্কের বিষয় আছে। আর একবার সকলে বসে না আলোচনা করলে চলবে না। যে কথা বলে আমি ভারতবর্ষের লোককে বিশেষভাবে আপিল করেছি, সে হচ্ছে বিশ্বভারতীর বিদ্যার সমবায়। এখানে বৈদিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পারসি প্রভৃতি সকল বিদ্যায় একটা সমন্বয় ক্ষেত্র হবে। তোদের আদর্শের মধ্যে তার কোনও পরিচয় নেই।'

এই চিঠির পর সেই সময়ের কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিবর্তন কিছু করেছিলেন কি না তার সঠিক বিবরণ আমি পাইনি। কিন্তু গুরুদেব ওই যুগে যখন গুজরাত, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলেন, তখন সেখানকার পোরবন্দর থেকে তাঁর পরিকল্পনামত বিশ্বভারতী বিষয়ে যা জানিয়েছিলেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই চিঠিটি বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখলেও মূলত এই চিঠির দ্বারা তাঁর পরিকল্পনার কথা শান্তিনিকেতনের সকলেই যাতে জানতে পারেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন। চিঠিতে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখেছিলেন—

ওঁ

পোরবন্দর

'প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন—

প্রথমে কাজের কথা :—

উত্তর বিভাগে এখন যে সব ছাত্র আছে বিশ্বভারতীর জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলতে হবে, সেজন্য তাদের দুই বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকা থেকে তাদের দুই বা দুয়ের অধিক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে হবে :—

	বৈদিক সংস্কৃত সংস্কৃত সাহিত্য পালি আবেস্তা	আয়ুর্বেদ প্রাচীন হিন্দি সাহিত্য	ক্ষিতিমোহনবাবু
তালিকা আমার আন্দাজ মত করে দিলুম। আপনারা বিচার করে পরিবর্ধন পরিবর্তন করে মনের মত তালিকা তৈরি করে নেবেন	প্রাকৃত ভারতের পুরাতত্ত্ব বাংলা (বাংলার বাহিরের ছাত্রদের জন্য)	তিব্বতীয় চিনীয় ফারসী (যদি অধ্যাপক জোটে) আরবি সাধারণ হিন্দি ও	
	ফরাসী জর্মন (যখন জর্মন পণ্ডিত পাওয়া যাবে) শব্দতত্ত্ব (Collins এর কাছে)	হিন্দুস্থানি দ্রাবিড়ীয় ভাষা য়ুরোপীয় ইতিহাস (নেপালবাবু)	
	য়ুরোপীয় দর্শন (সরোজবাবুর কাছে)	ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত ইত্যাদি	
	ইংরেজি সাহিত্য (এখনও পড়াবার লোক পাওয়া যায়নি, অমিয় অনায়াসে এই ভার নিতে পারেন কিন্তু তাঁর কাছে কেউ পড়তে চায় না)		

দুই বৎসর পরে পরীক্ষার পর অথবা অধ্যাপকের মতে যে ছাত্র উপযুক্ত গণ্য হবে তাদের নেওয়া যাবে।

নারী বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। এই বিভাগের ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষভাবে করা কর্তব্য। আমাদের সামর্থ্যমত এদের ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত ভাষায় যথোচিত পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে। যাতে আমাদের আশ্রমে নারীদের শিক্ষার উপযুক্ত বিদ্যালয় ভাল করে গড়ে ওঠে তার বিশেষ চেষ্টা করা চাই। এই নারীবিভাগের ছাত্রীরা কালক্রমে কেহ কেহ বিশ্বভারতীতে স্থান অধিকার করতে পারবে।

বিশ্বভারতীর কলাবিভাগ ও কারুবিভাগের নিয়ম স্বতন্ত্র।

অধ্যাপকদের প্রধান কর্তব্য হবে ছাত্রদের বিশ্বভারতীর জন্য তৈরি করে তোলা। আচার্যদের প্রধান কর্তব্য হবে তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বপ্রচার। বিশ্বভারতীর উপযুক্ত ছাত্রদের মধ্যেও কাউকে কাউকে

কোনো কোনো বিষয়ে গোড়ার দিক থেকে শেখানো দরকার হবে। কেউ হয়ত য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু সংস্কৃত জানেন না বা অল্প জানেন, এঁদের খেয়া পার করবার ভার অধ্যাপকদের উপর। বলা আবশ্যক, বিশেষ প্রয়োজনস্থলে বা স্বেচ্ছাক্রমে আচার্যেরাই এই ভার গ্রহণ করতে পারবেন।

আপাতত নূতন অধ্যাপক ও আচার্য নিয়োগের সামর্থ্য আমাদের বেশি নেই। কেবল আমার ইচ্ছা কালিদাস নাগকে আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়— তাঁর কাছ থেকে অনেক বিষয়েই আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করি। এ ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক দরকার হবে। চেষ্টা করে দেখব যদি এদিক থেকে কাউকে পাওয়া যায়। আপাতত যাঁরা আচার্য ও অধ্যাপক আছেন বা শীঘ্র হতে পারেন তাঁদের নাম দিচ্চি—

আমার স্মৃতি-শক্তির ক্রটিবশত কিছু ভুল থাকতে পারে সংশোধন করে নেবেন ;

আচার্য —
- বিধুশেখর শাস্ত্রী
- ক্ষিতিমোহন সেন
- কলিন্‌স্
- কালিদাস নাগ
- নন্দলাল বসু
- এল্‌ম্‌হর্স্ট

অধ্যাপক —
- নেপালচন্দ্র রায়
- বেনোয়া
- মিশ্রজি
- সাংখ্যতীর্থ

অধ্যাপক —
- ভীমরাও শাস্ত্রী
- সুরেন্দ্রনাথ কর
- সরোজ দাস

সন্তোষ, লাল
আর কে কে আছেন আপনারা
ভেবে স্থির করবেন।

বিশ্বভারতীর ছাত্র—

ফণীন্দ্র, গোস্বামী, অমিয়/ অনুজান— আর কারও নাম আমি জানি নে।

কলা ও কারুবিভাগের ও সুরুল বিভাগের ছাত্রদের নাম দেওয়া বাহুল্য। জর্মানি শিক্ষা দিবার জন্য আপনি যে ভ্রমণকারীকে কিছু দিনের জন্য সংগ্রহ করার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা উত্তম। আশা করি Winternitz-এর ছাত্রটিও যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিবেন। —ছাত্র গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে বর্তমান অধ্যাপকসমিতিকে ব্যবহার করিলে বোধকরি আপনাদের সংস্থিতির বিধিবিরুদ্ধ হইবে না।

সোনার মায়ামৃগের পিছনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়াচ্চি, কবে ছুটি পাব কে জানে? এখানকার মহারাজা চমৎকার লোকটি। তাঁর সঙ্গ লাভ করে খুসি হয়েচি। তিনি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন.....

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

নির্দেশনামা
বিশ্বভারতীর আদর্শ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিভাগ সাধারণ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুবর্তী নহে। এখানে কতকগুলি নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় ক্লাস করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

'যাঁহারা পাণ্ডিত্যে প্রবীণ ও জ্ঞানসাধনায় কালক্ষেপ করিতে প্রস্তুত তাঁহারা আচার্যরূপে বিশ্বভারতীতে আশ্রয়, অবকাশ ও আনুকূল্য পাইবেন ইহাই বিশ্বভারতীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

'যাঁহারা কোনও বিশেষ শাস্ত্রে যথোচিত অধিকারলাভ করিয়াছেন তাঁহারা জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে

বিশ্বভারতীতে ছাত্ররূপে যোগ দিতে পারিবেন।
'ছাত্রদিগকে যাঁহারা অধ্যাপনার দ্বারা সাহায্য করিবার যোগ্য সেই বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে গৃহীত হইবেন।
'যাঁহারা বিশ্বভারতীর সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া রচনার দ্বারা, ব্যাখ্যানের দ্বারা অর্থদান বা অর্থসংগ্রহের দ্বারা অথবা যে কোনও উপায়ে ইহার সাহায্য করিবেন তাঁহারা বিশ্বভারতীর বান্ধবরূপে গণ্য হইবেন।
'বিশ্বভারতীমণ্ডলীর চারি অঙ্গ : আচার্য, ছাত্র, অধ্যাপক ও বান্ধব।

আচার্য

'বিশ্বভারতী যাঁহাদিগকে আচার্যরূপে বরণ করিয়া লইবেন সংসারভাবনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতি মাসে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিবেন, তাঁহারা আশ্রমে বাসস্থান পাইবেন এবং সেখানে যে গ্রন্থাগার আছে তাহা ব্যবহার করিতে তাঁহাদের বাধা থাকিবে না।
'বৎসরে অন্তত ছয়টি করিয়া ব্যাখ্যান (lectures) বিশ্বভারতী তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিবেন। এই ব্যাখ্যান গ্রন্থাকারে বা বিশ্বভারতীর ত্রৈমাসিকে অথবা অন্য কোনও পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে।
'ছাত্রদের মধ্যে কেহ অধ্যয়নের বিষয় সম্বন্ধে আচার্যদের সাহায্যপ্রার্থী হইলে অবকাশ মতো তাঁহারা সাহায্য করিবেন।
'কলাবিভাগের আচার্য [র] নিকট হইতে ব্যাখ্যানের পরিবর্তে বৎসরে অন্তত দুইটি স্বকল্পিত চিত্র বিশ্বভারতী প্রত্যাশা করিবেন।
'সঙ্গীতবিভাগের আচার্য বৎসরে চারিবার ছাত্রগণকে লইয়া গীতোৎসব করিবেন।
'কারুবিভাগের আচার্য বৎসরে দুইবার প্রদর্শনীতে ছাত্রদের রচিত কারুশিল্প দেখাইবেন।
'বিশ্বভারতীর আচার্য তিন শ্রেণীর : আশ্রমস্থ, বহিস্থ ও অভ্যাগত।
'আশ্রমস্থ আচার্য ছুটির নিয়ম পালন করিয়া আশ্রমে সংবৎসর বাস করিবেন।
'বহিস্থ আচার্য আশ্রমের বাহিরে থাকিয়াও কর্মসূত্রে বিশ্বভারতীর সহিত যোগ রাখিতে পারিবেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যানের সংখ্যা তাঁহাদের সুবিধা অনুসারে স্থির হইবে।
'অভ্যাগত আচার্য ভারতের বাহির হইতে আসিয়া যথানির্দিষ্ট কাল যথানির্দিষ্ট নিয়মে কোনও বিশেষ বিষয়ে ব্যাখ্যান দিবেন। বিশ্বভারতী তাঁহাদের পাথেয় ও দক্ষিণার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন।

ছাত্র

'বিশ্বভারতীতে প্রবেশার্থী ছাত্রদের যোগ্যতা বিচার করিবার জন্য একটি সমিতি থাকিবে। ইহাদের সম্মতিক্রমে যে ছাত্র বিশ্বভারতীতে নিযুক্ত হইবেন প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া রচনা তাঁহাদের অধ্যাপকের অনুমোদনপত্রসহ নির্দিষ্ট সমিতির হাতে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে।
'বৎসরের শেষ পর্যন্ত যাঁহারা অকৃতকার্য হইবেন অথবা অন্য কারণে সমিতি-কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত হইবেন তাঁহারা ছাত্র থাকিতে পারিবেন না।
'আচার-ব্যবহার ও দৈনিককৃত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই ছাত্রদিগকে বিশ্বভারতীর নিয়ম পালন করিতে হইবে। তাঁহাদের স্বকীয় নির্দিষ্ট অধ্যয়নের বিষয় ছাড়াও যে কোনও বিষয় সমিতি অবশ্যায়ন (compulsory) বলিয়া স্থির করিবেন, ছাত্রদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

'বিশ্বভারতীর ছাত্র তিন শ্রেণীর : আশ্রমস্থ, বহিস্থ ও অভ্যাগত।

'আশ্রমস্থ ছাত্র ছুটির নিয়ম পালন করিয়া আশ্রমে তাঁহাদের অধ্যয়নকাল নিয়ত যাপন করিবেন।

'বহিস্থ ছাত্র বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে আসিয়া ব্যাখ্যানসভায় যোগ দিতে পারিবেন।

'অভ্যাগত ছাত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়া কিছুকালের জন্য আশ্রমে শিক্ষালাভ করিবেন। সমিতি ইচ্ছা করিলেই ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, কোনও বিশেষ পরীক্ষার আবশ্যকতা থাকিবে না।

অধ্যাপক

'বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, সমিতি-কর্তৃক অবধারিত নিয়ম অনুসারে অধ্যাপনা করিবেন।

'অধ্যাপক অধ্যাপন-কার্যের সহিত কোনও বিশেষ বিষয়ের চর্চায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং সে সম্বন্ধে বৎসরে একটি করিয়া রচনা সমিতি হাতে দিবেন।

'বিশ্বভারতীর অধ্যাপক দুই শ্রেণীর : আশ্রমস্থ ও বহিস্থ।

'আশ্রমস্থ অধ্যাপক ছুটির নিয়ম রক্ষা করিয়া সংবৎসর আশ্রমে বাস করিবেন।

'বহিস্থ অধ্যাপক সমিতি-কর্তৃক অবধারিত বিশেষ নিয়মে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিয়া অধ্যাপনা করিয়া যাইবেন।

বান্ধব

'বিশ্বভারতীর বান্ধব দুই শ্রেণীর : আশ্রমস্থ ও বহিস্থ।

'আশ্রমে বাস করিয়া যাঁহারা বিশ্বভারতীর ধর্মসাধনা বা কর্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবশত বিশ্বভারতীর সেবার জন্য স্বেচ্ছাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই আশ্রমস্থ বান্ধব।

'যাঁহারা দূরে থাকিয়া কর্মের দ্বারা বা ইহার মূল নীতির সমর্থন দ্বারা বিশ্বভারতীর আনুকূল্য করিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার বহিস্থ বান্ধব।'

এই নির্দেশনামায় গুরুদেব 'বিশ্বভারতীর আদর্শ' অংশে প্রথমেই জানাচ্ছেন— 'বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিভাগ সাধারণ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুবর্তী নহে। এখানে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় ক্লাস করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে না।' গুরুদেবকে এ কথা জানাতে হয়েছিল এই কারণে যে, বিশ্বভারতীর তখনকার পরিচালকবৃন্দ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর প্রতি একান্ত অনুরাগবশত বিশ্বভারতীর উচ্চশিক্ষাকে যেভাবে সাজিয়ে নেবার পরিকল্পনা করেছিলেন তা গুরুদেবের চিন্তানুযায়ী পরিকল্পিত ছিল না বলেই পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা ওই চিঠির দ্বারা তার প্রতিবাদ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী তখন বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ বা কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত। তাঁকে লেখা চিঠি এবং নির্দেশনামাটি পাঠ করে পরিষ্কার অনুমান করা যায় যে, গুরুদেব তপোবনের যুগ, বৈদিক যুগ এবং হিন্দু যুগে প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষাদর্শটিকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে বিংশ শতকের সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা ভেবেছিলেন। বিংশ শতককে অস্বীকার করে, ভারতের প্রাচীন যুগকে আঁকড়ে ধরে থাকতে তিনি চাননি। প্রাচীন ও বর্তমানকে গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ যুগে অগ্রসর হবার পথের নির্দেশ দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ বা কলেজের শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল, বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লেখা চিঠি ও নির্দেশনামার পথ ধরে।

এখানে একটি বিষয় জানাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বিষয়টি হল, বহিরাগত

আচার্য বা অধ্যাপকগণ প্রায় সকলেই এসেছিলেন 'ভিজিটিং প্রফেসর' হিসাবে। সুতরাং তাঁরা তাঁদের স্বল্প সময়ের মধ্যে যতখানি পড়ানো সম্ভব তারই চেষ্টা করতেন।

গুরুদেব-কর্তৃক নির্দেশিত বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের শিক্ষাগ্রহণের জন্য বাইরে থেকে সংখ্যায় যতজন শিক্ষার্থী যোগ দেবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন, পরে শোনা গিয়েছিল তা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে কর্তৃপক্ষ ১৯২৫ সালে ভিন্ন পথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা স্থির করেছিলেন, উত্তর বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ., বি.এ. পর্যন্ত অনুমতি গ্রহণ করবেন। সে অনুমতি বিশ্বভারতী সহজেই পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আই.এ, বি.এ পাঠ্যকে তাদের নিয়মানুযায়ী অনুমতি দিয়েছিলেন, তাঁদের 'অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ' হিসাবে।

১৯১৯ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে একটি বাড়ি ক্রয় করেছিলেন সপরিবারে বাস করবেন বলে। তাঁরা সুযোগ ও সময় পেলেই কলকাতা থেকে কিছুদিনের জন্য এই বাড়িতে বাস করে আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনের আই.এ, বি.এ ক্লাসকে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে পঠন-পাঠনের ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুমতি দেওয়ার পরে, তার পরিচালনার জন্য একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করবার নির্দেশ দিলেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বা কলেজের বিভিন্ন পাঠক্রমের শিক্ষার জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিযুক্ত অধ্যাপকদের আইন অনুযায়ী নিয়োগ করতে বলা হল। বিশ্বভারতীর পরিচালকগণ তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করায়, তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি দেন এবং অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু পাঁচ মাস পরে তাঁকে ওই পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার অনুমতি চেয়ে ৬ ভাদ্র ১৩৩২/২২ অগস্ট ১৯২৫ তারিখে একটি চিঠিতে লিখলেন—

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
মহোদয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

আমি যখন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের পদ আপাতত পাঁচ মাসের জন্য গ্রহণ করেছিলাম, তখন আমার এই ধারণা ছিল যে ইহা বাহিরের কোনও কর্তৃপক্ষের শাসন-পরিদর্শন-আদির অধীন হইবে না। এক্ষণে দেখিতেছি, সে ধারণা ভ্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার যে চিঠির দ্বারা বিশ্বভারতীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ ও বি.এ পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে এই শর্তের উল্লেখ আছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিশ্বভারতী অথবা শিক্ষাভবন পরিদর্শন করাইবেন। এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের মত কী তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি বাহিরের কোনও কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের অধীন কোনও বিদ্যামন্দিরে কাজ করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। এই জন্য আমি দুঃখের সহিত শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষতাকার্যে ইস্তফা দিতেছি। আপনি দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করিলে উপকৃত হইব। ইতি

আজ্ঞাধীন
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ'

পরের দিন ৭ ভাদ্র, তিনি গুরুদেবকে পুনরায় চিঠিতে জানালেন—

'ভক্তিভাজনেষু

আপনার নামে কল্য আমার যে ইস্তফাপত্র পাঠাইয়াছি, তাহা পাইয়া থাকিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'রেগুলেশ্যন্স'-এর যে ধারা অনুসারে বিশ্বভারতীকে তাঁহাদের পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহা দেখিলাম। তাহাতে পরিদর্শন করা বা না করার কিছুরই উল্লেখ নাই।

যে সব বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার পরীক্ষা ও উপাধিগুলি recognise করেন, তাঁহারা কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে inspect করিবার শর্ত করেন নাই।

যাহা হউক, এ সকল বিষয় আপনাদের বিবেচ্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি inspection-এ রাজি নহি বলিয়া ইস্তফা দিয়েছি। তাহা গ্রহণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আপত্তি সত্ত্বেও এই কলেজটি রয়ে গেল এবং বাইরে থেকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে এনে এই বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হল এবং এই বিভাগকে নতুন নামকরণ করে বলা হল 'শিক্ষাভবন'।

বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির আশায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণে আই.এ এবং বি.এ পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাওয়া গেলেও, তার প্রতি গুরুদেবের মনে যে এতটুকুও আগ্রহ ছিল না, তা জানা যায় শিক্ষাভবনের (কলেজ) পরবর্তী যুগের অধ্যক্ষ, নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা গুরুদেবের একটি চিঠি থেকে। গুরুদেব তাঁকে লিখিত পত্রে জানিয়েছিলেন—

'সুহৃদবরেষু,

আপনারা সকলেই মস্ত একটা ভুল কবেছেন। শিক্ষাভবন সম্বন্ধে নতুন যে ব্যবস্থা প্রচার হয়েছে তাতে নিয়ম রক্ষার জন্য আমার স্বাক্ষর আছে মাত্র। আমি দায়ী নই। চারুবাবুর [চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য] 'পরে সম্পূর্ণ ভার দিয়েছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শমাত্র করেননি। কী রকম ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত আমি কিছুই জানতাম না। জানার প্রয়োজনও ছিল না—কেন না কর্তৃত্ব তাঁরই। সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব থেকে আমি নিষ্কৃতি নিয়েছি। ইতিপূর্বেও অনেক ব্যবস্থা আমার মনের মতো হয়নি—কিন্তু নিয়মমত হয়েছিল। কখনও কখনও মুখে আপত্তি করলেও কাজে বাধা দিইনি। এখনও আমার সেই রীতি।...

...বিদ্যালয় আমি নিজের হাতে নিয়েছি।... কলেজ নিতে পারি নে, কারণ কলেজের বাঁধা কাজ, য়ুনিভার্সিটির [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] সঙ্গে একাত্ম।...

...আমি তো নতুন ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করতে ভয় পাই। এই কারণেই আমি শিক্ষাভবনের [কলেজ] উপর বিশেষ আকৃষ্ট নই—ওটাকে বাধা বলেই গণ্য করি। আপনারা এ দায় যখন ইচ্ছা করে গ্রহণ করেছেন তখন যথাযোগ্য উপায়ে একে সিধা রাখবার চেষ্টা করবেন।'

অন্য একজনকে ১৯৩৪ সালে 'শিক্ষাভবন' সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করে চিঠিতে লিখেছিলেন—'শান্তিনিকেতনে কলেজ-ইস্কুলটা বস্তুত বিশ্বভারতীর আপন সন্তান নয়, পোষ্যপুত্র। ওরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই— অথচ ওদের পোষবার জন্য আমাদের যথার্থ নিজের কাজকে দেউলে অবস্থার অতল স্পর্শ গহ্বরের মুখের কাছে দাঁড় করিয়েছি—সবসুদ্ধ একদিন ডুবতে হবে। কিন্তু মোহের ছলনা একেই বলে—সত্যের চেয়ে মায়ার প্রলোভন বেশি। আমার কিছু করবার দিন নেই। এখন কনস্টিট্যুশন—তার জন্যে খাটতে হয়, কিন্তু তাকে দূর থেকে নমো নমো।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ শিক্ষাভবনের কাজকর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ১৯২৫ সালে ওই ভবনের অধ্যক্ষ পদ যখন ত্যাগ করেন তখন গুরুদেবও যে তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ১৯২৬ সালে গুরুদেব গভীর দুঃখভারাক্রান্ত মনে জানিয়েছিলেন—'স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা, এটি আমার সৃষ্টি—আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী, তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি—কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুল মাস্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে— শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে।'

এর পর থেকেই উপর্যুক্ত চিঠিগুলির দ্বারা গুরুদেব শান্তিনিকেতনবাসীদের কাছে বারে বারে 'শিক্ষাভবন' সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। ১৯৩৫ সালেও গুরুদেবের মনে শিক্ষাভবন সম্পর্কিত বিরূপ মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে দশ দিনের ব্যবধানে লিখিত দুটি পত্রে তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। প্রথমটিতে গুরুদেব জানিয়েছেন—'যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠেনি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত করে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি—কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানা ঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট করে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই, করা হল প্রোগ্রাম—হাপরের হাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদ্দম চলছে হাতুড়ি-পেটা। যথা—নির্দিষ্টের শাসন আইনে কানুনে পাকা হল, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস করে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শালবীথিকায় আসন বিছিয়ে বসেছিল, তাকে সরতে সরতে কত দূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ। মাঝখানে পড়ে শুকিয়ে যে এল কবির যৌবন, বৈশাখের অজয় নদীর মতো। নইলে আমি শেষ দিন পর্যন্তই বলতে পারতুম, আমার পাকবে না চুল, মরব না বুড়ো হয়ে। জিত হল কেজো লোকের। এখন যে কর্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার সীমানা সুস্পষ্ট, অন্য বাজারের সঙ্গে তার বাজারদর খতিয়ে হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে"। এর মধ্যে যে টুকু ফাঁকা আছে সে ওই সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে, সে দিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানা ঘরের মালিকগিরিতে বসিয়ে দিয়ে গেছে।'

অপর চিঠিতে গুরুদেব জানিয়েছেন রথীন্দ্রনাথকে—'আশ্রমে এখন অধ্যাপকেরা সকলেই তরুণ, এবং কারও মধ্যেই আদর্শে বিশ্বাসের গভীরতা নেই। ছাত্রদের চরিত্রে এদের প্রেরণাশক্তির সম্পূর্ণ অভাব। এখানকার নৈতিক আবহাওয়ার স্বাস্থ্যকরতা নেই। জগদানন্দ নেপালবাবু কালীমোহনদের স্বভাবে যে seriousness থাকাতে তাদের নিষ্ঠা সরল স্থায়ী ও সত্য হয়েছে, এদের তা নেই। এরা তাই আশ্রমকে কোনও দিক থেকেই গড়তে পারছে না। শেষ মানুষ ছিলেন শাস্ত্রীমশায়, তিনিও চলে গেলেন।'

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে পরপর ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত গুরুদেবের এইসব চিঠি থেকে পরিষ্কার ধরা পড়ে যে বিশ্বভারতীর ওই যুগের পরিচালকবৃন্দ গুরুদেবের শিক্ষাদর্শ বা শিক্ষাচিন্তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রেখে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে চাইছেন না। গুরুদেবের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস হারানোর দুঃখই চিঠি ক'টির মূল সুরে ব্যক্ত হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করছেন। তাঁর প্রতি অসম্মান, নিন্দা তিনি বাইরের মানুষদের কাছ থেকে পূর্বে প্রচুর পেয়েছেন, কিন্তু তার জন্য তিনি নিজেকে এতটা অসহায় বলে মনে করেননি। পরে নিজের ঘরের একদল লোক, বিশ্বভারতীর কর্মে যাঁরা নিযুক্ত, তাঁরা যখন গুরুদেবের আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলতে লাগলেন তখন তিনি তাঁর মনোবেদনাকে আর চেপে রাখতে পারেননি। এর দ্বারা বেশ পরিষ্কার অনুমান করা যায় যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর কতখানি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। মনের দিক থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণকালে শিক্ষাভবন সম্পর্কে সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা তখন আমার যে ছিল না, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু পরে তার পরিচয় পেতে কোনও অসুবিধা বোধ করিনি। বিদেশ থেকে নামী অধ্যাপকগণ আসছেন, তাঁদের অভ্যর্থনাসভা যখন হত তখন তাতে যোগ দিতে আমাদের মতো বালখিল্যদের কোনও বারণ ছিল না। আমরা সেই সভায় যোগ দিতাম, বহিরাগত প্রফেসরদের গুণাগুণের সংবাদ পেতাম। আর দেখতাম, তাঁরা যখন কলকাতা থেকে আগত পণ্ডিতদের এবং শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও কিছু

বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একই সঙ্গে ক্লাস নিতেন, তখন মনে ধারণা হত যে তাঁরা নিশ্চয়ই উঁচুদরের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। স্বভাবতই তাঁদের প্রতি মনে শ্রদ্ধা জাগত। বিদেশি পণ্ডিতরা, তাঁদের কাজ শেষ করে যখন বিদায় নিতেন, তখন তাঁদের বিদায়সভায়ও যোগ দিতাম। শুনতাম, তাঁদের বিদায়ভাষণ, সঙ্গে গুরুদেবের ভাষণও। গুরুদেবের অনুপস্থিতির দিনে এখানকার অধ্যাপকদের দু'একজন ভাষণ দিতেন। কখনও কখনও বয়স্ক ছাত্ররাও ভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানাতেন তাঁদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ পরিচিতির কথা। এভাবে আমরা পরিষ্কার অনুভব করতে পারতাম, শান্তিনিকেতনের জীবনকে তাঁরা কতখানি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। বাইরে এইভাবেই বিশ্বভারতী আমার মনে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তখনও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা, বিশ্বভারতীতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাভবন ও বিদ্যাভবনের কাজকর্ম সম্পর্কে সঠিক জানবার প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। ১৯৩০ সালে যখন সংগীতবিভাগের শিক্ষক হিসাবে যুক্ত হবার সুযোগ পেলাম, তখন আমি যৌবনে পা দিয়েছি এবং সমগ্র বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল করে জেনে নেবার প্রতি মনোযোগ দেবার সুযোগ ঘটে। বিশ্বভারতীর উচ্চশিক্ষার পথে গুরুদেবের মন কী চেয়েছিল এবং বিশ্বভারতীর অভিভাবকদের বিরূপ কাজকর্ম সম্পর্কে একটু একটু করে জানবার সুযোগও এসে গেল। বেশ খানিকটা বোঝবার পথে যখন এগিয়েছি তখন বুঝতে পারতাম, গুরুদেবের জীবনের অসহায় অবস্থার কথা। তারপর থেকে এ বিষয়ে আমার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেল। এতদিন তাকে প্রকাশ করে ধরবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। এবারে তার প্রকাশের প্রতি মনোনিবেশ করছি, গুরুদেবের কথা চিন্তা করে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে বাৎসরিক পরীক্ষা নিয়মিত হত। তখন আমরা ক্লাসে পড়ার সময় যেভাবে আসন পেতে মাটিতে পা মুড়ে বসতাম, পরীক্ষার সময়ও সেইভাবেই বসতাম নিজেদের স্থান নির্বাচন করে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে,— আম্রকুঞ্জের আমগাছগুলির তলায়, কিংবা শালবীথির গাছের তলায়। কোনও পর্যবেক্ষক থাকতেন না। আমাদের প্রতি শিক্ষকরা বিশ্বাস রাখতেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও টোকাটুকির চেষ্টা যে একেবারেই হত না তা বলব না। গাছের ছায়ায় বসে পরীক্ষার খাতা লেখাটাতে আনন্দই পেতাম। আমার বিদ্যালয়জীবনের শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসার এই নিয়মটি অব্যাহত ছিল। এ যুগে তা আর নেই। এখন বড় হলঘরে চেয়ারটেবিলে সার বেঁধে বসে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয়। সেখানে নিয়মিত পাহারাও দিতে হয়।

আমার বাবা ১৯১৯ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করে কলকাতায় গিয়ে বাংলার যুবকদের সংগঠিত করে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বাবা কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কাছাকাছি সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট নামক একটি গলিতে বাসা ভাড়া করে, মাকে এবং আমার ভ্রাতা সাগরময়কে নিয়ে থাকতেন। আমাকে শান্তিনিকেতনে রেখে গিয়েছিলেন। ছাত্রাবাসের ছেলেদের সঙ্গে আমাকে থাকতে হয়েছিল। সে সময় পরপর তিনটি ছাত্রাবাসে আমি ছিলাম। ছাত্রাবাসগুলির নাম ছিল শমীন্দ্রকুটির, নাট্যঘর ও বীথিকাঘর। শমীন্দ্রকুটির ও বীথিকাঘরে ছাত্রদের সঙ্গে যে মাস্টারমশায় থাকতেন তাঁর নাম এখন আর মনে করতে পারছি না। কিন্তু নাট্যঘরের পশ্চিমদিকে ছিলেন শিক্ষক নগেন আইচ। তাঁর কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। তার কারণও আছে। চেহারায় তিনি ছিলেন রোগা পাতলা মানুষ। প্রতিদিন তিনি অতি প্রত্যুষে উঠে হাতে দুটি লোহার ডাম্বল নিয়ে কয়েকপ্রকার ব্যায়াম নীরবে করতেন। তিনি চেষ্টা করতেন আমাদের ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যেই ব্যায়ামের কাজ শেষ করতে। কিন্তু তাতে তিনি সবসময়ে যে সফল হতে পেরেছিলেন তা নয়। ছাত্রাবাসের কোনও না কোনও ছাত্রের তখন ঘুম ভেঙে যেত। সে আবার তার পাশের বন্ধুদের ডেকে দিত। তারা নীরবে মটকা মেরে শুয়ে থেকে নগেন আইচের ব্যায়াম করা দেখত। শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল। ঘনঘন যেতেন হাসপাতালে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে। তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। গুরুদেবের রচনা 'শিশু' গ্রন্থসহ আরও দুটি বালকদের উপযোগী কবিতার বই থেকে কবিতা পড়াতেন। আর একটি বিশেষ কারণে তিনি আমাদের অত্যন্ত

প্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে একটি গল্প বলে পরে সেটি অভিনয় করে আমাদের চিত্তবিনোদন করতেন। তিনি বলতেন একসময়ে কলকাতার থিয়েটারে অভিনয় করবার প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা দিয়েছিল শিক্ষিত যুবসমাজে। তাঁর কাছেই আমরা শুনেছি, কলকাতার এক থিয়েটারের ম্যানেজার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের সুবিধার্থে একটি অভিনব প্রথা চালু করেছিলেন। থিয়েটারের সেই ম্যানেজার আলুর উপরে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তাতে যতপ্রকার আলু আমরা খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ করে থাকি, তার সবক'টিই এই কবিতাটিতে স্থান পেয়েছিল। থিয়েটারের ম্যানেজার তাঁর সেই আলু সম্পর্কিত কবিতাটি রৌদ্ররস, করুণরস, হাস্যরস প্রভৃতি আরও কয়েকটি রসের অভিব্যক্তির দ্বারা আবৃত্তি করে শোনাতে বলতেন। পরীক্ষার্থীদের সেইমত শোনাতে হত। নগেন আইচ মহাশয়ের সেই কবিতাটির অনেকখানি মুখস্থ ছিল। তিনি বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের আবেগের মিশ্রণে অভিনয়সহ যখন আমাদের আবৃত্তি করে শোনাতেন, আমরা তখন হেসে লুটোপুটি খেতাম। মাঝে মাঝেই আমরা তাঁকে অনুরোধ করতাম, 'আলু'-শীর্ষক কবিতাটি শোনাতে, তিনিও সানন্দে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতেন।

কালীপদ বসু ছিলেন বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার শিক্ষক। তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর ছোট ছোট কবিতা ছাত্রদের হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত হত। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায়ও তাঁর কবিতা কখনও কখনও মুদ্রিত হতে দেখেছি। কালীপদ বসুর চেহারা ছিল বলিষ্ঠ, পালোয়ানদের মতো। তিনি তাঁর পালোয়ানি দেহ রক্ষার জন্য নিয়মিত প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণে ডন-বৈঠক-আদি ব্যায়াম করতেন। ছাত্রদের আহারাগারে চারবেলাই তিনি খেতেন। তিনি একজনের মতো খাদ্য গ্রহণ করতেন না। সর্বদাই দু'জনের মতো খাদ্য গ্রহণ করতেন। তাঁর দেহের, হাতের, পায়ের মাংসপেশী আমাদের দেখাতেন। তাঁর হাতের এবং আঙুলের শক্তি প্রদর্শনের জন্য হাতের কড়ে আঙুলটি দেখিয়ে আমাদের সেটি ধরতে বলতেন। সেই অবস্থায় তিনি এক এক করে আমাদের সকলকে মাটি থেকে প্রায় এক হাত উঁচুতে তুলে তাঁর দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতেন। তাঁর এই খেলাটিও ছিল আমাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

শান্তিনিকেতনে আমার পড়াশোনার জীবন তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। এখানকার নৃত্যগীত অভিনয়ের জীবনই আমার কাছে অধিক আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে ছিল নানাপ্রকার খেলাধূলা। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার বছর দশেক পর নৃত্যগীত-অভিনয়চর্চা আমার জীবনে কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং তাই নিয়ে একটানা প্রায় ৪০/৪২ বছর কীভাবে আমার শান্তিনিকেতনের কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আমি বলেছি।

বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ও অধ্যাপকগণ

বিদ্যালয়ের যুগে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া নিজেদের চেষ্টায় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় নানাপ্রকার গ্রন্থ পড়তে হত। এই গ্রন্থগুলি শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে। এর তালিকা গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের উপর দৃষ্টি রেখে অধ্যাপকগণই করতেন। গ্রন্থপাঠের এই পদ্ধতিকে বলা হত 'Rapid Reading' পদ্ধতি। গ্রন্থগুলি সবসময় যে সহজপাঠ্য ছিল তা নয়। তা হলেও গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা যে হত সে কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

সন্ধ্যায় বিনোদনপর্বে বিদ্যালয়ের যুগে মাস্টারমশায়রা নিয়মিত য়ুরোপ ও ইংলন্ডের প্রখ্যাত লেখকদের নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত গল্প-গ্রন্থ থেকে গল্প বলার ঢঙে পড়ে শোনাতেন। সেইসব গল্প ছাত্রছাত্রীরা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনত। আমার ছাত্রজীবনে ওইসব গল্প যাঁদের মুখে শুনেছি, তাঁদের মধ্যে জগদানন্দ রায়ের গল্প বলার ঢঙটি আমাকে খুবই আকর্ষণ করত।

তিনি আমাদের অঙ্কের ক্লাস নিতেন, মাধবীকুঞ্জের নীচে। তখনও পর্যন্ত মাস্টারমশায়রা সকলেই ছাত্রদের সঙ্গে মাটিতে আসন পেতে বসতেন। স্বতন্ত্রভাবে উঁচু বাঁধানো বেদিতে তাঁরা বসতেন না। অঙ্কের ক্লাস আমার মনে সর্বদাই ভীতির সঞ্চার করত। সেই কারণে জগদানন্দ রায়ের ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারতাম না। ক্লাসে তাঁকে সর্বদাই খুব রাশভারি মনে হত। তাই ক্লাসের সময় তাঁকে খুবই ভয় পেতাম। কিন্তু তিনি যখন বিভিন্ন নাটকে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করতেন, তখন মনে হত তিনি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ। খুব সহজেই তিনি আমাদের নিজের করে নিতে পারতেন। তাঁর মধ্যে আরও একটি গুণের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। তিনি বেশ ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে প্রায় সব অনুষ্ঠানে গানের সঙ্গে তিনি বেহালা বাজিয়েছিলেন। এর পর তিনি আর বেহালা বাজাননি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি বিজ্ঞানের নানাপ্রকার গ্রন্থ রচনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। প্রায় প্রতি বছর একটি করে নতুন গ্রন্থ আমরা পেতাম এবং আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় আট-দশটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকপ্রকার কাজের দায়িত্ব ছিল। ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনের প্রেস থেকে 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি চার পৃষ্ঠার পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি ছিলেন তার সম্পাদক। এখানকার বড় কুয়োর পশ্চিমে যে নানাপ্রকার ফল-শাকসবজি উৎপাদনের দায়িত্ব ছিল তার কথা পূর্বে বলেছি। বোলপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান-এর দায়িত্বেও বেশ কয়েক বছর তিনি নিযুক্ত ছিলেন। পাঠভবনের সর্বাধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি কয়েক বছর কাজ করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাগুলি সে যুগে শিক্ষিতমহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এইসব কারণে সে যুগের ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রায়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনের প্রেসের মুদ্রাকর ছিলেন।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মাস্টারমশায়দের অনেকের কাছে আমাকে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি পড়তে হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। এঁদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের কথা আজও মনে পড়ে। তিনি আমাদের খেলাধূলার বিষয় কীভাবে পরিচালনা করতেন তার কথা অন্য পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বলেছি। কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত নিম্নবর্গের ছাত্রদের ইংরেজি ভাষার শিক্ষক। ইংরেজিতে 'সোরাব রুস্তম' কবিতাটি তিনি বেশ কিছুদিন আমাদের পড়িয়েছিলেন। ওই কবিতাটি গুরুদেব আগাগোড়া ইংরেজি গদ্যে নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। সন্তোষ মজুমদার সেই লেখা অনুযায়ী হুবহু গুরুদেবের পদ্ধতিতেই একটু একটু করে আমাদের পড়াতেন। ক্লাসে যেটুকু পড়ানো হত আমরা প্রতিদিন সেটুকু ইংরেজিতেই নিজের মতো লিখে ফেলতাম। পরে তিনি সেগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিতেন। বিদ্যালয় যুগের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা গুরুদেব-নির্দেশিত এই শিক্ষাপদ্ধতির বিশদ বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

আমি যখন ১৫/১৬ বছরের ছাত্র তখন কয়েকজন ছাত্রছাত্রীসহ গরমের ছুটিতে প্রায় একটানা এক মাস গুরুদেবের কাছে ইংরেজি ভাষার ক্লাস করতে হয়েছিল। তিনি Golden Book of English Verse নামক ইংরেজ কবিদের কবিতা সংগ্রহের একটি গ্রন্থ থেকে নামী কবিদের বাছাই করা কবিতা আমাদের পড়াতেন। যেদিন যেটুকু পড়াতেন, সেটুকু তিনি খাতায় লিখতে বলতেন। আমরা নিয়মিত তা লিখতাম। তিনি আমাদের লেখা খাতাগুলি ধৈর্য ধরে পড়ে নিজের হাতে সংশোধন করে দিতেন। আমার খাতায় গুরুদেবের নিজের হাতে সংশোধিত একটি পাতা আমি যত্ন করে রেখেছিলাম। এখনও সেটি আছে। আমি লিখেছিলাম পেনসিলে, তিনিও সংশোধন করেছিলেন পেনসিলেই।

কালীপদ বসুর কাছে আমরা বাংলা ক্লাস করতাম। চেহারায় তিনি ছিলেন বেশ পালোয়ান। তাঁর দেহের অপরিমিত শক্তি এবং তাঁর খাওয়ার পরিমাণের বর্ণনা আমি আগেই বিস্তারিতভাবে করেছি। কবি হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে লেখা পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। বিদ্যালয়ের যুগেই তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

গান

সে যুগে দিনেন্দ্রনাথের গানের ক্লাসের কথা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। তিনি তখন সপরিবারে গুরুদেবের 'দেহলি' বাড়ির নীচের তলায় থাকতেন। 'দ্বারিক' বাড়িটি রচিত হবার পর তার একতলায় গানের ক্লাস হত। দিনুবাবু এখানে সন্ধ্যায় ছাত্রদের উপাসনা শেষ হবার পর, বিনোদন পর্বে তাঁর ক্লাস নিতেন। এই ক্লাসে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রী ব্যতীত আশ্রমবাসী—ছোট-বড় সকলেরই যোগদানের অধিকার ছিল। অধ্যাপকদের পত্নীদের মধ্যেও কয়েকজন খুবই উৎসাহ নিয়ে এই ক্লাসে যোগ দিতেন। আমাদের মাতৃদেবীও এই ক্লাসে এসে গান শিখতেন। দিনেন্দ্রনাথ কাউকেই বারণ করতেন না। এই ক্লাসে তিনি গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যের গানগুলিই তখন শেখাতেন। এই সময়ে অন্য পর্যায়ের নতুন গান রচনা করে, গুরুদেব মাঝে মাঝে দিনেন্দ্রনাথের এই গানের ক্লাসে চলে আসতেন। সেখানেই দিনেন্দ্রনাথসহ ছোট-বড় সকলকেই একসঙ্গে তা শিখিয়ে দিতেন। গুরুদেব দিনেন্দ্রনাথের হাতে নতুন গানের একটি কপি দিয়ে গান ধরতেন। তিনি সে সময়ে গানের পঙক্তি বা কলি ধরে বারেবারে গাইতেন না। সমগ্র গানটি নিজের ভাবাবেগে আপন মনে গানের প্রথম পঙক্তি থেকে শেষ পঙক্তি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে গেয়ে যেতেন। দিনেন্দ্রনাথ অতি দ্রুত গানের সুর গলায় তুলতে পারতেন বলে গুরুদেবকে খুব বেশি গাইতে হত না। প্রথম দিকে দিনেন্দ্রনাথ গলা খুলতেন না। মৃদুস্বরে গুরুদেবের সঙ্গে গানটি গাইতেন, গানের কপির প্রতি দৃষ্টি রেখে। যখন বুঝতেন, সম্পূর্ণ গানটি তিনি সঠিক সুরে আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তখনই তিনি গলা ছেড়ে গুরুদেবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে যেতেন। গানের দলও এই সময়ে গানটি তাঁদের উভয়ের কণ্ঠে শুনে গাইত। গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের নজর তখন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি পড়ত না। আমি কিন্তু অন্য ছাত্রছাত্রীদের মতো গানটি গাইতে চেষ্টা করতাম না। আমার গলার স্বর তখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত। আমি একদৃষ্টে গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে, শুনে যেতাম তাঁদের গান। মনে হত, তাঁরা যেন গান শেখাচ্ছেন না, তাঁরা উভয়ে যেন গানের মাধুর্য উপভোগ করছেন, তাঁদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে। আমার কণ্ঠে তখন গানের সুরের প্রকাশ না ঘটলেও মনের মধ্যে সেই সুর যে শুনতে শুনতে বসে যেত তা টের পেতাম সেই গানটিই যখন দিনেন্দ্রনাথ পরে সকলকে একসঙ্গে গাইয়ে নিখুঁতভাবে শিখিয়ে দিতেন। সেই সময়ে আমি গানটি বিনা দ্বিধায় গেয়ে যেতাম সকলের সঙ্গে। মনে হত আমি যেন নিজে গাইছি না। আমাকে কেউ যেন গাওয়াচ্ছে। এর পরেও দিনেন্দ্রনাথসহ বিশেষ করে নির্বাচিত গানের দলকে গুরুদেব নতুন গান যখনই শিখিয়েছেন, তখনও আমি উভয়ের কণ্ঠে একই আবেগের পরিচয়ে অভিভূত হতাম।

গুরুদেবের কাছে গান শেখা

১৯৩০ সালের পর গুরুদেবের কাছে তাঁর নতুন রচিত গান প্রথম শেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়। প্রথম কীভাবে তা শিখেছিলাম সে বিবরণ পূর্বে দিয়েছি। ১৯৩৪ সালে রমা কর (নুটুদি) এবং ১৯৩৫-এ দিনেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর, প্রায় একটানা আমাকে নানা পর্যায়ের নতুন গান, নাটকের গান, নৃত্যনাট্য তিনটির গান প্রথম শিখতে হয়েছিল। শেখবার আগে গুরুদেবের হাতে লেখা যাবতীয় নতুন গানের কপি তিনি আমার হাতে প্রথমে ধরিয়ে দিতেন। বাল্য বয়সে যে ভাবে গুরুদেব, দিনেন্দ্রনাথ ও আমাদের সকলের সামনে গানগুলি গাইতেন, সে কথা সর্বদাই মনে পড়ত। আমি দিনেন্দ্রনাথের মতো গুরুদেবের হাতে লেখা গানের কপির প্রতি দৃষ্টি রেখে গলার স্বর না চড়িয়ে গানের সুরটি অন্তরে ধরে নেবার চেষ্টা করে যখন বুঝতাম পুরো গানটির সুর, তাল, ছন্দসহ আমার মনে বসে গেছে, তখনই গলা খুলে গুরুদেবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতাম। এক সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ

এইভাবে গাইবার পর গুরুদেব যখন বুঝতেন যে, গানটি আমি যথাযথভাবে গাইতে পারছি তখন তিনি থামতেন। কখনও কখনও আমার কণ্ঠে গানটি শোনবার জন্যে আমাকে একলা গাইতেও বলেছেন। উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে গেয়ে শোনাবার পর আমার মন আনন্দে ভরে যেত।

গুরুদেব যখনই একলা গান গেয়েছেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং মুখে যে ভাবাবেগ প্রকাশ পেত তা সর্বদাই আমার মনকে গভীরভাবে আপ্লুত করত। নিজে একলা গাইবার সময় চেষ্টা করতাম তাকেই প্রকাশ করতে। কিন্তু সব সময়েই যে তাতে কৃতকার্য হতে পেরেছি তা নয়। তখন তার জন্যে মনে বেদনাও বোধ করেছি।

আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে বাল্য বয়সে যখন গুরুদেবের গান শিখতে শুরু করেছিলাম তখনকার কোন্ গান আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, যার কথা আজও আমার মনে আছে। তার উত্তরে বলব, বাল্যকালে যত বিচিত্র ভাব, সুর ও ছন্দোযুক্ত গান শিখে গাইতে হয়েছিল তার অধিকাংশই আমার মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, কোনও একটি বা দুটি গানের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সূত্র ধরেই আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মৌল উদ্দেশ্য

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজরা আমাদের দেশে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দেশে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলবার ইচ্ছায়। এর পিছনে তাঁদের মৌল যে উদ্দেশ্য ছিল তা হল, এত বড় ভারতবর্ষকে তাঁদের শাসনাধীনে রাখতে হলে প্রয়োজন ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত বহু হাজার ভারতবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা। ইংলন্ড থেকে ইংরেজদের এনে শাসনকার্য করতে গেলে সে দেশের প্রায় সব ইংরেজকেই ভারতবর্ষে আনতে হত, যা কখনই সম্ভব ছিল না। তাই তাঁরা ভারতের প্রশাসনিক সুবিধার্থে সর্ব ক্ষেত্রেই একদল ইংরেজকে মাথার উপর বসিয়ে দিলেন। তাঁরাই হলেন এ দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। ইংরেজি ভাষার শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী দেশের নানা সংস্থায় তাঁদের অধীনে নানা কর্মে নিযুক্ত হতেন এবং এর জন্যে তাঁরা গর্ববোধও করতেন। এই দেশের বহু কোটি অশিক্ষিত মানুষের কাছে তাঁরা সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এই শিক্ষাব্যাবস্থার দ্বারা গড়ে উঠেছিল ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত এক চাকরিজীবী সমাজ। ইংরেজরা সেই শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের প্রতি কোনও নজর দিলেন না। সেই কারণে, ইংরেজের বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বত্র নৃত্য গীত বাদ্য অভিনয় চারুকলা কারুকলা খেলাধূলা শরীর গঠন প্রভৃতি সম্মানজনক শিক্ষণীয় বিদ্যা হিসেবে স্থান পায়নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুদেবই প্রথম ইংরেজদের এইরূপ ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদস্বরূপ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নাচ গান বাজনা অভিনয় চিত্রবিদ্যা এবং মানবসেবামূলক কাজকে সমমর্যাদায় স্থান দিয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। এখানকার শিক্ষায় সাংস্কৃতিক বিকাশের কার্য সূচিত হল ভিন্ন পথে। এখানকার বহুমুখী সাংস্কৃতিক বিকাশের, এখানকার শিক্ষার্থীদের মনন-চর্চার মধ্যে গান ছিল অন্যতম প্রধান বিষয়। গান শেখার ও গান গাইবার উৎসাহের অভাব দেখা যেত না ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। গানের চর্চায় যে অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন তিনি করেছিলেন তা হল, এখানকার প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে গানকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া। এখানে সকলে যেন অনুভব করতে পারে যে, এর অভাবে এখানকার শিক্ষার জীবন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এই কারণে, শান্তিনিকেতনে অতি প্রত্যুষে এবং রাত্রে বৈতালিক গান, নিয়মিত প্রতি বুধবার উপাসনা, বর্ষশেষ, নববর্ষ, ৭ই পৌষ, ১১ই মাঘ, মহাপুরুষদের জন্ম বা মৃত্যুতিথির স্মরণে উপাসনায় গানের প্রবর্তন গুরুদেবই প্রথম করলেন। পূর্ণিমা উৎসব,

বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণে গানকে তিনি মুখ্য ভূমিকায় স্থান দিলেন। এ ছাড়া, গৃহপ্রবেশ, পথ ও পথ চলার গান, চাষ করা ও ধানকাটার গান, খেলার গান, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের জাতীয় সংগীত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' এবং 'ফিরে চল্ ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে' গান দুটি রচনা করলেন। ভারতবর্ষের ছয়টি ঋতুকে সমমর্যাদায় গানের দ্বারা যে সম্মান তিনি দিলেন, তাও পৃথিবীর সংগীতজগতে অতুলনীয়। এ ছাড়া আছে নলকূপ প্রতিষ্ঠা ও চা-ক্লাবের গান। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভায় গদ্য-পদ্য পাঠের সঙ্গে গুরুদেবের গানও বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত। এ ছাড়াও নানাপ্রকার নাটক, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের জন্যেও গুরুদেবকে প্রচুর গান রচনা করতে হয়েছে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ছাত্রছাত্রীসমাজকে এইভাবে গানের দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছিলেন। গুরুদেব তাঁর শেষার্ধে অর্থাৎ জীবনের শেষ চল্লিশ বছর সংখ্যায় যত গান রচনা করেছিলেন, তাঁর জীবনের প্রথমার্ধের তুলনায় সংখ্যায় তা প্রায় দ্বিগুণ। গানের বিষয়বৈচিত্র্যেও প্রথম যুগের তুলনায় শেষ যুগের গান অনেকখানি এগিয়ে আছে। এইরূপ গীতরচয়িতা পৃথিবীতে আর কেউ জন্মেছেন বলে আমার জানা নেই। এ পথে তিনি একক।

শান্তিনিকেতনে গানের দ্বারা যে আনন্দের পরিবেশ গুরুদেব রচনা করেছিলেন তার প্রকাশের পূর্ণ দায়িত্ব ছিল দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায় এখানকার ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও কর্মীদের। এখানে সকলেই যে গান গাইতে পারতেন তা নয়, কিন্তু তাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তা শুনে তাঁদের মনকে তৃপ্ত করতে পেরেছেন। যাঁরা গান গাইবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন, তাঁদের উপরেই থাকত গানের পরিবেশ রচনার দায়িত্ব। অর্থাৎ গুরুদেবের গানগুলি উপভোগ করবার বাতাবরণ রচনা করতেন এঁরাই।

আমার পরিষ্কার মনে পড়ে এইভাবে সারা বছরে গানের বাতাবরণ রচনার জন্য গানের দলকে শিখতে হত সংখ্যায় প্রায় শতাধিক গান। গানগুলি আমরা শিখে নিতাম খুবই সহজে। কারণ নানা অনুষ্ঠানে ভাল করে গাইবার প্রেরণাতেই আমাদের শিক্ষা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হত। বাল্য বয়সে এবং তার পরেও যখনই যে গানের জন্য আমরা তৈরি হতাম, তখন সেইসব গানের প্রকৃত মর্মার্থ গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমাদের কতটুকুই বা ছিল! কিন্তু কেন জানি না, সবরকম গান শিখে এবং গানগুলি গেয়ে মন যে আনন্দে ভরে যেত, বিনা দ্বিধায় তা বলতে পারি। ক্লাস করে গান শেখবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু সেই ক্লাসগুলি আমার কাছে খুবই নির্জীব মনে হত, কোনও আনন্দ পেতাম না।

ভিন্ন পরিবেশে গানের শিক্ষা

এবারে আমি আমার জীবনে আর একটি পরিবেশের মাধ্যমে গান যে কীভাবে গলায় তুলে নিতে পেরেছি তার কথাও বলি।

বিদ্যালয়ের যুগে একদল বয়স্ক ছাত্র অতি প্রত্যুষে শালবীথি ধরে বৈতালিক গান করতেন। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে যাবার পূর্বেও ওই দলই আর একবার বৈতালিক গান গাইতেন। এখনও মনে পড়ে, প্রত্যুষে এক-একদিন গানের দল যখন শালবীথি ধরে আমাদের 'নতুনবাড়ি'র দিকে এসেছেন তখন তাঁদের সেই গান শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানায় আরাম করে আর শুয়ে থাকতে পারিনি। বিছানা থেকে এক লাফে উঠে, খালি গায়ের উপর একটি কাঁথা জড়িয়ে ছুটে চলে যেতাম সেই গানের দলে যোগদানের প্রবল উৎসাহে। সে যুগে গানের দল বৈতালিকের সময় সাধারণত গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যের গানগুলিই গাইতেন। আমি তখন তার অনেক গানই জানতাম না। কিন্তু দলের সঙ্গে গাইতে চেষ্টা করতাম। ক্রমে গানটি যখন মনে বসে যেত তখন সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে গেয়েছি। এইরূপ ঘটনা মাঝে-মাঝেই ঘটত। তখনকার ভোরের নির্জন

শান্ত পরিবেশে এ গানগুলি ওই বয়সেই আমার মনকে মোহিত করত। রাত্রির বৈতালিকে যোগ দিতে পারতাম না। কারণ, তখন আমি সারা দিনের পরিশ্রান্ত দেহে অঘোরে ঘুমাতাম। ১৯১৯ সালে যখন আমি ৯ বছরের বালক, পুজোর ছুটির পূর্বে গুরুদেব স্থির করলেন 'শারদোৎসব' নাটকটির পুনর্বার অভিনয় করাবেন। পুরনো অভিনেতাসহ নতুন যুক্ত হয়েছিলেন কয়েকজন অধ্যাপক, কর্মী এবং একদল অল্পবয়সী বালক। নাটকের বালকের দলে আমিও এবারে স্থান পেলাম। সে যুগে নাটকের মহড়া চলত বহুদিন ধরে, একটু একটু করে। 'দেহলি' ও 'নতুনবাড়ি'র দক্ষিণে অবস্থিত যে প্রাঙ্গণটি ছিল সেখানেই বিকেল থেকে 'শারদোৎসব'-এর মহড়া চলত। গুরুদেব ছিলেন 'সন্ন্যাসী'র চরিত্রে। গুরুদেব 'সন্ন্যাসী'র ভূমিকায় মহড়ার সময় নিজে যখন তাঁর গান ক'টি গাইতেন, উঁচু সুরে ভাবাবেগে, তখন তাঁর সেই গানের মাধুর্য আমাকে খুবই মুগ্ধ করত। তাঁর সেই গান ক'টি প্রতিদিন মহড়ার সময় শুনে শুনে আমার কণ্ঠেও বসে গিয়েছিল।

পূর্বে ১৯১৬ এবং ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর'-এর অভিনয়ের বহুদিনব্যাপী মহড়ার সময় বিদ্যালয়ের প্রায় সকলেই তা দেখতে আসতেন। আমি নিজেও আমার সেই বাল্য বয়সে দর্শক হিসাবে সেখানে উপস্থিত না থেকে পারতাম না। সেই সময়ে নাটকের গানগুলি প্রতিদিন শুনতে শুনতে তার প্রায় সব গানই নিখুঁতভাবে কণ্ঠে ধরে রাখতে পেরেছিলাম। 'নতুনবাড়ি'র সামনের প্রাঙ্গণের উত্তরপশ্চিম কোণে একটি বড় জামগাছ ছিল ছড়ানো ডালপালা নিয়ে। এই গাছটির একটি বড় ডালে 'বীথিকা' ঘরের বড় ছেলেরা একটি দোলনা বেঁধেছিলেন। তাঁরা সময় পেলেই দোলনাটিতে দুলতেন। 'ফাল্গুনী' নাটকটির অভিনয়ের পরে, এক ছুটির দিন সকালে দোলনায় আপন মনে দুলতে দুলতে আমি গলা ছেড়ে গাইছিলাম, 'ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া' গানটি। এর কারণ হল, শান্তিনিকেতনে এই নাটকটির প্রথম অভিনয়ের সময় সে যুগের 'নাট্যঘর'-এর মঞ্চে দুটি দোলনা বাঁধা হয়েছিল। তাতে বসে দুলতে দুলতে সে যুগের দু'জন অল্পবয়সী ছাত্র গানটি গেয়েছিল। নাটকটির মহড়ার সময় গানটির সুর ক্রমান্বয়ে শুনে তার সুর এবং কথা বেশ ভালভাবে মনে গেঁথে গিয়েছিল। দোলনায় দোলবার সময় 'ফাল্গুনী'র ওই গানটির কথা মনে করে সেদিন আমি দোলনায় দাঁড়িয়ে দোলবার সময় গলা ছেড়ে গাইছিলাম। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি গুরুদেব 'দেহলি' বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আমার গান শুনছেন। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে, লজ্জায় গান আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। দোলনা থেকে লাফিয়ে পড়ে এক দৌড়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ি। পরে বাবা এবং দিনুবাবুর কাছে শুনেছিলাম, ওইভাবে দোলনায় দোলা অবস্থায় আমার গানটি শুনতে তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল। ওই গানটি কিন্তু আমি তখনও পর্যন্ত কারও কাছে শিখিনি। প্রতিদিন মহড়ার সময় গানটি শুনে শুনে আপনা থেকেই শিখে ফেলেছিলাম।

এইভাবে এখানকার আশ্রমবাসীদের গানের মাধ্যমে অভিষিক্ত করবার যে কার্যসূচি গুরুদেব গ্রহণ করেছিলেন তার দ্বারা আমি যে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছিলাম সে কথা বলতে আজ আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই।

রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে গবেষকদের মতো বিশ্লেষণমূলক আলোচনার পথে আমি যাব না; তাঁর গানের ভাব, ভাষা, নানাপ্রকার হৃদয়াবেগ, সুর, তাল প্রভৃতি নিয়ে বহুরকমের আলোচনা আমরা অনেকেই এ পর্যন্ত করেছি। সে দিকে না গিয়ে, আমি গুরুদেবের গান সম্পর্কে কয়েকটি মতামতের উত্তরে আমার মতামত আজ পেশ করছি। মুখে বা পত্রে প্রায়ই আমাকে এ গান সম্পর্কিত নানারূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়া, মাঝে মাঝে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় গুরুদেবের

গান সম্পর্কে এমন কিছু মতামত চোখে পড়েছে, যাকে আমি তর্কাতীত বলে মনে করি না। তার থেকেই কিছু বেছে নিয়ে, সে বিষয়ে আমি যা বুঝেছি তাই বলব বলে স্থির করেছি। আমার বক্তব্য একটি ধারায় নিবদ্ধ নয়। খণ্ডিতভাবে একটির পর একটির উত্তর মাত্র।

গুরুদেবের গানের মূল ভিত্তিটি কী ? গুরুদেবের গানের মূল ভিত্তিটি রচিত হয়েছিল নিজের দেশের কতকগুলি গানের রচনাশৈলীর সম্মিলনে, যার প্রভাবের আওতায় তাঁর বাল্য ও কৈশোরের সংগীতজীবন অতিবাহিত হয়। যেমন, হিন্দি ও বাংলা ধ্রুপদ সংগীত, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা ভাষায় নানাপ্রকার লৌকিক সংগীত, থিয়েটারের গান, যাত্রা গান, সহজ কীর্তন অঙ্গের গান এবং বাংলার লোকসংগীত। এই ক'টি সংগীতধারা তাঁর গানের বিচিত্র বহুবিধ ভাবের সঙ্গে মিলেমিশে একটি স্বতন্ত্র সংগীতধারায় পরিণত হবার সুযোগ পেয়েছিল। য়ুরোপীয় সংগীতের প্রভাব যে একেবারে পড়েনি তা নয়।

বলা হয়, গুরুদেব উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুদৃঢ় নিয়মকানুনকে সাহসের সঙ্গে ছিন্ন করেছিলেন নিজের গান রচনায়, বিশেষ করে রাগরাগিণীর ব্যবহারের সময়। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সংগীত নাকি স্থিতিশীলতার অনুরাগী। পরিবর্তনশীলতার পথ সে গ্রহণ করতে চায়নি। এ কথা যে কতখানি সত্য তার বিচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

যুগে যুগে উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীত কীভাবে নিজেকে নব নব রূপে সাজাতে সাজাতে এগিয়ে চলেছিল, তার সঠিক ইতিহাস অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেমন, প্রাচীন ভারতীয় একটি সংগীতধারা দু ভাগে যখন বিচ্ছিন্ন হল, তখন তার এক ভাগকে বলা হয় উচ্চাঙ্গের উত্তর ভারতীয় সংগীত, দক্ষিণ ভারতে অন্য ভাগটির নাম হল কর্ণাটি সংগীত। মধ্যযুগের ধ্রুপদ গানের পর দেখা দিল, একে একে খ্যাল, টপ্পা, টপ্ খেয়াল ও ঠুংরি গানের ধারা। এ ছাড়া, এইসব গানের প্রভাবে রচিত হল প্রায় প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় বহু গান। এইসব গানের সঙ্গে যুক্ত বহু প্রকার মিশ্র রাগরাগিণীও যে উদ্ভব হয়েছিল, তার কথা যাঁরা রাগরাগিণী সম্পর্কে কিছু খবর রাখেন তাঁরা সকলেই জানেন।

গুরুদেবের গানে মিশ্র রাগরাগিণীর প্রয়োগ

উনবিংশ শতকে বাংলা গানের অন্যতম দিকপাল রামনিধি গুপ্ত, দাশরথি রায় ও গোপাল উড়ে তাঁদের গানে উচাঙ্গ হিন্দি গান থেকে রাগরাগিণীর সাহায্য যেমন নিয়েছিলেন, তেমনই মিশ্র রাগরাগিণীর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ তাঁরা প্রচুর করেছিলেন নিজেদের গানে পছন্দমতো। রাগরাগিণীর এইরূপ মিশ্র পরিবেশের মধ্যেই গুরুদেবের বাল্য ও কৈশোরজীবন জড়িত থাকায়, তার প্রভাবে পরবর্তী জীবনে যখন গান রচনা করেছিলেন, তখন তাঁর গানে মিশ্র রাগরাগিণীর প্রয়োগ অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল। মিশ্রণের জন্য জোর করে তাঁকে কিছু করতে হয়নি।

গুরুদেবের গানে গায়কের স্বাধীনতা

একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি সমালোচনাকালে বলেছেন, গুরুদেব তাঁর গানের সুর ও তালে গায়কের নিজস্ব স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। হিন্দি খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরি এবং বাংলা টপ্পা, টপ্ খেয়াল, কীর্তন ও লোকসংগীতের ক্ষেত্রে যেরূপ স্বাধীনতা গায়কেরা গ্রহণ করেন, গুরুদেব তাঁর গানের ক্ষেত্রে তা চাইতেন না। তাঁর এই কঠোর মনোভাবের কারণ হল তিনি য়ুরোপীয় কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের সংগীতকারগণ খুব আঁটঘাট বেঁধেই কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের স্বরলিপি করে থাকেন। গায়ক ও বাদকদের তাকে হুবহু অনুসরণ করাই হল সে দেশের সংগীতের

রীতি। গুরুদেবের নিজের গানের ক্ষেত্রে গায়কের স্বাধীনতা হরণ সম্পর্কিত সমালোচকের এইরূপ সিদ্ধান্তকে আমি সঠিক বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তার কারণ কী তা বুঝিয়ে বলি।

মধ্যযুগে মুসলমানদের রাজত্বকালে যখন উত্তর ভারতে ধ্রুপদ সংগীতের প্রচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন দেখা যায় যাঁরা ধ্রুপদ সংগীত রচনা করতেন তাঁরা তাঁদের গানের কথার সঙ্গে মিলিয়ে সুর ও তালকে খুবই আঁটসাট করে বেঁধে দিতেন। গাইবার সময় কথার সঙ্গে সুর ও তালে নিবদ্ধ গানের পরিবর্তন করা গায়কের পক্ষে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। গানের কথার সঙ্গে যুক্ত সুরের কোনওপ্রকার সুরালঙ্কার প্রয়োগের স্বাধীনতা রচয়িতারা দিতেন না। মূল গানের সুর তালের কোনওরূপ পরিবর্তন না করে, যুগ যুগ ধরে ধ্রুপদ গানের গায়কেরা তা গেয়ে এসেছেন। আমরা জানি, বাল্য ও কৈশোরে গুরুদেবের বাড়ির গানের প্রধান আবহাওয়া ছিল ধ্রুপদ গানের। ধ্রুপদ গানের প্রখ্যাত গায়কেরা বাড়ির ছেলেমেয়েদের ধ্রুপদী গানের আদলে গলা তৈরি করিয়ে গান শেখাতেন। বাড়ির উপাসনার প্রয়োজনে গুরুদেবের অগ্রজরা হিন্দি ধ্রুপদ গানের অনুসরণে গান রচনা করতেন, যাকে বলা হয় হিন্দি ভাঙা ব্রহ্মসংগীত। সুতরাং এইসব গান রচিত ও গীত হত হিন্দি ধ্রুপদ গানের ঢঙে। হিন্দি ধ্রুপদ-ভাঙা বাংলা গানগুলিতে গায়কের নিজস্ব কোনওপ্রকার সুর বা অলঙ্কার প্রয়োগের স্বাধীনতা থাকত না। গুরুদেব যখন থেকে গান রচনা শুরু করলেন তখন তাতে ধ্রুপদ গানের চার কলির ঢঙে কথা, সুর ও তালের গঠনরীতির পদ্ধতিকেই নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেন। এই কারণে তাঁর সবরকম গানের ক্ষেত্রে গায়ককে নিজস্ব সুরালঙ্কার প্রয়োগের স্বাধীনতা তিনি দিতে চাইলেন না। আমার সুদৃঢ় মত হল, তাঁর গানের ক্ষেত্রে গায়কের স্বাধীনতা হরণের একমাত্র কারণ হল, ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের প্রভাব—য়ুরোপীয় সংগীত নয়।

গুরুদেব য়ুরোপীয় সুর ও ছন্দের অনুসরণে বাংলা কথা বসিয়ে কিছু গান রচনা করে গেছেন এবং ভারতের কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গানের অনুকরণেও তিনি অল্প কিছু গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পর্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যার গান রচনা করেছিলেন হিন্দি ধ্রুপদ গানের সাহায্যে। কিছু খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরির মতো গানও পাওয়া যায়। হিন্দি ভাঙা এই গানের আলোচনাকালে, আমরা অন্যান্য গানের সঙ্গে এগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেবার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু এইসব গানকে গুরুদেবের অন্য গানের মতো সার্থক নিজস্ব সৃষ্টির পর্যায়ে স্থান দেবার পক্ষপাতী আমি নই। এ গানগুলিকে পরীক্ষামূলক রচনার দলে আমি রাখব। এসব গানে গুরুদেব দিয়েছেন কেবলমাত্র কথা। তার সুর ও ছন্দ বা তালগুলি পুরোপুরি অন্যের। সুতরাং এতে গুরুদেবের নিজস্ব সৃষ্টির প্রকাশ সম্পূর্ণ নয়— খণ্ডিত। কিন্তু তাঁর অনেক ভাঙা গানে অমূল্য কথার সম্পদ যুক্ত হয়ে সেগুলিকে বিশেষ এক মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে।

ভারতীয় উচ্চ-নীচ নানা স্তরের গানের ছন্দ ও লয়কে গুরুদেব যে-ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, তাঁর নানাপ্রকার আবেগের গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এই প্রকার ছন্দ-বৈচিত্র্যের প্রয়োগের পরিচয় এ যুগের আর কোনও গানের রচয়িতার মধ্যে পাওয়া যায় না। উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান থেকে শুরু করে বাংলার নানাপ্রকার লৌকিক গান ও লোকসঙ্গীতের বহুপ্রকার তালের ছন্দ তাঁর গানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিপুল ছন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য তাঁর গানগুলি অনন্য।

গুরুদেবের গান গাইবার অধিকার

গুরুদেবের গান গাইবার অধিকার নিয়ে নানা তর্ক প্রায়ই ওঠে। অনেকেই মনে করেন, অন্য গানের শিল্পীরা যত বড়ই শিল্পী হোন না কেন, গুরুদেবের গান গাইবার উপযুক্ত তাঁরা কখনই হতে পারেন না। কারণ তাঁদের কণ্ঠ গুরুদেবের গান গাইবার জন্য তৈরি নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ মতের সমর্থক একেবারেই নই। কেন নই তা বুঝিয়ে বলছি। সকলেই জানেন যে, গুরুদেবের

বাল্যজীবনে কণ্ঠ তৈরি হয়েছিল উনবিংশ শতকের খ্যাতনামা ধ্রুপদ গানের গুরুর দ্বারা। একই সময় দেখা যায়, তিনি তাঁর পিতার ভৃত্য, পাঁচালি গানের গায়ক কিশোরীর কাছে পাঁচালি গান শিখে তা ভাল করেই গাইতে পারতেন বলে কিশোরী গর্ব বোধ করতেন। বাড়িতে গুরুদেবের অগ্রজরা একবার শখের নাট্যশালাসমিতি গঠন করেছিলেন। সেখানে তাঁরা নানা নাট্যকারের নাটকের অভিনয় করতেন, তাঁর গানও গাইতেন। গোপাল উড়ের যাত্রাও হত,— সেই যাত্রার গানও তাঁরা গাইতেন। গুরুদেবও সেইসব গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁর বাল্যজীবনে। তাঁর এক অগ্রজ, সে যুগের কলকাতার নানাপ্রকার লৌকিক গান জানতেন এবং তা গেয়ে শোনাতেন বাড়ির সকলকে। গুরুদেবের বাড়ির বন্ধু ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। গুরুদেব বলেছেন— 'বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন।' বাড়ির ছেলেমেয়েরা সে গান তাঁর কাছে শিখে যে গাইতে পারতেন, তার পরিচয় পাই, গুরুদেবেরই নিকট আত্মীয়-আত্মীয়াদের স্বরলিপি পুস্তক থেকে। অল্পবয়সে গুরুদেব, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভৃত্য চিন্তের মুখে মধুকানের গান চুপ করে শুনতেন। ১৭ বছর বয়সে গুরুদেব যখন প্রথম ইংলন্ড ভ্রমণে গিয়ে প্রায় বছর দেড়েক সে দেশে বাস করেছিলেন, তখন তিনি নিয়মিত ইংরেজি ভাষায় কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারেই করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে সে গান শুনে ইংরেজ শ্রোতারাও তাঁর প্রশংসা করতেন। দেশে ফিরে আসার পর, তাঁর কণ্ঠে সে গান শুনে, তাঁর স্বজনরা তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন— 'রবির গলা এমন বদল হইল কেন,— কেমন যেন বিদেশি রকমের মজার রকমের হইয়াছে।' এর কারণ তিনি সেই গানগুলি গাইতেন ইংরেজদের কণ্ঠের মতো গলার স্বরের আদলে। মধ্যজীবনের প্রারম্ভে তিনি যখন শিলাইদহে বাস করতেন, তখন সেখানকার বাউল-ফকির ও বৈরাগীদের কণ্ঠের গান শুনে খুবই আকৃষ্ট হন। সে গান তিনি শিখেছিলেন এবং নিজে গাইতেও পারতেন।

কারুর গান শুনে, নিজের গলায় তা অতি সহজেই তুলে নেবার ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন— 'শিশুকাল হইতে অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ... সেজদাদা বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতেন, তাহারই দুই-একটি পদ আমি যাহা শুনিয়া শিখিতাম তাহাও কোনও কোনও দিন গলা ছাড়িয়া দিয়া মাকে শুনাইতাম।'

এই তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, গায়ক হিসাবে বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নানাপ্রকার কণ্ঠস্বরে গীত গানের সঙ্গে তাঁর গানের কণ্ঠ যুক্ত হয়েছিল। এই কারণে, তাঁর নিজের গান তিনি যখন গেয়েছেন, তখন তাকে কি 'রাবীন্দ্রিক' কণ্ঠের গান নয় বলতে পারব ? আসলে তাঁর গানের গলা তৈরি হয়েছিল, শিশুকাল থেকে নানা প্রকৃতির গায়কদের গলার গান শুনে ও শিখে।

ভিন্ন গানের গায়কদের কণ্ঠ গুরুদেবের গান গাইবার উপযুক্ত নয় বলে যে কথা প্রায়ই শোনা যায় সেই প্রসঙ্গে গুরুদেবের কার্যাবলীর কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করছি। আমার শান্তিনিকেতন-জীবনে দেখেছি, অন্য প্রদেশবাসী এবং বিদেশি গায়কেরা এসে যখন গুরুদেবের গান শিখতেন এবং সকলের সামনে গাইতেন, তখন তাঁদের কণ্ঠে সুরপ্রয়োগের ঢঙে পার্থক্য দেখা দিত, গানের সব কথারও যথাযথ উচ্চারণ তাঁরা করতে পারতেন না। গুরুদেব এর জন্য তাঁদের কখনও তাঁর গান শিখতে বা গাইতে নিষেধ করতেন না, বরঞ্চ উৎসাহই দিতেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। বাঙালিরা প্রায় দু-শতাব্দী যাবৎ নানা স্তরের হিন্দি গান গেয়ে আসছেন। তাঁরা কি সকলেই পেরেছেন হুবহু হিন্দিভাষী বা ব্রজভাষী গায়ক-গায়িকাদের মতো নিখুঁত বাচনভঙ্গিতে সে সব গান গাইতে ? তাঁদের গানে বাংলা উচ্চারণের ছাপ প্রায় কি পড়েনি ? কিন্তু তার জন্য হিন্দিভাষী বা ব্রজবাসীরা তাঁদের সে সব গান গাইতে তো মানা করেননি, নিরুৎসাহিতও করেননি। এভাবে আমরা যদি বিচার করি, তা হলে অন্য গানের শিল্পীরা যখন গুরুদেবের গান গাইতে চান, তখন আমরা, গুরুদেবের গানের অনুরাগীরা, তাঁদের প্রতি এতখানি স্পর্শকাতর হব কেন ?

গুরুদেবের গানের ভাবসম্পদ

একজন সমালোচক লিখছেন— 'রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান আছে যা একই সঙ্গে একাধিক ভাবকে ছুঁয়ে যায়। পূজা পর্যায়ের অনেক গান স্বচ্ছন্দে প্রেমের গান বলে শনাক্ত হতে পারে, তেমনই অনেক প্রেমের গান স্পর্শ করতে চায় পূজা পর্যায়কে।' এখানে তিনি [সমালোচক] প্রেমের গান বলতে বোধ হয় লৌকিক প্রেমের গানের কথাই বলছেন। এই বাক্যটি এদিক থেকে যথার্থ বলেই আমি মনে করি। কিন্তু 'একই সঙ্গে একাধিক ভাবকে ছুঁয়ে যায়' বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা সুস্পষ্ট নয়। পূজা ও প্রেম পর্যায় সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে কোনও মতভেদ নেই। তবে প্রেম ভাব অন্য আর কোনও ভাব সম্পর্কে যদি কিছু ভেবে থাকেন তা হলে তাঁর সঙ্গে আমার মতান্তর অবশ্যই ঘটবে। আমার মতে, একমাত্র প্রেমের ভাবই গুরুদেবের সবক'টি পর্যায়ের গানে স্থান পেয়েছে। সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের অর্থ করা যায় একই গান থেকে, তা কখনও ঘটেনি। বিষয়টিকে নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই।

নানারূপ প্রেম বা ভালবাসার আকৃতি আমাদের দেশের যাবতীয় ভক্তিমার্গের সাধকদের গানে মুখ্য স্থান নিয়েছিল। আবার লৌকিক প্রেমের গানও ভারতের নানাস্তরের মানবসমাজে প্রচুর রচিত হয়েছে। ঈশ্বর বা দেবদেবীকে নিয়ে যে-প্রেম বা ভালবাসার আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, ভক্তিমার্গের সাধকদের গানে, তাকে ধর্ম বা পূজা পর্যায়ের দলে স্থান দিলেও, তা কি মানবিক প্রেমের রূপ ও রসের মতো এক সুরে বাঁধা নয়? এভাবে বিচার করে দেখলে, পূজা পর্যায় ও লৌকিক প্রেমের গানের মূল আবেদনের মধ্যে পার্থক্য কোথাও নেই। সেইরূপ গুরুদেবের পূজা পর্যায়ের গানেও তিনি যাকে উদ্দেশ করে প্রেম নিবেদন করে গেছেন, তার সঙ্গে মানবিক অর্থাৎ লৌকিক প্রেমের আবেগের রূপ ও রস যদি এক হয়, তবে তাতে বিরোধ কোথায়? গুরুদেবের পূজা পর্যায়ের গানের মধ্যে এমন সব প্রেমের কথা আছে, যাকে মানবিক প্রেমের গান হিসাবে ব্যবহার করতে কোনও বাধা দেখা দেয় না। সেই কারণেই বোধ হয়, চলচ্চিত্রের পরিচালকগণ গুরুদেবের পূজা পর্যায়ের গানকে তাঁদের গল্পে মানবিক প্রেমের গানরূপে ব্যবহার করতে কখনও দ্বিধা করেননি।

গুরুদেবের গানে ঋতু, স্বদেশ, বিচিত্র পর্যায়ের অনেক গানে প্রেমের আবেগ খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বর্ষা এবং বসন্ত ঋতুর গানের তো কথাই নেই। গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত ঋতুও বাদ যাবে না। শীত ঋতুকে নিয়ে গান রচনা এবং প্রেমের আবেগকে স্থান দেবার রেওয়াজ আমাদের দেশের কোনও ভাষার গানে আছে বলে জানা যায় না। গুরুদেব কিন্তু তাঁর শীত ঋতুর গানে প্রেমের কথাকে বাদ দেননি। তাতেও তিনি প্রেম নিবেদনের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে গেছেন। যেমন, 'শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে' গানটি। গানের সঞ্চারী কলিতে বলছেন— 'শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা/ তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।' শীত ঋতুর কঠোরতার মধ্যে বিরহ-বেদনাকে অল্প কথায় তিনি কতখানি মধুর আবেগে বলে গেলেন। বিচিত্র পর্যায়ের দু-একটি গানকে এভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেষ্টা করব যে গুরুদেবের প্রেমসাধনা কতখানি ব্যাপক ছিল। 'গ্রাম-ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' গানটির দ্বারা তিনি গ্রামের একটি রাঙা মাটির পথের প্রতি কতখানি গভীর আবেগে যে প্রেম নিবেদন করেছেন তা বুঝিয়ে বলা প্রায় অসম্ভব। ভারতের আর কোনও গীতকার কবি এভাবে পল্লীগ্রামের রাঙামাটির পথকে এতখানি গভীরভাবে ভালবাসতে পেরেছিলেন কিনা, জানি না। 'এই তো ভালো লেগেছিল' গানটির কথাই ভাবুন। এ গানটিতে গ্রামের শালবনের খ্যাপা হাওয়া, রাঙামাটির পথ, হাটের পথিক, ছোটমেয়ের ধুলোয় বসে খেলা, ধরণীর মাটি, গ্রামের আকাশ, সজনে ফুল প্রভৃতি সবকিছুই তাঁর মনকে মাতিয়েছে, ভুলিয়েছে, বেঁধেছে, মনের মধ্যে বীণার সুর তুলেছে। সর্বত্রগামী এক প্রেমের বাঁধনে বাঁধা না পড়লে কি এ সবের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ এভাবে দেখা দিত? একই প্রেমের আন্তরিক প্রকাশ নানাভাবে আমরা দেখি, তাঁর পূজা প্রেম প্রকৃতি স্বদেশ প্রভৃতি সব পর্যায়ের গানে।

গুরুদেবের গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম

কিছুকাল আগে গুরুদেবের গানে হারমোনিয়ম যন্ত্রটির ব্যবহার নিয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ও মিউজিক বোর্ড এক তর্কের সৃষ্টি করেছেন।

কথা উঠেছে যে, কেবলমাত্র এস্রাজ ও তানপুরার সাহায্যেই গুরুদেবের গান গাওয়া উচিত— গুরুদেব নাকি তাই চেয়েছিলেন। কারণ, ১৯২২ সাল থেকে, অর্থাৎ বিশ্বভারতীর যুগ থেকে, হারমোনিয়ম যন্ত্রটির ব্যবহার গুরুদেব শান্তিনিকেতনে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, বেতারকেন্দ্র ১৯৪০ সালে ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজানো বন্ধ করবার পক্ষে গুরুদেবের মতামত যখন চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁদের ইচ্ছার সমর্থনে একটি চিঠিও লেখেন। এই দুটি নিদর্শনের কারণে, বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে উৎসাহিত করা হয়েছে গুরুদেবের গানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য। তাঁকে বলা হয়েছে, বিশেষ করে, আকাশবাণী ও দূরদর্শন এবং ক্যাসেটে গুরুদেবের গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম যন্ত্রটি যাতে না বাজে, তার নির্দেশ দেবার জন্য। কেবল এস্রাজ ও তানপুরার সঙ্গে যেন গান গাওয়া হয়।

১৯৪০ সালে আকাশবাণীকে লেখা গুরুদেবের চিঠিটি কিন্তু গুরুদেব নিজে থেকে আকাশবাণীর কাছে পাঠাননি। তাঁকে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেছিলেন, ওই প্রকার একটি চিঠি দিয়ে—তাঁরা যে আকাশবাণী থেকে ভারতের যাবতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজানো বন্ধ করতে চান, তার সমর্থন করতে। গুরুদেব তাঁদের সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর এই ২০ বছরের যুগে (১৯২২ থেকে ১৯৪০) রেকর্ড কোম্পানিতে তাঁর গানের সঙ্গে যখন হারমোনিয়ম, পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্র একটানা বেজেছে তখন গুরুদেব তাতে কোনও আপত্তি তোলেননি। সবক'টি রেকর্ডই তাঁর কাছ থেকে প্রচারের অনুমতি পেয়েছে। অনাদি দস্তিদার ১৯২৫ সালে তাঁর কাছে যখন সার্টিফিকেট চাইলেন, তখন খুশি হয়ে গুরুদেব তাঁকে লিখলেন— 'He also knows to play on the harmonium'।

এ ছাড়া দিনেন্দ্রনাথ যখন বাইরের সঙ্গীতশিল্পীদের দিয়ে গুরুদেবের গানের অনুষ্ঠান করিয়েছেন বা শিখিয়েছেন, তখন তিনি হারমোনিয়মই ব্যবহার করেছেন, —ইন্দিরা দেবীও তা করতেন। গুরুদেব কিন্তু তাঁদের কখনও বলেননি, হারমোনিয়ম যন্ত্রটি বন্ধ রাখতে। গুরুদেবের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তীতে দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাদেবীর পরিচালনায় সেই বিরাট গানের আসরে, গুরুদেবের উপস্থিতিতে তাঁর গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়েছিল। গুরুদেব তখনও তাঁদের বারণ করেননি। শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁর গানের ক্ষেত্রে কোথাও হারমোনিয়ম ব্যবহার করতে বারণ করলেন না। কেন তা করলেন না ? তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তা না হলে এক ক্ষেত্রে এক নীতি চালু করে, অন্য ক্ষেত্রে তার বিপরীত কাজ তিনি কখনই করতে পারতেন না।

একসময় আমি নিজেও এস্রাজ বাজিয়েছি। আমার একটা মাঝারি সাইজের এস্রাজ ছিল। কিন্তু নিজে এস্রাজ বাজিয়ে আসরে গান করা কোনও শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তানপুরা এস্রাজে তাড়াতাড়ি স্কেল পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়। গুরুদেবের গানের ব্যাপক প্রসারের ফলে হারমোনিয়ম যন্ত্রটি আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে— বিশেষ করে শান্তিনিকেতন ও কলকাতার বাইরে, যেখানে এস্রাজ-সহযোগী সহজলভ্য নয় ; বিভিন্ন স্কেলের জন্যে একাধিক তানপুরা বহন করাও সম্ভব নয়।

গুরুদেব-পরিচালিত সংগীতানুষ্ঠানে যন্ত্রানুষঙ্গ

গুরুদেবের গানের সঙ্গে কোন যন্ত্র বাজানো উচিত বা অনুচিত, এ বিষয়ে গুরুদেব নিজে কোনও নির্দেশ লিখিতভাবে বা মৌখিক কাউকেই কখনও দিয়ে যাননি। আকাশবাণীতে হারমোনিয়ম বাজানো বন্ধ করবার আন্দোলনের সমর্থনে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে কিন্তু পরিবর্তে আর কোন যন্ত্র

বাজবে তার কোনও নির্দেশ নেই। এস্রাজ ও তানপুরা তো নয়ই। গুরুদেব যেমন এ বিষয়ে কিছু বললেন না, দিনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীও কেবল তানপুরা ও এস্রাজের বিষয়ে একটি কথাও বলেননি। গুরুদেবের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত গুরুদেব-পরিচালিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে বা নাট্যানুষ্ঠানের গানের সঙ্গে কখনও তানপুরা বাজেনি। বলা হয়ে থাকে, সেতার বা বেহালা গুরুদেবের গানের সঙ্গে বাজানো, গুরুদেব নাকি একেবারেই পছন্দ করতেন না। এ মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বেহালা যন্ত্রটি বিদ্যালয়ের যুগ থেকে ১৯৩৪/৩৫ সাল পর্যন্ত উপযুক্ত বাজিয়ে যখনই পাওয়া গেছে তখনই তাঁকে কাজে লাগানো হয়েছে। গুরুদেবের পরিচালনায় গানের অনুষ্ঠানে সেতারও বাজানো হয়েছে।

হারমোনিয়ম সহযোগে গুরুদেবের গান

ডঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে গুরুদেবের গানের শিল্পীদের রেকর্ডের গানের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা করেছিলেন। রেকর্ডগুলির গায়ে লেখা থাকত সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তাঁর নাম। তাঁর পরিচালিত ওই গানগুলির কোনটিই তিনি কেবল তানপুরা ও এস্রাজ দিয়ে গাওয়াননি! হারমোনিয়ামসহ আরও কতকগুলি যন্ত্র তিনি তার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা গুরুদেবের গানের শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত, তাঁরা সকলেই রেকর্ডে, বেতারে এবং গানের আসরে গান গাইছেন, গান শেখাচ্ছেন হারমোনিয়ম বাজিয়ে। কয়েকবছর পূর্বে, গুরুদেবের গানের প্রখ্যাত গায়ক সুবিনয় রায় কলকাতার রবীন্দ্রসদনের এক অনুষ্ঠানে গান করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হারমোনিয়মই বাজিয়েছিলেন। সেদিন শ্রীরায়ের ঠিক ডান পাশে, মঞ্চে বসে শৈলজারঞ্জন মজুমদার আগাগোড়া হারমোনিয়মের সঙ্গে এস্রাজ বাজিয়েছেন। সেতার, পিয়ানো, বেহালাও গুরুদেব-পরিচালিত গানের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যন্ত্রীরা তাঁর উপস্থিতিতেই বাজিয়েছেন— এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

বাদক দক্ষ হলে গুরুদেবের গানের সঙ্গে যে-কোনও তালবাদ্য চলবে

গুরুদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরে গুরুদেবের গানের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে, রেকর্ডে, বেতারে, দূরদর্শনে— সর্বত্রই গুরুদেবের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ, তবলা ও খোল যন্ত্রটির ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট একটি প্রথা চালু হয়েছে। যেমন, গুরুদেবের ধ্রুপদাঙ্গ গম্ভীর প্রকৃতির গানগুলির সঙ্গে বাজবে পাখোয়াজ। তবলা বাজবে ত্রিতাল, একতাল, তেওড়া, দাদরা ও কাহারবা প্রভৃতি তালে রচিত গানগুলির সঙ্গে। বাউল ও কীর্তন সুরের গানে বাজবে খোল। উচ্চাঙ্গ হিন্দি রাগরাগিণীতে রচিত গুরুদেবের সহজ সরল তিন মাত্রিক ও চার মাত্রিক এবং অসম মাত্রিক গানের সঙ্গে খোলের সঙ্গতের প্রচলনও দেখা যায়। এইভাবে গুরুদেবের গানের সঙ্গে তালবাদ্যের ব্যবহারের এইপ্রকার একটি রীতি দেখা দিয়েছে। তালবাদ্য ব্যবহারের এইরূপ রীতির প্রচলন এ যুগে কেন হল এবং কীভাবে হল, তা বলতে পারব না। তালবাদ্য ব্যবহারের এই নিয়মাবদ্ধ রীতির প্রচলন সঙ্গত কিনা, তাও আমি বলব না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, একই তালযন্ত্রে গুরুদেবের নানা প্রকৃতির ছন্দের গানে যদি সঙ্গত করা হয়, তাতে বাধা কোথায়? ধ্রুপদী গানে পাখোয়াজ অবশ্যই সংগত বাদ্য বলে ধরব। কিন্তু তবলা ও খোলে যদি একই তাল গুরুদেবের গানে বাজে, তবে তাকে রীতিবিরুদ্ধ বলব কেন? লোকসঙ্গীতের সুর ও ছন্দের গানে যদি কেউ তবলা ও পাখোয়াজ বাজাতে চান, তাতেই

বা বাধা কোথায় : পাখোয়াজ, তবলা ও খোল নামক তালবাদ্য তিনটিই তাল ছন্দের দিক থেকে বিচিত্র গুণের আধার। গুরুগম্ভীর তালের নানা ছন্দ থেকে শুরু করে, অতি হালকা ছন্দের নানা তালের প্রকাশের ক্ষমতা এই তিনটি যন্ত্রেরই আছে। সুতরাং দক্ষ বাজিয়ে যদি গানের চরিত্র *অনুধাবন করে তালযন্ত্রে অনুকূল তালের ছন্দ ব্যবহার করেন, তা হলে গানটি সর্বাঙ্গীণ মাধুর্যে নিশ্চয়ই নিজেকে বিকশিত করতে পারবে। এই কারণে আমি মনে করি, গুরুদেবের যে-কোনও গানের সঙ্গে,* যে-কোনও তালবাদ্যই ব্যবহৃত হতে পারে, যদি তার বাদক প্রতিটি গানের ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত ছন্দ ও লয়কে ঠিকমত অনুধাবন করতে সক্ষম হন। আমার এই ধারণা গড়ে উঠেছে, গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁদের দ্বারা পরিচালিত গুরুদেবের গানের নানা উপলক্ষে ঘনিষ্ঠভাবে প্রায় ২৫ বছর যুক্ত থাকার সুযোগে অর্থাৎ গুরুদেবের গানে তালবাদ্যকে কী ভাবে তাঁরা ব্যবহার করে গেছেন তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং যোগের দ্বারা।

গুরুদেবের সময়ে কীর্তনাঙ্গ গানের সঙ্গেও তবলা বেজেছে

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পূর্বে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের যুগে, গুরুদেবের গান নিয়মিত শেখানো হত— নানা উপলক্ষে তা সকলকে গাইতেও হত। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে বহু বৎসর, শান্তিনিকেতনে তালবাদ্যের কোনও যন্ত্রী ছিলেন না। গান হত তালবাদ্যের সঙ্গত ছাড়া। দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি যখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মরাঠি গায়ক ও বাদক ভীমরাও শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হলেন, তখন তবলা ও পাখোয়াজের সঙ্গত গুরুদেবের গানের সঙ্গেও যুক্ত হল। কারণ, ভীমরাও শাস্ত্রী উচ্চাঙ্গ হিন্দি কণ্ঠসঙ্গীতের শিক্ষকতার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পাখোয়াজ ও তবলাবাদ্যে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি একটানা প্রায় ১৪ বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন, গুরুদেবের নানা পর্যায়ের গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাখোয়াজ ও তবলা নিয়মিত বাজাতেন। গুরুদেবের লোকসঙ্গীত এবং কীর্তন সুরের গানের সঙ্গেও তিনি বরাবর তবলা বাজিয়ে গেছেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন রণজিৎ সিংহ। তিনি সেতার, এস্রাজ, পাখোয়াজ ও তবলা বাদনেও নিপুণ ছিলেন। তিনি গুরুদেবের সব প্রকৃতির গানের সঙ্গে তবলা ও পাখোয়াজ বাজিয়েছেন। ভীমরাও শাস্ত্রী রণজিৎ সিংহ খোল বাজাতে জানতেন না বলে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করতেন না। রণজিৎ সিংহ তিরিশ দশকের প্রারম্ভে অসুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করবার পর পাখোয়াজ ও তবলা বাজাবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও যন্ত্রীকে নিযুক্ত করা হল না। কিছুকাল পরে সে যুগের আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী, শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী আদিত্যপুর গ্রামের শ্যাম কর্মকার নামক এক খোল বাদককে নিযুক্ত করা হয়, গানের সঙ্গে তালের সঙ্গতের জন্য। শ্যাম কর্মকার কীর্তন গানের সঙ্গে খোল বাজাতেন, তবলাও বাজাতেন গ্রামের যাত্রাদলের গানের সঙ্গে। শ্যাম কর্মকার একটানা বহু বছর সঙ্গীতভবনের খোলবাদক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই সব রকমের গানের অনুষ্ঠান, নাটক ও নৃত্যনাট্যের গানের সঙ্গে খোলেই সঙ্গত করে গেছেন। কথাকলি, মণিপুরী ও শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি নাচের তাল ও বোল তিনি শিখে নিয়ে নাচের সময়ে খোলেই তালগুলি বাজিয়ে গেছেন। এই যুগটিকে বলা চলে একমাত্র খোল বাজনার যুগ।

যন্ত্রানুষঙ্গের ক্ষেত্রে গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের কোনও বাছবিচার ছিল না

এই তিনটি মূল ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন গানে কোন যন্ত্র বাজানো উচিত বা অনুচিত এ বিষয়ে গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথ কোনওপ্রকার বাছবিচার কখনও করেননি। তাঁরা খুশি হতেন যে-কোনও বাদ্যে গানের ভাবানুযায়ী ছন্দে লয়ে গানটির সুষ্ঠু বিকাশের পরিচয়ে।

গুরুদেবের গানের সঙ্গে তালবাদ্য ব্যবহারের এইরূপ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দ্বারা এ বিষয়ে আমার মন তৈরি হয়েছিল বাল্যকাল থেকে একইভাবে, গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথ দ্বারা প্রচলিত পথে। সেই কারণেই, আমার কখনও মনে হয় না যে, গুরুদেবের গানের সঙ্গে তালবাদ্য ব্যবহারের যে-বাধ্যতামূলক রীতি ইদানীং প্রচলিত হয়েছে, তার কোনও প্রয়োজন আছে। একই তালযন্ত্রের প্রকৃত উপযুক্ত বাজিয়ের সাহায্যে তাঁর সব গানই গাওয়া চলে।

হিন্দি গান

আমার হিন্দি গানের শিক্ষা শুরু হয় আমার যখন ৫/৬ বছর বয়স। ১৯১৪ সালে বোম্বাই থেকে এসে হিন্দি গানের শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন মরাঠি ব্রাহ্মণ, ভীমরাও হসুলকর শাস্ত্রী। সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন। এখানে কাজে যোগদানের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করেছিলেন। গুরুদেবের গানও তিনি গাইতেন। গুরুদেবের যাবতীয় গানের অনুষ্ঠানেও তিনি যোগ দিতেন। তাঁর কণ্ঠে গুরুদেব হিন্দি গান শুনে, কখনও কখনও সেই সুরে বাংলা কথা বসিয়ে ভাঙা গানে পরিণত করে ভীমরাওকে দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানে গাইয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের হিন্দি গান সহজে শেখাবার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থও ভীমরাও শাস্ত্রী প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে প্রকাশ করলেন পণ্ডিত ভাতখণ্ডের দ্বারা প্রচলিত রাগরাগিণীর দশটি ঠাটের নানা তালে নিবদ্ধ সরগম— 'রাগশ্রেণী' নামে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত একটি গ্রন্থে। তাঁর সব থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল 'সঙ্গীত গীতাঞ্জলি'। গুরুদেবের 'গীতাঞ্জলি'র যাবতীয় বাংলা গান দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত করে এবং ভাতখণ্ডে-প্রবর্তিত পদ্ধতিতে স্বরলিপি করে গ্রন্থটি তিনি প্রকাশ করেন। গুরুদেব এই গ্রন্থটির প্রশংসাসূচক একটি ভূমিকা ইংরেজিতে লিখে দিয়েছিলেন, সেটি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল।

বীণা শিক্ষার প্রচলন

অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত পীঠাপুরম-এর রাজদরবারে ছিলেন প্রখ্যাত বীণাবাদক সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী। সেখানকার রাজা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেবের কাছে। ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে এসে তিনি দিনেন্দ্রনাথ ও ভীমরাও শাস্ত্রীসহ কয়েকজন বয়স্ক ছাত্রছাত্রীকে বীণা বাজাবার তালিম দিয়েছিলেন। সেই ছাত্রদলে যোগ দিয়ে আমি বীণা বাজাতে শিখেছিলাম। গুরুদেবের সহজ তালবদ্ধ গান আমি সহজেই এই যন্ত্রটিতে বাজাতে পারতাম। সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী একটানা শান্তিনিকেতনে থাকতেন না। মাঝে মাঝে দেশে ফিরে যেতেন, আবার কয়েক মাস পরে আসতেন। শেষবার গরমের ছুটির পূর্বে যখন তিনি দেশে ফিরে যান, তখন ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে গিয়ে প্রায় দু' মাস পীঠাপুরমে থেকে বীণার তালিম নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

সংস্কৃত নাটকাভিনয়

শাস্ত্রী উপাধিপ্রাপ্ত ভীমরাও-এর ছিল সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য। তিনি কয়েকবার শান্তিনিকেতনের বয়স্ক ছাত্রদের দিয়ে সংস্কৃত ভাষার কয়েকটি প্রখ্যাত নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন সে যুগের নাট্যঘরের মঞ্চে। এই নাটকগুলির ছাত্র-অভিনেতারা সংস্কৃত ভাষাকে অতি সহজেই যে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা বোঝা যেত অভিনয়কালে তাঁদের ওই ভাষার কথাবার্তায়। মনেই হত না, তাঁরা সঠিক অর্থ না বুঝে কেবল মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। সমগ্র নাটকের মহড়া ও অভিনয় দেখে আমার মতো অল্পবয়সী দর্শকরাও নাটকটির মূল বিষয় অনুধাবন করতে কোনও অসুবিধা বোধ করেনি।

শিক্ষক—ভীমরাও শাস্ত্রী

ভীমরাও শাস্ত্রী আমাদের হিন্দি গান শেখাতেন ভিন্ন রীতিতে। গুরুদেবের নির্দেশমতোই তিনি সে পথে চলেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে ছাত্রছাত্রীরা এখানে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করবার জন্যেই এসেছে। এটিই হল তাদের মুখ্য শিক্ষণীয় দিক। কিন্তু তার সঙ্গে গানকেও অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় করা হয়েছে, যাতে তারা একই সঙ্গে মনে নির্মল আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারায়, একই কারণে অন্যান্য কলার সঙ্গে এটিকেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। ভীমরাও শাস্ত্রী এখানকার সার্বিক শিক্ষার এই ধারাটিকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হিন্দি গানের শিক্ষার প্রথাটি গুরুদেবের পরামর্শমতোই, তিনি আমাদের কণ্ঠে প্রথমে প্রতিটি রাগরাগিণীর আরোহী-অবরোহী স্বর ক'টিকে ভাল করে গাইয়ে নিতেন। তার পরে শেখাতেন সেই রাগিণীরই কয়েকটি তালবদ্ধ বা ছন্দোবদ্ধ সরগম। সব শেষে শুরু করতেন, ত্রিতালে নিবদ্ধ হিন্দি গান। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি রাগরাগিণীর একটি ছাপ আমাদের মনে বসিয়ে দেওয়া হত। শেখাবার সময় গানের সামান্য সুরবিস্তার এবং সহজ কয়েকটি তানও তিনি যুক্ত করতেন। এই পদ্ধতিতে হিন্দি গান শেখার দরুন আমাদের কাছে তা কখনই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। আমাদের হিন্দি গান শিখতে ভালই লাগত। উৎসাহী কিছু ছাত্রকে তিনি তবলা বাজাবার শিক্ষাও দিতেন।

ভীমরাও শাস্ত্রী একাধারে হিন্দি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা এবং পাখোয়াজ ও তবলা বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গুরুদেবের ধ্রুপদী তালের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ ও তবলা তিনি বাজাতেন। অন্যান্য গান ও লোকসংগীতের সুর ও ছন্দে রচিত গুরুদেবের গানগুলির সঙ্গেও তিনি তবলা বাজাতেন। ১৯২৮ সালে এখানকার কাজ ত্যাগ করে তিনি বোম্বাই ফিরে যান।

গান রচনায় গুরুদেবের প্রধান সহায়

গুরুদেব যখনই কোনও নতুন গান রচনা করতেন তখনই সেটি কাউকে না শিখিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। তার কারণ হল, গানে সুরযোজনার পর অন্য কাজ বা চিন্তা অথবা লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় গানটির সুর তিনি হুবহু মনে রাখতে পারতেন না। এ বিষয়ে তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান সহায়। তাঁকে ডেকে এনে কিংবা তাঁর কাছে গিয়ে নতুন রচিত গান সঙ্গে সঙ্গেই শিখিয়ে দিতেন, সুর পরিবর্তনের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেতে। গুরুদেবের গানের একজন বিশেষজ্ঞ এ কথা স্বীকার করেননি। গুরুদেবের সুর ভুলে যাবার কথার প্রতিবাদ করে তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন— 'অনেকে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ গানের সুর ভুলে যেতেন

বলেই দ্রুত দিনেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তা জমা দিতেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দুজনের কেউই এত কম স্মৃতিধর ছিলেন না। ...আর রবীন্দ্রনাথ? দিন, মাস কেন, বছরের পর বছর কেটে গেলেও সুর বিস্মরণ ঘটেনি।' —সংগীতভবনে থাকাকালে সেই বিশেষজ্ঞের এ অভিজ্ঞতা নাকি বহুবার হয়েছে। বলছেন—'দেরাজ খুলে হয়ত বহুকাল আগের এক স্বরলিপি পেলেন, সে সুর এখন অপ্রচলিত। এখন অন্য সুরে গাওয়া হয়। প্রসঙ্গটি তুলতেই দেখা গেল—দুটি সুরেই কবি গেয়ে দিলেন গানটি। স্বরলিপি হাতে শিষ্য গুরুর পরীক্ষা নিচ্ছেন। একেবারে একশ নম্বর।'—বিশেষজ্ঞের এই উক্তির প্রতিবাদে প্রামাণ্য কতকগুলি তথ্য পেশ করছি।

আমরা জানি ১৯০৬ সালে গুরুদেব প্রথম এইচ. বসু-কৃত (হেমেন্দ্রমোহন বসু) মোমের cilinder record-এ 'বন্দেমাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন। সেই রেকর্ডটি কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত হয় এবং গানটি আকাশবাণীর মাধ্যমে দেশবাসীকে শোনানো হয়েছে। এখন সেটি যত্নের সঙ্গে রক্ষিত আছে। কিন্তু এই গানটি গাইবার বহু বৎসর পূর্বে, এই গানটিতে গুরুদেব-কর্তৃক প্রদত্ত সুরের একটি স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁদেরই পারিবারিক মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'-তে। 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাওয়ার সময় আরও কিছু গানও নাকি গুরুদেব cilinder record-এ গেয়েছিলেন, কিন্তু সে সব গানের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ১৯২৬ সালে গ্রামোফোন রেকর্ডে গুরুদেবের গানের royalty নিয়ে H.M.V. (গ্রামোফোন কোম্পানি) ও গুরুদেবের মধ্যে যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সে সময়ে কোম্পানি আরও ক'টি গান গুরুদেবকে দিয়ে গাইয়েছিল। বর্তমানে ওই গানগুলির মধ্যে গোটা নয়েক গান রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। পরে তাঁর ৭০ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে আরও অনেকগুলি গান গুরুদেবকে দিয়ে রেকর্ডে গাওয়ানো হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে, 'বন্দেমাতরম্' থেকে শুরু করে সেই পর্যন্ত যতগুলি গান গুরুদেব রেকর্ডে গেয়েছিলেন, তার কোনওটির সুরের সঙ্গে প্রামাণ্য স্বরলিপির হুবহু মিল নেই। খুঁটিনাটি সুরের পরিবর্তন প্রায় সর্বত্রই লক্ষণীয়।

সুর মনে রাখতে না পারার জন্যে গুরুদেবের পত্নী মৃণালিনী দেবী তাঁকে কীভাবে ঠাট্টা করেছিলেন এবং গুরুদেব তার উত্তরে তাঁকে কী বলেছিলেন, সেই ঘটনাটির উল্লেখ এবারে করছি।

গুরুদেব তখন সপরিবারে ছিলেন জোড়াসাঁকোয়, নিজেদের বাড়িতে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী, সে যুগে গুরুদেবের গানের প্রখ্যাত গায়িকা অমলা দেবী, সে সময়ে জোড়াসাঁকোয় এসে একটানা বেশ কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন, মৃণালিনী দেবীর অনুরোধে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে ছিল সখীসুলভ আন্তরিকতা। একদিন গুরুদেব একটি গান রচনা করে, সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন, 'অমলা, ও অমলা, শিগ্‌গির এসে শিখে নাও, এক্ষুনি ভুলে যাব কিন্তু।' গুরুদেবের কথা শুনে, মৃণালিনী দেবী হাসতে হাসতে অমলা দেবীকে বলেছিলেন— 'এমন মানুষ আর দেখেছ অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়।' গুরুদের তাঁর কথা শুনে হাসিমুখে স্ত্রীকে বলেছিলেন—'অসাধারণ মানুষদের সবই অসাধারণ হয়, ছোট বউ চিনলে না তো।'

সুর ভুলে যাবার বিষয়ে গুরুদেবের নিজের এবং আরও কয়েকজন তাঁর অত্যন্ত পরিচিতজনের প্রামাণ্য কিছু উক্তি এবারে উদ্ধৃত করছি।

১৯১৪ সালে গুরুদেব তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখছেন— 'আমার মুশকিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই। দিনু [দিনেন্দ্রনাথ] কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি।'

১৩৩৮/১৯৩১ সালে বাসন্তী দেবীকে লিখিত পত্রে গুরুদেব জানাচ্ছেন— 'আমি সুর রচনা করি, সুর ভুলি, স্বরলিপি করতে জানিনে। আমার জীবনে যত সুর বেঁধেচি তার অনেকগুলিই হয়েছে হারা—যারা শিখেচে এবং লিখেচে, আমার প্রয়োজন ঘটলে তাদের কাছ থেকেই আমার নিজের গান পুনরায় সংগ্রহ করে নিতে হয়।'

গুরুদেবের সুর ভুলে যাওয়া আর সুর-সংরক্ষণ নিয়ে গুরুদেবের পুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'Father had laid aside other work and was daily composing new songs.

আমাকে তিনি শিখিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালে 'তাসের দেশ' নাটকের অভিনয়ের প্রয়োজনে। নাটকটিতে নতুন একটি দৃশ্যের অবতারণা করে পূর্বে রচিত 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়' গানটি সেখানে যুক্ত করেন। গানটি অভিনয়ের সময় কীভাবে গাইতে হবে, তা শিখিয়ে দেবার জন্যে গুরুদেবকে অনুরোধ করি। গুরুদেব আমাকে শিখিয়ে দেন। ছাত্রীদের সেইমতো শিখিয়ে প্রতিদিন মহড়ার সময় তাদের দিয়ে গাওয়াতাম। গুরুদেব মহড়ার সময় উপস্থিত থাকতেন এবং গানগুলি শুনতেন। ওই সময়ে ইন্দিরা দেবী ক'দিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। একদিন তিনি নাটকটির পুরো মহড়া দেখেন। মহড়ার শেষে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ওই গানটি তাঁরা যে-ভাবে প্রথম শিখে গাইতেন, আমরা কিন্তু তার থেকে বেশ কিছুটা সরে গেছি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'গুরুদেব এবারের "তাদের দেশ" নাটকে গাইবার জন্যে যে-ভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা সে-ভাবেই গাইছি। সুরের পরিবর্তনের কথা আপনার নাম করে তাঁকে কী বলব ?' আমার কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'স্বয়ং গুরুদেবই যখন ওইভাবে গাইতে শিখিয়েছেন তখন এ বিষয়ে তাঁকে আর কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।'

নৃত্য-অভিনয়চর্চা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত জনসমাজে নৃত্যচর্চার প্রতি উৎসাহ দেখা দেয়। কলকাতা থেকে শুরু করে মফস্বল শহরের শিক্ষিত পরিবারের বালক-বালিকাদের মধ্যে নৃত্যশিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষিত হয়। গড়ে ওঠে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যবিভাগ এবং নৃত্যচর্চার কিছু প্রাইভেট স্কুল বা কলেজ। কিছু নৃত্যশিক্ষক বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে নৃত্যশিক্ষা দান শুরু করেন। কিন্তু এরূপ নৃত্যচর্চার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনে নৃত্যশিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয় না, দেখা দেয় মঞ্চে টিকিট কিনে বা দূরদর্শনের পর্দায় চিত্তবিনোদনমূলক নৃত্যের প্রতি আগ্রহ। এই ধরনের নৃত্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। যেমন, শেখবার জন্য টাকা, মঞ্চ ভাড়া, সাজ-পোশাকের ভাড়া এবং নানাপ্রকার যন্ত্রের যন্ত্রীদের স্বতন্ত্রভাবে পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করতে হয়। নানাপ্রকার নৃত্য প্রদর্শনের দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জনের উপযোগী নৃত্য তৈরি করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় এই ধরনের কার্যসূচিতে লোকনৃত্যের নামে একপ্রকার নাচ, যাকে লোকনৃত্য না বলে বলা উচিত আধুনিক নৃত্য। ওই নাচগুলি কোনও অঞ্চলের লোকনৃত্যের সঙ্গে হুবহু মেলে না।

ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী সমাজ প্রচলিত নানা পরব, উৎসব ও বিবাহের সময় যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে নির্মল আনন্দ উপভোগের চর্চা, বহু শতাব্দী ধরে নাচ ও গানের মাধ্যমে করে এসেছে বা এখনও করছে, এ যুগের নগর ও শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তা নেই। এ দিক থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব।

ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীসমাজে নৃত্য বংশ-পরম্পরায় বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত। উল্লেখযোগ্য, এর জন্যে গ্রামে কোনওকালে নৃত্যগীতচর্চার জন্য, এ যুগের শহর ও নগরবাসী চাকরিজীবী শিক্ষিত সমাজের ছেলেমেয়েদের মতো কোনও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় বা 'ওয়ার্কশপ'-এর প্রয়োজন কখনও হয়নি। গ্রামের অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা তাদের নানা পরব, পূজা ও বিবাহের উৎসবে বয়স্কদের নাচ দেখে, তাদের মতো নাচতে চেষ্টা করতে করতে আপনা থেকেই তারা নৃত্যগীতবাদ্যে পটু হয়ে ওঠে। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে তারা স্থান গ্রহণ করে বড়দের দলে। গ্রামে দলবদ্ধ নাচ গান ও বাজনা ভারতের সর্বত্র গ্রামবাসীদের মধ্যে এ যুগেও নানা সাজে, নানা তালে এবং নানা ঢঙে প্রচলিত। এই বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এত বৈচিত্র্যের পরিচয় পৃথিবীর আর কোনও মহাদেশে পাওয়া যায় বলে শুনিনি। এদের নৃত্যগীত বাজনার সময়

টাকা খরচ করে সাজপোশাক সংগ্রহ করতে হয় না, নাচের প্রয়োজনে তালবাদ্যের যন্ত্রীদের স্বতন্ত্রভাবে পারিশ্রমিক দিয়ে আনতে হয় না। নৃত্যগীতের উপযোগী মঞ্চ ভাড়া করা তাদের চিন্তার বাইরে। সব কিছুই তৈরি থাকে তাদের সমাজব্যবস্থায়, তাদের গ্রামেরই মধ্যে।

নৃত্য-আন্দোলনে গুরুদেবের চিন্তাধারা

বিংশ শতকের প্রারম্ভে গুরুদেব শান্তিনিকেতন বা সমগ্র বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে ধরনের নৃত্যচর্চার প্রবর্তন করে গেছেন, তা নিয়েও স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে। প্রথম হল,— এখানকার সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাধারার সঙ্গে নৃত্যগীতকে একটি অবশ্যশিক্ষণীয় এবং সম্মানজনক বিদ্যারূপে স্থান দিলেন,— শহরবাসী শিক্ষিত সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায় যার স্থান ছিল না, আজও নেই। দ্বিতীয়—এখানকার সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে নৃত্যগীতচর্চার মূল উদ্দেশ্য যা ছিল, তা হল, সকলে মিলে একসঙ্গে নৃত্যগীতের নির্মল আনন্দ উপভোগ করা। এই কারণে এখানে ধর্ম-নিরপেক্ষ এমন কতকগুলি উৎসবের প্রচলন করলেন যাতে নৃত্যগীত একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হল।

শহরের শিক্ষিত সমাজের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের বাইরে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সেখানকার নরনারীদের চিত্তবিনোদনের কারণে নাচগানের অনুষ্ঠান করে। দূরদর্শনের মাধ্যমেও তা দেখাতে হয়। সেগুলিকে এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের অঙ্গরূপে গুরুত্ব দেওয়া কখনই উচিত নয়। এইরূপ মনোভাব থেকে এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের উদ্ভব কখনই হয়নি। এখানে তার উদ্ভব হয়েছিল নিজেরা সকলে মিলে নৃত্যছন্দের নির্মল আনন্দ উপভোগের ঐকান্তিক আগ্রহে। নৃত্যবিদ্যাসহ এই প্রকার এক যুগান্তকারী নতুন শিক্ষাধারার প্রবর্তক হিসাবে গুরুদেব দেশবাসীর কাছে এই কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

পূর্বেই বলেছি, আমাদের দেশে ইংরেজ শাসকরা নীচ থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক বিকাশের নানা পথের সঙ্গে ভারতীয় সমাজকে যুক্ত করার কোনও প্রয়োজন কেন বোধ করেননি এবং গুরুদেবই প্রথম এই শিক্ষাধারার প্রতিবাদে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তখনকার দিনের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে খেলা, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদিসহ চারুকলা ও কারুকলাকে যুক্ত করলেন।

নাচ

গুরুদেবের জীবনে লক্ষ করবার মতো একটি দিক হল, তিনি যে বিষয়ে যা ভাবতেন সে বিষয়ে নিজের হাতে কাজ করে তা দশের বা দেশের সমক্ষে উদাহরণ হিসাবে খাড়া করতেন। কেবল বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের মতো বড় আদর্শের বাণী প্রচার করেই তাঁর বক্তব্য তিনি শেষ করতেন না। হাতেকলমে কাজ করে প্রমাণ করতেন যে, তিনি যা ভাবেন বা বলেন, তা অবান্তর নয়। তার মধ্যে সত্য আছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যেরও যে বিশেষ স্থান থাকা দরকার, এ কথা তিনি কেবল একটি বড় আদর্শ হিসাবেই প্রচার করলেন না, শান্তিনিকেতনের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তার সম্মানজনক স্থান করে দিয়ে মানবসমাজে তার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিলেন। তাঁর এই চিন্তাকে কার্যকর করে তুলতে তিনি প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। নিজে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নেচেছেন, নাচে তাদের উৎসাহিত করেছেন, নাচের উপযোগী গান ও নাটকাদি রচনা করে দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে মহড়া পরিচালনা করেছেন। এ কাজে তাঁর একটুও অবসাদ বা অবহেলা ছিল

না। তিনি নাচ অত্যন্ত ভালবাসতেন। নির্মল আনন্দ উপভোগের একটি বড় অবলম্বনরূপে এটিকে দেখতেন বলে অন্যরাও যাতে সেই ভাবে আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়, সেই দিকে ছিল তাঁর বিশেষ চেষ্টা। তাই তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন— 'আমি বিচিত্রের দূত। নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি।'

গুরুদেবের চোখে নৃত্যকলা কীভাবে প্রতিভাত হত, স্বতন্ত্রভাবে তার বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন— 'নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ-চাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমার। তাতে কেবল ছন্দের আনন্দ।...

'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটুকুকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।...

'নৃত্যের কোনও একটি ভঙ্গিও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানাখানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে আমি নাচ দেখছি। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গিই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গিকেই মুখ্য করে দেখছিনে, আমরা দেখছি তার সত্যটিকে, তাই খুশি হয়ে উঠছি।...

'মেয়েরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের স্তরের উপর নকশা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ ধরা ছেঁড়াখোঁড়া কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সঙ্গতি কোথায়। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হত তা হলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভাল লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলা যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চারিদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে।'

গুরুদেবের কাছে নৃত্যকলা মর্যাদা পেয়েছিল দেহের চলমান একটি শিল্পরূপে। তাঁর মনকে আমোদিত করেছে এর ছন্দের দোলায়। সেই কারণেই বিনা সংকোচে শান্তিনিকেতনে তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নাচের একটি প্রাণবান আন্দোলন।

আমরা জানি অভিনয়বিহীন ছন্দোবদ্ধ নাচকে নাট্যশাস্ত্র বলেছে 'নৃত্ত'। আর ভারতের গ্রামসমাজের নানা উৎসব, যথা পূজা, পার্বণ, পরব ও বিবাহাদি আনন্দানুষ্ঠানের সময়েই এ সব নাচ আমরা দেখি। এতে দলবদ্ধ নাচই প্রধান বা সবচেয়ে প্রচলিত। গ্রামের মেয়েরা স্বতন্ত্রভাবে দলবদ্ধ হয়ে নাচে। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পাশাপাশিও নাচে, আবার কেবলমাত্র ছেলেদেরও দলবদ্ধ নাচ আছে। এইসব নাচকে এ যুগে আমরা বলে থাকি 'লোকনৃত্য'। এই সংহত সমাজবদ্ধতার জন্যই নৃত্যকলাকে গুরুদেব একটি সম্মানজনক শিক্ষণীয় বিদ্যারূপেই দেখতেন। দেশে এর অভাব উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল নগরবাসী শিক্ষিত সমাজে। সেখানে নৃত্যকলা ছিল কেবলমাত্র বাস্তব বিলাসের সামগ্রী। তাই পেশাদার বাইজি, খেমটাওয়ালি, যাত্রা ও থিয়েটারের পেশাদার নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে এর চর্চা ছিল নিবদ্ধ। নিম্নস্তরের বিলাসের বাইরে মানবচিত্তে নাচের যে আর কোনও স্থান থাকতে পারে সে বোধ নগরের শিক্ষিতসমাজ সম্পূর্ণ হারিয়েছিল। যে কারণে সে যুগের নগরবাসী নরনারীদের মধ্যে কোনওরূপ নৃত্যকলার চর্চা ছিল বলে জানা যায় না। এরই পাশাপাশি কিন্তু নৃত্যকলার সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, আজও আছে—গ্রামসমাজে। ভারতীয় লোকনৃত্যের ব্যাপক প্রচলনের পরিচয়ে তার প্রমাণ মেলে। নগরের শিক্ষিত সমাজের অবহেলায় গ্রামের নানাপ্রকার সামাজিক নৃত্য ক্রমশই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তবুও এখনও যা আছে তার বৈচিত্র্য গর্বের বিষয়। নির্মল আনন্দ উপভোগের উপযোগী নৃত্যকলার প্রতি শিক্ষিত সমাজের এই অবহেলা সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিক থেকে গুরুতর ত্রুটি বলেই গুরুদেব মনে করেছিলেন। সেই কারণেই ১৩৩৭/১৯৩০ সালে তিনি বলেছিলেন— 'সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাব প্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে তা

লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা ধরে রেখেছি, সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা আকারে এখনও আছে, কিন্তু ওরা ছোটলোক। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমন কি সুন্দর সুনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।'

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গুরুদেব প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এখানে ছাত্ররা এল বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। সে যুগে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যকলার চর্চা তো দূরের কথা কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতের চর্চার কথাও কেউ ভাবতে পারত না। কিন্তু শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব সংগীত অভিনয় ও চিত্রকলার চর্চাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিলেন। নৃত্যকলার চর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রথম থেকেই করতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে নাটকের অভিনয়কালে গানের সঙ্গে নিজে উৎসাহের সঙ্গে নেচেছেন,— শিক্ষক, কর্মী এবং ছাত্রদের নাটকের গানের সঙ্গে নাচতে উৎসাহিত করেছেন।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়-জীবনে নিজের মতো নতুন নাচ তৈরি করে গুরুদেব নিজে নাচতেন। আমরা বালকেরা দিনেন্দ্রনাথসহ সেই নাচের প্রভাবে গুরুদেবকে অনুকরণ করবার খুবই চেষ্টা করতাম। নাচের জন্য নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা না থাকলেও নাটকের মাধ্যমে নাচের একটি রুচি ও পরিবেশ গুরুদেব গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বিদ্যালয়ের সে যুগের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে।

শান্তিনিকেতনে নৃত্য-আন্দোলন

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে ছাত্রদের অন্য পাঠক্রমের সঙ্গে গান অভিনয় ও চিত্রকলা শিক্ষার ব্যবস্থা গুরুদেব যখন করেছিলেন, তখন নাচের সেইপ্রকার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা তিনি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পরে অন্য উপায়ে নাচকে সকলের কাছে নির্মল আনন্দ উপভোগের বিষয় হিসাবে দাঁড় করালেন। ১৯০৮ সালে পুজোর ছুটির মুখে 'শারদোৎসব' নাটকটি রচনা করে প্রথম যখন অভিনয় করান একদল ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মীদের নিয়ে, তখন ওই নাটকটির বালকদলকে দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' এবং 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি' গান দুটির ছন্দে পা মিলিয়ে নাচতে হয়েছিল। 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' গানটির সঙ্গে কাশের গুচ্ছ, শেফালি ফুল ও নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে ডালা সাজিয়ে বালকদের প্রত্যেকের হাতে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৯১১ সালে নাটকটি দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। তৃতীয়বার হয় ১৯১৯ সালে। ১৯০৮ সালে প্রথম অভিনয়কালে আমার জন্ম হয়নি। দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের কথা আমার মতো এক বছরের শিশুর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই সময়ের নাচের কথা বলতে পারলাম এই কারণে যে, যাঁরা এই নাটকের দুবারের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ১৯১৯ সালের তৃতীয়বারের অভিনয়েও যোগ দেন। এবারকার নাটকের বালকদের দলে আমিও যুক্ত ছিলাম। পূর্বের অভিনেতারা গানের সঙ্গে আমাদের নাচ দেখে বলতেন, আমরা নাকি নেচেছিলাম পূর্বে যে-ভাবে গানের সঙ্গে নাচ ক'টি হয়েছিল সেইভাবে।

১৯১৯ সালে 'শারদোৎসব' নাটকের পূর্বে, ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পর পর 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর' নাটক কয়টির কতকগুলি গানের সঙ্গে যে ধরনের নাচ হত, তা শেখানো পড়ানো কোনওপ্রকার ধ্রুপদী নাচ নয়। প্রত্যেকেই গানের ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেরা স্বাধীনভাবে পদচালনা করতেন, মনের আনন্দে। যাদের কোনও ছন্দোবোধ ছিল না সেইরূপ বে-তালারা এই দলে স্থান পেত না। 'অচলায়তন' নাটকের শোনপাংশুরা যখন যে-যার নিজের মতো নেচে যেতেন, তখন পিয়ার্সন তাঁর দেশজ নাচের ঢঙে ওই দলের সঙ্গে নাচে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম যখন 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় হয় তখন যুবকদলকে কয়েকটি উল্লাসের গানের সঙ্গে নাচতে হয়েছিল। কিন্তু এই নাটকের 'অন্ধ বাউল'-এর চরিত্রে গান গেয়ে গুরুদেবকে যে-ক'টি নাচ নাচতে হয়েছিল, তা ছিল ওই নাটকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

'গান্ধি পুণ্যাহ'

প্রতি বছর শান্তিনিকেতনে 'গান্ধি পুণ্যাহ' নামে একটি দিন নির্দিষ্ট আছে। এই দিনটিতে প্রত্যেক ভবনের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং অশিক্ষক কর্মীরা তাদের ভবনের যাবতীয় কাজ নিজেদের হাতেই করেন। সেদিন সব ভবনের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের ছুটি দেওয়া হয়। এই দিনটি পালনের একটি ইতিহাস আছে। ১৯১৪/১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধিজি, তাঁর পুত্র ও একদল ছাত্রসহ ভারতবর্ষে যখন আসেন, তখন তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েই আশ্রয় নেবেন বলে স্থির করেছিলেন। মাসদুয়েক পরে, গুজরাটের সবরমতিতে একটি আশ্রম স্থাপন করে তাঁর ছাত্রদলকে নিয়ে তিনি সেখানে উঠে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজির বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যেভাবে প্রতিদিনের সব কাজ নিজেদের হাতে করতে হত, শান্তিনিকেতনে এসে এখানেও গান্ধিজি সেই প্রথা বিদ্যালয়ের সকলের মধ্যে চালু করেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রদল গান্ধিজির ছাত্রদের সঙ্গে রান্না ও খাবারঘরের যাবতীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেন। শান্তিনিকেতনে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল ১৯১৫ সালের ১০ই মার্চ। গুরুদেব তখন থাকতেন সুরুল গ্রাম সংলগ্ন কুঠিবাড়িতে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তাঁকে প্রায়ই আসতে হত। সেই কুঠিবাড়িটি ঘিরেই ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীনিকেতন।

১০ই মার্চ, ১৯১৫ গান্ধিজি যেভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাই সে সময়কার একজন ছাত্রের স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ থেকে। তিনি লিখেছেন, 'আমরা শুনলাম আমাদের সব কাজ নিজেদেরই করতে হবে—জল তোলা, রান্না, বাসন মাজা, তরকারি কোটা, বাটনা বাটা, সব কাজ—যেগুলো আগে ঠাকুরচাকররা করত—তখন ঠাকুরচাকর থাকবে না। ...অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্মী এই ব্যবস্থায় মেতে ওঠাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঠাকুরচাকরদের বিদায় দিয়ে সকলে কাজে লেগে গেলেন। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, জল তোলা, বাসন মাজা, কয়লা ভাঙা, নানা কাজে ছাত্রশিক্ষক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শুনেছিলাম, পিয়ার্সন সাহেব-সহ একদল শিক্ষক রান্নাঘরের বড় বড় ডেক, কড়াই, গামলা মাজা নিয়ে বড় ছেলেদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। এই সময়ে তাঁরা খাবারঘরের সিমেন্ট বাঁধানো মেঝের উপরে অনেক দিনের সঞ্চিত ক্লেদ চেঁচে পরিষ্কারও করেছেন।'

গুরুদেব গান্ধিজির তখনকার এই ব্যবস্থাকে পূর্ণ সমর্থন করলেও, তখন তাঁর মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তার কথাও তিনি প্রকাশ না করে থাকতে পারেননি। সে সময়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের এক সমাবেশে, নিজেদের হাতে সব কাজ করাকে প্রশংসা করে, গুরুদেব যে প্রশ্নটি তুলেছিলেন, সেটি হল—'তোমাদের পড়াশুনার হয়তো এতে কিছু ক্ষতি হবে।'

গুরুদেবের এই মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে, তখনকার শিক্ষকদের মধ্যে যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার খানিকটা বুঝতে পারতাম, আমার পিতার সঙ্গে অন্য শিক্ষকদের আলোচনা থেকে। আলোচ্য বিষয়টি যে সহজ সরল ছিল না, সেটুকু অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি। পড়াশোনার ক্ষতি সম্পর্কে গুরুদেব কেন ওই কথা বলেছিলেন, সে বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসত সাধারণত শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীসমাজ থেকে। তারা এখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে অন্যত্র কলেজে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ভাল চাকরির কথা ভাবত। গুরুদেবকে এই কারণেই হয়তো তখনকার সমাজের ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতির কথা চিন্তা করেই কথাটি বলতে হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একমাত্র গান্ধিজির দ্বারাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্মযজ্ঞের বিষয়টি ১৯১৫ সালে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল বলে যদি ধরে নেওয়া হয়, তা হলে কিন্তু খুবই ভুল করা হবে। ছাত্রদের মধ্যে কর্মযজ্ঞের প্রবর্তন ভিন্ন পথে কীভাবে হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি, ভারতীয় প্রাচীন তপোবনে গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মচারিগণ কীভাবে গুরুর সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে গুরুর বিদ্যা আহরণ করতেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কর্মের পথে সেই আদর্শটিকে গ্রহণ করেছিলেন বর্তমান যুগের কথা চিন্তা করে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দশকে যাঁরা এখানকার ছাত্র ছিলেন, তাঁদেরই একজন জানিয়ে গেছেন, তাঁদের প্রতিদিনের নিয়মিত ক্লাসের পড়াশোনার সঙ্গে কীভাবে অন্যান্য কাজগুলি নিজেদের হাতে তাঁদের করতে হত। তিনি জানাচ্ছেন—'আশ্রমের সাধারণ ছাত্রদের জীবনেও তখন কিছু কঠোরতা ছিল। যেমন, তাদের নিজেদের ঘর ঝাঁট ও বাসন মাজিতে হইত। কাপড় নিজেদের কাচিতে ও সাবান দিতে হইত। খালি পায়ে কাঁকরের রাস্তায় চলিতেই হইত। ...লাইন করে নিজেদের থালাবাটি নিয়ে খেতে যেতাম, আর খাওয়ার পর কুয়োতলায় গিয়ে নিজেদের থালাবাটি মেজে নিতাম।'

এগুলি ছাড়া, পূর্বে অন্য পরিচ্ছেদে আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, ৭ই পৌষ উৎসব ও মেলার সময়ে ছাত্রদের নিজেদের হাতে কীভাবে নানা কাজ করতে হত। নিজেদের হাতে মাটি কেটে মাস্টারমশায়দের নেতৃত্বে ছাত্ররা যে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছে তারও উল্লেখ করেছি। সভাসমিতি, আনন্দানুষ্ঠানে শিক্ষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছাত্ররা আনন্দে কাজ করে যেত। শিশুদের স্নানের সুবিধার্থে, ভৃত্য থাকা সত্ত্বেও বড় ছাত্ররা কুয়ো থেকে জল তুলে তাদের ভাল করে স্নান করিয়ে দিত। এ ছাড়া প্রতি ছাত্রাবাসের দক্ষিণ দিকের জমিতে নানাপ্রকারের ফুল ও সবজির চাষ, ছাত্ররা নিজের হাতে করেছে। মোট কথা, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে নিজের হাতে অন্যান্য কাজ করার প্রচলন যেভাবে করা হয়েছিল, তাতে লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে কারও মনে হত না। সব কিছু নিয়ে পরিপূর্ণ জীবনের পরিবেশে সকলের জীবন বেশ আনন্দেই কাটত।

১৯১৫ সালের পর গান্ধিজি-প্রবর্তিত কর্মপ্রণালী শান্তিনিকেতনে চালু রাখা যায়নি। পূর্বে যা ছিল তাই রয়ে গেল, নিজের ছাত্রদল-সহ তাঁর গুজরাটের সবরমতি আশ্রমে চলে যাবার পর থেকে। গান্ধিজি-প্রবর্তিত এখানকার ছাত্রদের কাজকর্ম নিয়ে যেটুকু মতভেদ সে সময়ে দেখা দিয়েছিল, তার একটির উল্লেখ করে গেছেন তখনকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমদারঞ্জন ঘোষ, তাঁর 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে। ঘটনাটি ঘটেছিল আমার পিতাকে নিয়ে। প্রমদারঞ্জন ঘোষ জানাচ্ছেন— 'শান্তিনিকেতনে কালীমোহনবাবু একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শিশুবিভাগের অধিকর্তা। শিশুদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ...প্রথম "সত্যকুটির" ও "মোহিতকুটির" নামক যে ঘর দুটি তৈরি হয় সে দুটিই ছিল ছেলেদের আবাস-গৃহগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল। এতদিন শিশুবিভাগের ছেলেরা "নতুনবাড়ি"র ছোট ছোট ঘরগুলিতে ঠাসাঠাসি করে বাস করত। কালীমোহনবাবুর অনুরোধে শিশুদের ওই দুই নতুন গৃহে স্থান হয়। শিশুদের থাকবার সুব্যবস্থা হয়। অবশ্য পরে (১৯১৮/১৯) আজিকার "সন্তোষালয়"-এ শিশুবিভাগ স্থানান্তরিত হলে শিশুদের থাকবার ব্যবস্থায় আরও উন্নতি হয়। শিশুদের প্রতি কালীমোহনবাবুর দরদের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। গান্ধিজির অভিপ্রায় অনুসারে আশ্রমের রান্নাঘরের সকল ভার যখন শিক্ষক ও ছাত্রগণ নিলেন তখন শিশুবিভাগের ছেলেদের দেওয়া হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের কাজ। খাওয়ার পর রান্নাঘর ঝাঁটানো। আশ্রমের বড় ছেলেরা প্রতিদিন দু' বেলা নিজেদের ঘর নিজেরাই ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করত। কিন্তু শিশুবিভাগে ওই কাজের জন্য একজন চাকর ছিল। নতুন নিয়মে ছেলে-শিক্ষক সকলকেই কাজ করতে হবে। তাই সবচেয়ে কম পরিশ্রমের কাজ বলে রান্নাঘর ঝাঁটানোর ভার পড়ে শিশুবিভাগের উপর। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ওই ব্যবস্থা অচল বলে কোনও কোনও শিক্ষকের ধারণা হলেও তাঁরা চুপ করে থাকতেন। ...কিন্তু কালীমোহনবাবুর কাছে যখন শিশুবিভাগের কয়েকজন ছেলে অভিযোগ করে যে, খাওয়ার পর রান্নাঘর ঝাঁট দিতে তাদের কষ্ট হয় তখন কালীমোহনবাবু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি ওই নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলেন।'

আমার পিতা, গান্ধিজির দ্বারা প্রবর্তিত এখানকার দৈনন্দিন কার্যপ্রণালীর দু'-একটি ক্ষেত্রে আপত্তি

জানালেও তাঁর প্রতি তিনি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর তখনকার ডায়েরিতে। লেখার তারিখ হল ২৪ ফাল্গুন ১৩২১। সেদিন তিনি গান্ধিজির সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলাপ-আলোচনায় বসেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নেপালচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণভামিনী দাস নামে একজন মহিলাকে। সেদিনকার আলাপচারিতার বিবরণ পিতার ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত করছি—ডায়েরিতে আছে :

'গান্ধি

২৪শে ফাল্গুন ১৩২১ সন

শান্তিনকেতন

আজ সকালে দিনুবাবুর মার কাছে গিয়ে দেখলাম শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী দাস এসেছেন। তিনি গান্ধি মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

আমরা ১২টার সময় শ্রীযুক্ত গান্ধির সহিত আলাপ করিতে গেলাম। তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত কথাবার্তা হইল।

আমি—ভারতবর্ষে আপনি দীর্ঘকাল পরে আসিয়াছেন। এ দেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

গান্ধি—আমার মত এই যে women are better than men। ত্যাগের দিক দিয়া স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা উন্নত। পুরুষরা যেখানে ত্যাগ করে সেখানে প্রতিষ্ঠা চায়। সেই ত্যাগের মূল্য তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে। নারীরা নীরবে ত্যাগ করে recognition চায় না। পৃথিবীর অন্য দেশের নারীদের তুলনায় আমাদের নারীগণ যথার্থ মনুষ্যত্বহীন নহে বরং কোনও কোনও বিষয়ে তাহাদের আদর্শ উন্নত। পাশ্চাত্য দেশে একটা ভাব আসিয়াছে যে, মেয়েরা মনে করে পুরুষরা যাহা করে আমরা তাহাই করিব। ভালমন্দ বিচার না করিয়া তাহারা পুরুষ-কৃত সব কাজই করিতে চায়, এমন কী যে কাজগুলি পুরুষদের পক্ষেও কল্যাণকর নহে, তাহা পুরুষরা করে বলিয়াই তাহারা অধিকার করিতে ব্যাগ্র হইয়াছে। এরূপে মেয়েরা পুরুষ প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া নিজেদের Unsex করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে সেই ভয় নাই। আমাদের দেশে পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের চরিত্র অনেক উন্নত। আমি সেইজন্য স্ত্রীলোকদের অধিক শ্রদ্ধা করি।

নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবর্ষীয় নারীগণের মধ্যে আপনি ত্যাগের ভাব জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন কি ?

গান্ধি—আমি তাহাদিগকে inspire করি নাই। নারীরাই আমাকে inspire করিয়াছেন। আমরা যখন দশ সহস্র ভারতবাসী পদব্রজে যাত্রা করিলাম— Natal-এ প্রবেশ করিতে—আমি তাহার পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, পথে যদি কাহারও অসুখ করে অথবা কেহ দুর্বল হইয়া পড়ে তবে তাহার জন্য একজন মাত্র লোক পিছনে থাকিবে। আমাদের যাত্রার শৃঙ্খলা কিছুমাত্র নষ্ট করিতে দেওয়া হইবে না। অতএব যাহাদের শরীর খুব শক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু তাহারা ব্যতীত আর কেহ যেন ইহাতে যোগদান না করে। বিশেষত মহিলাদের যোগ দিতে আমি বারবার নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহিলাগণ সেই নিষেধ শুনিলেন না। দশ সহস্রের মধ্যে দুই সহস্রের অধিক মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের ক্রোড়ে সন্তান, মাথায় বোঁচকা, পৃষ্ঠে আহার্য। এমন কী, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক বোঝা বহন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। ১৭ বৎসরের একটি মেয়ে, তার নাম ওয়ালিয়াম্‌মা (দক্ষিণ ভারতীয়) জেলে যখন অসুস্থ হইল, তাহাকে বারবার বলা হইয়াছিল যে, সে জেল হইতে চলিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সে রাজি হয় নাই। অধিকার না লইয়া সে মুক্তি চাহে নাই। এবং হাসিমুখে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে সে বরণ করিয়াছে।

ইহা বলিয়া সেই বালিকার কথা স্মরণ করিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

নেপালবাবু—আপনি তাহাদের মধ্যে মিশিতেন কি ? মহিলারা আপনার বক্তৃতা শুনিতে পারিত কি ?

গান্ধি—হ্যাঁ। আমি অবাধে তাহাদের সঙ্গে মিশিতাম। এবং আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে খুব আলোচনা

করিতাম।

আমি—ভারতবর্ষে আপনি মেয়েদের অনেক বিদ্যালয় দেখিয়াছেন বোধ হয়। কোন্ স্থানে স্ত্রীশিক্ষার সর্বাপেক্ষা শুভ ফল দেখিয়াছেন ?

গান্ধি—পুনাতে সবচেয়ে ভাল ফল দেখিয়াছি। সেখানে যথার্থ ত্যাগশীলা সেবাপরায়ণা নারীর সংখ্যা বেশি।

আমি—ভারতবর্ষে গভর্নমেন্টের বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎসম্পর্কে আপনার মত কি ?

গান্ধি—আমি ইহার অত্যন্ত বিরোধী। যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে আমাদের দেশের মেয়েদের গভর্নমেন্টের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—আমি তাহার অত্যন্ত বিরোধী। Indigenous education যে-প্রকারেরই হউক, তাহা এই বিদেশি ধরনের শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর ফল প্রসব করিবে।

মিসেস দাস—আমাদের দেশে মেয়েরা তাহাদের নিজ সমাজের prejudice হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অথচ westernised হইবে না, এমনতর শিক্ষা কি করিয়া দেওয়া যায় ?

গান্ধি—আমাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে মেয়ে কোনও prejudice-এই বাধ্য হইবে না। সেই prejudice প্রাচীনেরই হউক আর নূতনেরই হউক। আমাদের জীবনযাত্রাকে বর্তমান westernised শিক্ষার প্রভাবে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের সমাজের মধ্যে যথেষ্ট defects রহিয়াছে তাহা জানি। কিন্তু তাহাকে আমাদের জাতীয় ভাবের মধ্য দিয়াই সংস্কার করিতে হইবে। বাহির হইতে সংস্কার করা যাইবে না। Hindu জাতির একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব আছে যে বাহির হইতে কিছু দিতে গেলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ভিতরে থাকিয়াই সমাজকে সংস্কার করিতে হইবে। সমগ্র হিন্দুসমাজ যদি একঘরে করে তথাপি হিন্দু থাকিয়াই, হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন করিতে হইবে। অনেক বিদেশি লেখক শিখদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে তাহারা হিন্দু নহে। অথচ নানক কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, তিনি হিন্দু নন। সুখের বিষয় শিখসমাজেও ক্রমেই এ বিশ্বাস জাগিতেছে যে তাহারা হিন্দু। ব্রাহ্মসমাজ অনেকটা পাশ্চাত্য মুখাপেক্ষী হইয়া অনেকটা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আমি—কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিকে আমরা Father of Nationlism বলি। তাঁহারা প্রথম 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেন। তখন বালক রবীন্দ্র প্রথম জাতীয় কবিতা লিখেন। মহর্ষির মধ্যেও সেই আদর্শ পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল। তিনি তাঁহার সংস্কারকে জাতীয়ভাবে চালিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার মতভেদের মূলও এখানে।

গান্ধি—হ্যাঁ। আমারও মত তাই। কেশবচন্দ্রের anniversary-তে আমি সে কথাই বলিয়াছি যে reform বাহির হইতে কখনও সম্ভব হইবে না। আমাদের সামাজিক সংস্কার অত্যাবশ্যকীয়, কিন্তু তাহা বিজাতীয় আদর্শের প্রেরণায় নহে, ভিতর হইতে জাতীয় আদর্শের পথে সংস্কার সম্ভব হইবে। আমাদের দু'দিকেই লড়াই—এক দিকে প্রাচীন কুসংস্কার, আর এক দিকে এই নব্যতন্ত্রের এই সকল Anglicised ভাব যাহা আমাদের এই জাতিভেদ আনিয়া ফেলিতেছে। আমাদের এই দুই দিকেই প্রবীণ ও নবীন—উভয় সমাজের সঙ্গে লড়িতে হইবে।

প্রশ্ন— এইরূপ করার পন্থা কি ?

গান্ধি—পন্থা বড় শক্ত। সহজে ইহার সমাধান করা দায়। তবে আমাদের নিজদিগকে এই আদর্শ অনুযায়ী জীবন লাভ করিতে হইবে। আমাদের অনেককে দেখি, তাঁহারা মুখে বলেন যে ভারতীয় সাদাসিধে সরল জীবনযাত্রার পুনঃপ্রচলন অত্যন্ত আবশ্যক, অথচ তাঁহাদের চলাফেরা-পোশাকাদির মধ্যে এমন একটা বিলাতি গন্ধ থাকে, তাঁহারা নিজেরাও জানেন না যে তাঁহারা কতটা half Indian। বেশভূষা, চাল-চলনে পুরোপুরি আদর্শের অনুরূপ হইতে হইবে তাহা হইলে নবীন যুবকেরা আমাদের জীবন দেখিয়া আমাদের আদর্শের মর্যাদা বুঝিতে পারিবে।

গান্ধির কথা আমার খুব ভাল লাগিতেছিল। তিনি যাহা বলেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলেন। এই জন্য যখন কোনও কথা বলেন তখন তাহার পশ্চাতে প্রচণ্ড জোর থাকে এবং শ্রোতার

মনকে খুব জোরের সহিত নাড়া দিতে থাকে। তিনি যে সাদাসিধা জীবনযাত্রার কথা বলিলেন, তিনি নিজেই তাহার প্রধান আদর্শ। আমাদের সঙ্গে যখন কথা হইতেছিল তখন তাঁহার পায়ে জুতা নাই। পাতলা ছালের চট পায়ে! মোটা সুতোর জামা গায়ে। নিজেই রান্না করেন, ঝাঁট দেন, মাটি কাটেন।'

১৯২০/২১ সালে গুরুদেব যখন বিদেশে এবং মহাত্মা গান্ধি-কর্তৃক পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে দেশবাসী উন্মত্ত, তখন শান্তিনিকেতনে আগত মহাত্মা গান্ধি, মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি এবং আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পরপর কয়েক দিনের ব্যবধানে শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁদের সকলের চিত্তবিনোদনের জন্য দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'বাল্মীকি-প্রতিভা' আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গান গেয়ে অভিনয় করেছি। কয়েকটি গানের সঙ্গে আমাদের নাচতেও হয়েছিল। আমি ছিলাম নাটকের 'দস্যু' দলে। দস্যু দলের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের গানের সঙ্গে আমাদের নাচতে হত গানের ছন্দের সঙ্গে ইচ্ছামতো পা মিলিয়ে। আমাদের দস্যুদলের দুই হাতে থাকত দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদের কয়েকপ্রকার ঢাল, কাঠের বল্লম, মাথার শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র। শিল্পাচার্য নন্দলাল ওইসব অস্ত্র হাতে পূর্ব যুগের বাংলার ডাকাতদের মতো আমাদের সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

নাটকাভিনয়ে নাচ হয়ে উঠল অপরিহার্য

১৯২২ সালে 'শারদোৎসব' বা 'ঋণশোধ' নাটকের অভিনয়ের সময় পূর্বের ন্যায় আমাদের গানের সঙ্গে নেচে অভিনয় করতে হয়েছিল।

১৯২৩ সালে 'বসন্ত' নামে গানবহুল নাটিকাটি যখন কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তখন তার শেষ গান 'ওরে পথিক ওরে প্রেমিক বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে'-র সঙ্গে সমস্ত মঞ্চ জুড়ে গুরুদেবসহ অবনীন্দ্রনাথ, এলমহার্স্ট এবং আমরা সকলেই নেচেছিলাম।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে নৃত্য-আন্দোলনের প্রথম যুগটি এইভাবে উত্তীর্ণ হয়। এ যুগের এই নৃত্য-আন্দোলন বিধিবদ্ধ কোনও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হত না। গানের ছন্দের সঙ্গে সংগতি রেখে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো অঙ্গভঙ্গি করে নাচতাম। যদিও ১৯২০ সালে আগরতলা থেকে বুদ্ধিমন্ত সিংহ নামক একজন মণিপুরি নৃত্যগুরুকে গুরুদেব আনিয়েছিলেন আমাদের মতো অল্পবয়সীদের মণিপুরি পুরুষ নাচ শিক্ষার জন্য। সে নাচ আমরা ওই সময়ের নাটকের গানের সঙ্গে যুক্ত করবার কোনও সুযোগ পাইনি।

নৃত্য-আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ

এরপর শুরু হয় এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ। যার প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন গুরুদেবের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় এবং গুরুদেবের পূর্ণ সমর্থনে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে নাচের চর্চার ব্যবস্থা তিনি প্রথম করেন— ১৯২৪ সালে। বিশ্বভারতীতে এই সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে বোম্বাই থেকে আসেন একজন পার্শি ভদ্রলোক— সপরিবারে। তাঁর নাম ছিল ডঃ জাহাঙ্গির ভকিল। ভকিল-পত্নীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর প্রতিমা দেবী জানতে পারলেন, তিনি গুজরাটে মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত গরবা নাচ জানেন। প্রতিমা দেবী তখনই তাঁকে অনুরোধ জানান সেই নাচটি এখানকার ছাত্রীদের শেখাবার জন্য। অধ্যাপক-পত্নী সানন্দেই তাতে সম্মত হন। এই গরবা নাচ দিয়েই এখানকার মেয়েদের মধ্যে নাচের

শিক্ষা প্রথম শুরু হয়। মনে পড়ে, এই ছাত্রীদলে প্রথম যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী ও যমুনা দেবী, ক্ষিতিমোহন সেন-এর কন্যা অমিতা সেন, গুরুদেবের নাতনি নন্দিতা দেবী (বুড়ি) ও বিদ্যালয়ের ছাত্রী লতিকা রায়। এ ছাড়া আরও দু-চারজন ছিলেন যাঁদের নাম এখন আর মনে নেই। এই সময়ে আহমদাবাদের এক ধনীর কন্যা শ্রীমতী হাতি সিং কলাভবনে ছাত্রী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ইনি পরবর্তী কালে জোড়াসাঁকো-ঠাকুর পরিবারের রাজনীতিবিদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিবাহ করে শ্রীমতী ঠাকুর বা শ্রীমতী দেবী নামে পরিচিতা হন। ইনিও ভকিল-পত্নীর ছাত্রীদলে যোগ দেন এবং গরবা নাচের চর্চায় এখানকার ছাত্রীদের সাহায্য করেন। গরবা নাচে ছাত্রীদের শিক্ষা ভালভাবে অগ্রসর হবার পর ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানে প্রতিমা দেবী ছাত্রীদের দিয়ে কয়েকটি গানের সঙ্গে গরবা নাচ জুড়ে দিলেন— ভকিল-পত্নীর উদ্যোগে। তার পরেই 'শেষবর্ষণ' শীর্ষক গানবহুল নাটকটিতে ভকিল-পত্নীর পরিচালনায় আরও কয়েকটি গানের সঙ্গে গরবা নাচ যুক্ত হয়েছিল। গরবা নাচ অভিনয়-ধর্মী নাচ নয়। গুজরাটের মহিলারা তাঁদের নানা পরবে, উৎসবে যে গানগুলি গেয়ে থাকেন, তার সঙ্গে বৃত্তাকারে দলবদ্ধ হয়ে প্রবল আনন্দে তাঁরা নাচেন। এখানকার ওই দুটি অনুষ্ঠানেও গুরুদেবের গানের সঙ্গে ছাত্রীদের বৃত্তাকারে দলবদ্ধ হয়ে গরবা নাচ করতে হয়েছিল। এবারকার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্রতিমা দেবীর আগ্রহে গুরুদেব আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজকে পুনরায় অনুরোধ করলেন, মেয়েদের নাচ শেখাবার উপযুক্ত একজন মণিপুরি নৃত্যশিক্ষককে পাঠাবার জন্যে। তিনি নবকুমার সিংহকে পাঠালেন তাঁর এক মৃদঙ্গবাদক ভ্রাতাসহ। নবকুমার সিংহ ১৯২৫ সালের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে নৃত্যের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ছাত্রীদের নিষ্ঠার সঙ্গে মণিপুরি নাচ মৃদঙ্গ বাদ্যের তালের সঙ্গে তিনি শেখালেন। ১৯২৬-এ প্রতিমা দেবী ২৫শে বৈশাখের দিন গুরুদেবের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থটির অন্তর্গত 'পূজারিণী' কবিতাটি নিয়ে নৃত্যসহযোগে মূকাভিনয় করাবেন বলে স্থির করলেন। গুরুদেব তাঁর এই পরিকল্পনার কথা শুনে অতি দ্রুত যে নাটকটি রচনা করেন, সেটি হল 'নটীর পূজা'। এই অভিনয়ের শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং গুরুদেব নিজে। গানে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ আর নৃত্যরচনার দায়িত্বে ছিলেন প্রতিমা দেবীর নির্দেশে আগরতলা থেকে আগত মণিপুরি নৃত্যগুরু নবকুমার সিংহ। এরপর ১৯২৭ সালে 'নটীর পূজা'র অভিনয় হল কলকাতায় জানুয়ারি মাসে। পরের ফেব্রুয়ারি মাসে বসন্তোৎসব উপলক্ষে 'নটরাজ' নামে আবৃত্তি ও নৃত্যগীতপূর্ণ নাটিকার অভিনয় হয়। ডিসেম্বর মাসে 'নটরাজ'-এর অদলবদল করে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় যখন নৃত্যগীত আবৃত্তি সহযোগে সেটি অভিনীত হল, তখন তা পরিবর্তিত হয়ে হল 'ঋতুরঙ্গ'। এই ক'টি নাটিকায় নেচেছিল ছাত্রীরা নবকুমার সিংহের কাছে শেখা মণিপুরি নাচের আঙ্গিকে। প্রতিমাদেবীর নির্দেশে ছাত্রীরা তাদের একক দলবদ্ধ নাচ তৈরি করেছিল। ১৯২৮ সালে দোলের দিন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে কারমাইকেল বেদির সামনে, কিছু আমগাছ-সহ 'ফাল্গুনী' নাটকটি পুনরায় অভিনীত হয়। গুরুদেব 'অন্ধ বাউল' চরিত্রে নৃত্যগীত করেছিলেন পূর্বের ন্যায়। নবযৌবনের দলে আমরা কয়েকটি গানের সঙ্গে পদছন্দে নেচেছিলাম, প্রথম যুগের মতো।

১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে মাঘোৎসবের উপাসনার গান উপলক্ষে গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথ-সহ আমরা একদল গানের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন হঠাৎ স্থির হল বসন্ত ঋতুর গানসহযোগে নৃত্যগীতের একটি অনুষ্ঠান সেখানে হবে। পূর্বে 'নটরাজ' ও 'ঋতুরঙ্গ'-এর সময় নৃত্যসহযোগে যে সব গান হয়েছিল সেগুলিকেই নির্বাচন করা হয়। ছাত্রীরা নেচেছিল মণিপুরি ও গরবা নাচের ঢঙে, প্রতিমা দেবীর পরিচালনায়।

এরপর ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন 'গীতোৎসব' ও 'শিশুতীর্থ' প্রদর্শিত হয় তখন প্রতিমা দেবীই প্রথমে এর পরিকল্পনা করেছিলেন। গুরুদেব তা দেখে নিজের মতো করে সাজিয়ে দেন। এই দুটি অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য, হাঙ্গেরি দেশের কন্যা শ্রীমতী ব্রুনার নৃত্য। তিনি নিজের দেশের নাচকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর নৃত্য উপস্থাপনায়। গুরুদেবের 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটির সঙ্গে তিনি নেচেছিলেন। কলাভবনের মাদ্রাজি ছাত্র বাসুদেবন নেচেছিলেন 'যেতে

যেতে একলা পথে' গানটির সঙ্গে তাঁর প্রদেশের নাচের পদ্ধতিতে। শ্রীমতী দেবী নেচেছিলেন গুরুদেবের স্বকণ্ঠে 'ঝুলন' কবিতাটির আবৃত্তির সঙ্গে এবং 'এসো নীপবনে' গানটির সঙ্গে য়ুরোপের Modern Dance -এর পদ্ধতিতে।

আমি সেই বছরের মে মাসে কেরলে গিয়ে কথাকলি নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত তালের নাচ 'কলাসন' শিখে এসেছিলাম। সেদিন গান ছাড়া কেবল তালবাদ্যের সঙ্গেই সেই নাচটি আমাকে নাচতে হয়েছিল। এর পর যখনই 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে নাচের প্রাধান্য ছিল বরাবর। প্রতিমা দেবীর নির্দেশে ছাত্রীরা নাচগুলি তৈরি করত। উনিশ শ' তেত্রিশ সালে 'তাসের দেশ' নাটকটি রচনার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল প্রতিমা দেবীর। কিন্তু গুরুদেবের হাতে সেটি ভিন্ন আকারের, ভিন্ন স্বাদের নাটকে পরিণত হয়। ১৯৩১ সালের মধ্যে 'শাপমোচন', নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'পরিশোধ, 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' ও 'মায়ার খেলা'কে গুরুদেব ভিন্ন আকারে সাজিয়েছিলেন প্রতিমা দেবীর প্রাথমিক পরিকল্পনাগুলি দেখার পর। গুরুদেবের কবিতাকে অবলম্বন করে ছোট ছোট আরও কয়েকটি মূকাভিনয়ও প্রতিমা দেবী ছাত্রীদের দিয়ে করিয়েছিলেন।

এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের এটি হল দ্বিতীয় যুগ। প্রতিমা দেবী নিজে নাচতে পারতেন না। কিন্তু তিনি গুরুদেবের গানের সঙ্গে কীভাবে মণিপুরি প্রথায় নাচ তৈরি করতে হবে, তার নির্দেশ ছাত্রীরা তাঁর কাছ থেকে সর্বদাই পেত।

প্রতিমা দেবীরই একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহে গুরুদেব তাঁর জীবনের শেষ ১৫/১৬ বছরে নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী ওই ক'টি নাটক রচনা করে গিয়েছিলেন। এ ভাবে প্রতিমা দেবীর উৎসাহের পরিচয় না পেলে, নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী ওই নাটকগুলি গুরুদেব কখনও রচনা করতেন কি না, তা কে বলতে পারে।

আমার সমগ্র জীবনের নৃত্যচর্চা

শান্তিনিকেতনের সংগীত ও অভিনয়ের সঙ্গে আমি বাল্যকাল থেকে কীভাবে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম তার আলোচনা পূর্বে কিছু করেছি। পরে এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কীভাবে ঘটেছিল এবং আমার সমগ্র জীবনের নৃত্যচর্চাকে বাস্তবে এখানে কীভাবে আমি প্রয়োগ করেছিলাম, এবারে তার বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি।

৭ই পৌষের উৎসব ও মেলা যখন একদিনের ছিল তখন প্রতি বছরে দু'চার জন বৈষ্ণব বাউল এসে মন্দির-সংলগ্ন বাইরের দু'-একটি গাছের তলায় আশ্রয় নিত এবং সেখানেই তারা নিজেদের আনন্দে গান গেয়ে নেচে আসর জমাতো। ইচ্ছামতো শ্রোতারা সেই আসরে এসে কিছুক্ষণ বসে তাদের নাচের সঙ্গে গান শুনে চলে যেতেন। দিনের বেলায় সেই আসরে আমি বসে গান শুনতাম। সেদিনের গোপাল ক্ষ্যাপা নামে একজন বাউলের নাচগানের কথা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। কেন জানি না বাল্যকাল থেকেই বাউলদের গানের সঙ্গে নাচ আমার মনকে খুবই আকর্ষণ করেছে। ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে আমার বাবা যখন বিশ্বভারতীর একদল বয়স্ক ছাত্র ও কর্মীসহ অজয় নদীর উত্তর তীরে কেঁদুলি গ্রামের জয়দেবের মেলায় গিয়েছিলেন সেই মেলার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তখনকার স্বেচ্ছাসেবক দলে আমিও ছিলাম। আমার বয়স তখন ১৪/১৫ বছর। সেখানে বাউলগুরুরা তাঁদের শিষ্য-শিষ্যাসহ ডালপালা ছড়ানো বিরাট একটি বটবৃক্ষের তলায় আস্তানা গড়তেন। প্রাতে অজয় নদীর জলে স্নান সেরে পূজার্চনা ও জলযোগের পর তাঁরা গান গাইতে বসতেন। বহুক্ষণ ধরে নাচগান করে, দ্বিপ্রহরে সেখানকার 'মচ্ছব'-এর খিচুড়ি-ভোগ পেট ভরে খেয়ে, দুপুরে বিশ্রামের পর এবং সন্ধ্যার মুখে পুনরায় তাঁরা গান গাইতে বসতেন। সেই গান

চলত অধিক রাত্রি পর্যন্ত। আমরা স্বেচ্ছাসেবকরা, আমাদের কাজ শেষ করে, বাউলদের দু'বেলার আসরে গিয়ে বসে পড়তাম ইচ্ছামতো। আমি চেষ্টা করতাম সব আসরেই ভক্তদের মধ্যে বসে প্রাণভরে নাচগান শুনে বাকি সময়টা কাটাতে। কখনও ক্লান্তি বোধ করতাম না। পরে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আমরা কয়েকজন মাঝে মাঝে গিয়েছি সাইকেল বা গরুর গাড়িতে। সন্ধ্যা থেকে অধিক রাত পর্যন্ত বাউলদের গান ও নাচ প্রাণভরে উপভোগ করে পরের দিন সকালে রওনা হতাম শান্তিনিকেতনের দিকে।

এইভাবে বাউলদের গানের সঙ্গে, বিশেষ করে তাদের বিচিত্র পদছন্দ ও দেহভঙ্গির নাচগুলি তখন থেকেই আমার মনের মধ্যে আপনা থেকে খানিকটা বসে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে গুরুদেবের বাউল সুর ও ছন্দের গানের সঙ্গে মনের মধ্যে ধরে রাখা কেঁদুলির বাউলদের নাচগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে আপন মনে নাচতে চেষ্টা করে খানিকটা সাফল্য লাভেও সমর্থ হয়েছিলাম। প্রকাশ্যে ওই নাচ আর কাউকে দেখাবার সাহস তখন পাইনি। গোপনেই নাচতাম।

১৯৩১ সালে য়ুরোপ ও রাশিয়া ভ্রমণ শেষ করে জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে ফিরে গুরুদেব 'নবীন' নামে নৃত্যগীতবহুল একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনে হাত দেন প্রতিমা দেবীর আগ্রহে। এবারেও জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি কেঁদুলি গ্রামের মেলা দেখতে গিয়ে, বিশেষ করে একজন যুবক বাউলকে দেখলাম, যাঁর মধ্যে পুরুষোচিত শক্তির বিকাশের পরিচয়ে আমি খুবই মুগ্ধ হই। মনোযোগ দিয়ে সেদিন তাঁর নাচ আমি দেখি। পরে আমি যখনই গুরুদেবের বাউল সুরে গানের সঙ্গে নাচ তৈরি করতাম তখন সেই বাউলটির জোরালো নাচের ঢঙ আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। গুরুদেবের পরলোকগমনের পর আমার যোগাযোগ ঘটে পূর্ণ দাসের পিতা নবনী দাসের সঙ্গে। নাচ ও গানে তাঁর পুরুষোচিত বিচিত্র নৃত্যভঙ্গি আমার মনকে খুবই আকৃষ্ট করে। তাঁর নৃত্যপদ্ধতিও আমি আমার বাউল ঢঙের নাচে প্রয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছি।

প্রথমদিকে আমি গুরুদেবের বাউল সুরের গানের সঙ্গে যখনই নেচেছি বা অন্যদের জন্য নাচ তৈরি করেছি, তখন সে-যুগের বাউল নাচের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই আমি নানা ঢঙে কাজে লাগিয়েছি। পরে তার সঙ্গে অন্য প্রকৃতির নাচের পদছন্দের সমন্বয় করে বাউল নাচে ছন্দ-বৈচিত্র্য ঘটাবার চেষ্টা বারেবারে করে গেছি।

রায়বেশে নৃত্য

১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে যখন 'নবীন'-এর নৃত্যগীতের প্রস্তুতির কাজ চলছিল তখন বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত। তিনি ফেব্রুয়ারি মাসে সিউড়িতে লোকনৃত্যগীতের সম্মেলনের আয়োজন করে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ পাঠালেন তা দেখবার জন্য। কয়েকজন কলাভবনের ছাত্রসহ আমি গিয়েছিলাম তা দেখতে। এবারেই বীরভূমের রায়বেশে এবং ময়মনসিংহের মুসলমান যুবকদের জারি গানের সঙ্গে রুমাল হাতে পুরুষনৃত্য প্রথম দেখি। নতুন ধরনের এই পুরুষালি নাচের ছাপ মনে নিয়েই ফিরেছিলাম শান্তিনিকেতনে।

মার্চ মাসে ছিল শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব। তখনও পর্যন্ত এই উৎসবের দিন সকালে কোনও বাঁধাধরা অনুষ্ঠান হত না এখনকার মতো। শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী আমরা এবং অধ্যাপকরা একসঙ্গে শালবীথির তলায় বসে গুরুদেবের যাবতীয় বসন্ত ঋতুর গান করতাম একটির পর একটি। সেখানেই আবির খেলা হত। এবারে দোলের সেইরূপ অনুষ্ঠানে আমি ও কলাভবনের ছাত্র বনবিহারী ঘোষ গানের সঙ্গে নাচব বলে স্থির করে উঠে পড়লাম। সংগীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ও শিল্পাচার্য নন্দলাল আমাদের খুবই উৎসাহ দিলেন। তাঁদেরই উৎসাহে আমি একতারার অভাবে ছোট

লাঠি নিয়ে একটার পর একটা গানের সঙ্গে নিজের ইচ্ছামতো বাউলদের ঢঙে প্রায় দেড় ঘণ্টা নেচেছিলাম। বনবিহারী নেচেছিল তার ইচ্ছামতো। নাচে আমাদের কোনও ক্লান্তি ছিল না। সকালের এই গানের আসরে গুরুদেব থাকতেন না। তিনি নাচের খবর পেয়েই আমাকে ডেকে বললেন, সন্ধ্যায় 'নবীন'-এর অনুষ্ঠানে আমাকে একলা একটি গানের সঙ্গে বাউলদের ঢঙে নাচতে হবে। প্রবল উৎসাহে 'এ বেলা ডাক পড়েছে'—বাউল সুরের গানটি বেছে বাউলের ঢঙে নাচ রচনা করে সন্ধ্যায় তা দেখালাম। দোলের কিছুদিন পরেই স্থির হল 'নবীন' কলকাতায় হবে। গুরুদেব আমাদের নাচের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। আমাকে একতারা হাতে একটি একক নাচ নাচতে বললেন। এই সুযোগে গুরুদেবের কাছে আবেদন করে বলেছিলাম, আমরা ছেলেরা রায়বেশে নাচ ভাল করে শিখতে চাই, তিনি যেন একদল নাচিয়েকে সিউড়ি থেকে গুরুসদয় দত্তকে বলে আনিয়ে দেন। এই আবেদনটি জানাবার পর দু-একদিনের মধ্যেই নাচিয়ে ও বাজিয়ে এসে গেল। আমরা উৎসাহের সঙ্গে সাতদিন ধরে সেই নাচ শিখলাম।

কলকাতায় 'নবীন'-এর অনুষ্ঠানে গুরুদেবের 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান' গানটির সঙ্গে বাউলের ঢঙে নেচেছিলাম। তখন হাতে নিয়েছিলাম একটি উত্তর ভারতীয় একতারা। রায়বেশে ও জারি নাচ মিশিয়ে নেচেছিলাম আমি ও বনবিহারী, 'এ বেলা ডাক পড়েছে' গানটির সঙ্গে। একটি ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দ্বৈতনৃত্য করেছিলাম 'হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে' গানটিকে অবলম্বন করে। তিনটি নাচেই পুরুষোচিত বলিষ্ঠ ভঙ্গি এবারেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল।

কথাকলি ও অন্যান্য নৃত্যশিক্ষা

'নবীন'-এর নাচের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গুরুদেবের কাছে ধ্রুপদী পুরুষালি নাচ ভাল করে শেখবার উৎসাহ প্রকাশ করি। গুরুদেব সানন্দে আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু কোথায় গেলে সেইরূপ নাচ শেখা যায় তার কোনও খবর আমার তখন জানা ছিল না। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল দক্ষিণ ভারতে তৎকালীন কোচিন রাজ্যে [বর্তমান কেরল] কথাকলি নৃত্যশিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। সেখানকার একটি গ্রামে কবি ভাল্লাথোল প্রতিষ্ঠিত 'কলামণ্ডলম' নামে কথাকলি নৃত্যশিক্ষার একটি বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয়ে ১৯৩১-এর মে মাসে ভর্তি হলাম। সেই বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে কথাকলি নাচের 'কলাসন' ও 'সারি' নাচগুলি, তার সঙ্গে মুদ্রাভিনয়ের কিছু পদ্ধতি শিখলাম—শান্তিনিকেতনে গরমের ছুটির দু মাস সেখানে থেকে। অগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেই 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানের কাজে মনোনিবেশ করলাম। এই অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্বে ছিল ৭/৮টি গান। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিমা দেবী গুরুদেবের 'পূজারিণী' কয়েকটি ছাত্রীকে দিয়ে চলার ছন্দে মূকাভিনয় করিয়েছিলেন। প্রথমার্ধের অনুষ্ঠানে 'ওই বুঝি কালবৈশাখী' গানটির সঙ্গে কথাকলি নাচের 'কলাসন'-এর কয়েকটি ভঙ্গি মিলিয়ে নিয়ে পুরুষোচিত বলিষ্ঠ একটি তালের নাচ তৈরি করে নেচেছিলাম। অন্য গানকটির সঙ্গে মণিপুরি নৃত্য করেছিল ছাত্রীরা। একক ও দলবদ্ধ হয়ে গরবা নাচও ছিল এই অনুষ্ঠানে।

নৃত্য-আন্দোলনে নতুন আঙ্গিক

'ঝুলন' কবিতাটি স্বয়ং গুরুদেবের কণ্ঠে আবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমতী দেবীর ভাবনৃত্যের কথা পূর্বেই বলেছি। শ্রীমতী দেবী দু-তিন বছরের জন্য জার্মানিতে গিয়ে সে-দেশের Modern Dance-এর স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পাশ্চাত্য দেশের সেই পদ্ধতির নৃত্য ভাল করে শিখে এসে গুরুদেবের

কবিতাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি যে নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করলেন তার ফলে এখানকার নৃত্য আন্দোলনে একটি নতুন ধারা যুক্ত হবার সুযোগ ঘটে। তাঁর নাচ দেখে আমি নাচের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাই। এরপর থেকে আমি ভাবতে আরম্ভ করি, আমাদের দেশের বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির সমন্বয়ে ওইরূপ মিশ্রিত নাচ রচনা করবার কথা। তারপর থেকে গুরুদেবের গানের সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় নাচের সমন্বয়ে নাচ রচনা করে গুরুদেবের জোরালো গানের সঙ্গে নিজে নেচেছি, ছাত্রীদেরও নাচিয়েছি।

১৯৩৭ সালের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের সময় 'ঝুলন' কবিতাটি গুরুদেব নিজে আবৃত্তি করবেন স্থির করলেন। তখন শ্রীমতী দেবী শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেছেন। গুরুদেব বললেন, তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যছন্দে অভিনয় আমাকে করতে হবে। 'ঝুলন' কবিতাটির সঙ্গে যে নাচ আমি তৈরি করেছিলাম তাতে ছিল আমার শেখা কয়েক প্রকার নাচের সংমিশ্রণ। আবৃত্তির ভাবানুযায়ী ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির দেশি নাচগুলিকে আমি সাজিয়ে নিয়েছিলাম। গুরুদেবের পূর্ণ সমর্থনেই এ ভাবে নাচটি তৈরি করতে আমি উৎসাহ পাই। 'ঝুলন' কবিতাটির সঙ্গে আমাকে নৃত্যাভিনয় করতে হয় শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানে।

মহড়ার সময় ওই কবিতাটির সঙ্গে আমার নতুন ধরনের নৃত্যাভিনয় দেখে কেউ কেউ আমাকে বলেছিলেন, শ্রীমতী দেবীর য়ুরোপীয় Modern Dance-এর অনুরূপ নৃত্যাভিনয় হলে ভাল হত। সেই সমালোচনার কথা গুরুদেবকে বলার পর তিনি বলেছিলেন, মহড়ার সময় প্রকাশ্যে এই নাচটি আর না করতে। অন্য সময়ে তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে নাচটি অভ্যাস করতে তিনি আমাকে বলেছিলেন। এরপর থেকে মহড়ার সময় প্রকাশ্যে এই নাচটি আমি আর করিনি। কলকাতায় অনুষ্ঠানের আগে জোড়াসাঁকোয় তাঁর শয়নকক্ষে স্বতন্ত্র সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে মহড়া দিতাম।

নৃত্যচর্চায় গুরুদেবের নির্দেশ ও সাহচর্য

শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনের সঙ্গে গুরুদেব ও প্রতিমা দেবী কীভাবে যুক্ত ছিলেন, এতক্ষণ সে-কথা বলবার চেষ্টা করেছি। নৃত্যচর্যায় উভয়ের কর্মধারার সঙ্গে আমি কীভাবে যুক্ত হয়েছিলাম এবং কীভাবে গুরুদেবের নির্দেশে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি, এবার তার কথা বলব।

বাল্যকাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনের সঙ্গে আমার নৃত্যজীবন যে ক'টি নৃত্যের শিক্ষার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল সে-কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু তারপর থেকে আমি যুক্ত হয়ে পড়ি গুরুদেবের গানের সঙ্গে নৃত্য রচনায়। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত যে ক'টি নাচ আমি নিজের আগ্রহে নানাভাবে শিখেছিলাম, সেইরূপ শেখার আগ্রহ আমার মনে বরাবরই ছিল এবং শেখবার জন্য চেষ্টাও করেছি নিজেরই আগ্রহে। সেইসব নাচ গুরুদেবের গানের ছন্দ ও তালের সঙ্গে কীভাবে খাপ খাবে তা নিয়ে আমি সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছি। এ বিষয়ে গুরুদেবের আন্তরিক সমর্থনই ছিল আমার একমাত্র প্রেরণা।

নতুন নতুন নাচ শেখার প্রয়োজনে নানা স্থানে ভ্রমণের জন্য তিনি আমাকে সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন। ফিরে এসে সেই নতুন শেখা নাচকে তাঁর গানের সঙ্গে নাচে মিশিয়ে দেবার প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। এইভাবে এখানকার নৃত্য-আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করবার যে-চেষ্টা করেছি, তা তাঁর ঐকান্তিক উৎসাহ ও প্রেরণায় সম্ভব হয়েছে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত যত প্রকার নাচ দেশে- বিদেশে শিখে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় তাকে যুক্ত করেছিলাম, এবারে তার বিবরণ দিচ্ছি।

মণিপুরি নাচের সঙ্গে আমি প্রথম যুক্ত হই ১৯২০ সালে। তার পরে ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত নাচ শিক্ষায় আর কখনও ছেদ পড়েনি। কোচিনে কথাকলি নাচ ও সেখানকার কয়েক প্রকার লোকনৃত্যের চর্চাও করেছি ১৯৩১ সাল থেকে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত চারবার শ্রীলঙ্কায়

গিয়ে সে দেশের পুরুষদের ক্যান্ডি নাচ ভাল করে শিখেছিলাম।

১৯৩৭ সালে এক মাসের জন্য ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মায়ানমার) রেঙ্গুনে গিয়ে সেখানকার 'রামপোয়ে' নৃত্যনাট্যের অঙ্গভঙ্গি শিখেছিলাম একজন বয়স্ক নর্তকের কাছে। এর পরে ১৯৩৯ সালের মে মাসে তিন মাসের জন্য ইন্দোনেশিয়া (তৎকালীন জাভা-বালি-সুমাত্রা) গিয়ে শুরকর্তার নৃপতির ব্যবস্থাপনায় প্রথমে সেখানকার রাজবাড়ির নাচ, পরে এক মাস বলিদ্বীপে কাটিয়ে সেখানকার জনসমাজে প্রচলিত কিছু নাচের চর্চার সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম। নানা দেশের নৃত্যধারার চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতনের নাচকে মিশ্রণের দ্বারা সমৃদ্ধ করা। গুরুদেব আমাকে সর্বদাই বলতেন, অন্য খানের নাচ অল্প সময়ের পরিসরে যতটুকু শেখা সম্ভব ততটুকুই শিখে আসতে। বিশেষ করে সব অঞ্চলের নাচের পদছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলতেন। কেন তা বলতেন তা উপলব্ধ হবে আমাকে লেখা গুরুদেবের একটি চিঠি থেকে—'ওখানকার নৃত্যকলাও সম্পূর্ণ অভ্যাস করতে দীর্ঘকালের চর্চা আবশ্যক করে। কিন্তু কিছু কিছু ভঙ্গি সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। তার চেয়ে বেশি আমাদের দরকার হবে না। কেননা ওদের অনুকরণে আমাদের নিজস্ব নাচ চাপা দিলে হিতে বিপরীত হবে।' গুরুদেবের এই নির্দেশকে সম্বল করেই শান্তিনিকেতনে আমি মণিপুরি, কথাকলি, ক্যান্ডি, বার্মার রামপোয়ে ও জাভা-বালির নৃত্যকে স্বীকরণ করে সাজিয়ে নৃত্যরচনায় সমর্থ হয়েছিলাম।

এ ছাড়া আরও একটি দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়। সেটি হল, গানের ভাবানুযায়ী নৃত্যরচনা করে ছাত্রীদের নাচ শেখানো। এ-কাজে প্রথম হাত দিয়েছিলাম ১৯৩১ সালে 'নটীর পূজা' অভিনয়ের সময়। ১৯৩৪ সালের পর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যতজন মণিপুরি নাচের শিক্ষক শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই বেশ কিছুকাল ধরে গুরুদেবের গানের সঙ্গে নাচ কীভাবে তৈরি করতে হবে তারও শিক্ষা তাঁদের আমাকেই দিতে হত। কথাকলির ক্ষেত্রেও আমাকে তা করতে হয়। কোচিন রাজ্যের (বর্তমানের কেরল) দলবদ্ধ লোকনৃত্যগুলিকে গুরুদেবের গানের পঙক্তির সঙ্গে পর পর সাজিয়ে নিতাম, তাঁদের অবর্তমানে সেই নাচগুলি ভুলে যাবার সম্ভাবনা যাতে না দেখা দেয়, তার কথা ভেবে। জাপানের নো ও কাবুকি নাচের নর্তক মাকীকে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে 'মদন'-এর চরিত্রে এবং নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'য় 'দইওয়ালা'র ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য জাপানি পদ্ধতিতে নাচ রচনায় সাহায্য করেছি। মালয়েশিয়াবাসী একটি ছাত্রী এখানে নাচ শেখার জন্য সংগীতভবনে ভর্তি হয়েছিল। সে ছিল য়ুরোপের ব্যালে নাচে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাকে দিয়ে ব্যালে নাচের পদ্ধতিতে গুরুদেবের কয়েকটি বিশেষ গানের সঙ্গে এবং নৃতানাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'য় 'মদন' চরিত্রেও নৃত্যাভিনয় করিয়েছি। শ্যাম দেশে (বর্তমান ভিয়েতনাম) শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি আমেরিকান যুবতী এখানে নাচ শেখবার জন্য এসেছিল, তাকে দিয়ে শ্যাম দেশীয় নৃত্যভঙ্গিতেই 'মদন' চরিত্রে নৃত্যাভিনয় করিয়েছিলাম। জাভার 'তামানশিষ্য' বিদ্যালয়ের সুকর্ণ নামে এক যুবক বিশ্বভারতীর ছাত্র হিসাবে যোগ দেয়। সে জাভার নাচ কিছু জানত। তাকেও আমি এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের সঙ্গে তৈরি করে যুক্ত করে নিয়েছিলাম।

১৯৩৪ সালে, শ্রীলঙ্কার এক ধনী বৌদ্ধ পরিবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, গুরুদেবের সবঙ্গীণ শিক্ষাপদ্ধতিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করবার আগ্রহ নিয়ে। তাঁর নাম উইলমট পেরেরা। কলম্বো শহর থেকে প্রায় বিশ মাইল উত্তরে, ছোটখাটো একটি পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁর রবার গাছ ও চায়ের বাগান ছিল। জায়গাটির নাম ছিল "হোরানা"। দেশে ফিরে যাবার সময় তিনি গুরুদেবকে তাঁদের দেশে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ করে যান। সেই সঙ্গে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, শান্তিনিকেতনের একটি নৃত্যগীতের দল তাঁদের দেশে গিয়ে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান যেন করে। শিল্পাচার্য নন্দলালকে অনুরোধ করেন কলাভবনের শিল্পীদের চিত্রকলার প্রদর্শনীর জন্যে। গুরুদেব ও নন্দলালবাবু তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনে, 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি তৈরি ছিল বলে আমাদের বলা হয়েছিল সেটিই সেদেশে অভিনীত হবে। নন্দলালবাবুও কলাভবনের শিল্পীদের আঁকা চিত্রগুলি নির্বাচন করে

নিলেন। গুরুদেব, নন্দলাল, প্রতিমা দেবী, সুরেন কর, আমার পিতাসহ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো। গুরুদেবসহ সংখ্যায় বিরাট দল আমরা শ্রীলঙ্কার কলম্বো অভিমুখে সমুদ্রপথে যাত্রা করি কলকাতার বন্দর থেকে, ইন্‌চাঙা নামক একটি জাহাজে। কলম্বোর বন্দরে আমরা পৌঁছেছিলাম পঞ্চম দিনে। অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি দল গিয়েছিল স্থলপথে, ট্রেনে; মাদ্রাজ ও তালাইমানার হয়ে।

কলম্বো শহরে গুরুদেবের বক্তৃতা, চিত্রপ্রদর্শনী এবং শাপমোচনের অভিনয়ের দিনক্ষণ স্থির করে রাখা হয়েছিল, সে দেশে সকলের পৌঁছবার পূর্বেই। দু-একদিন বিশ্রামের পর নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান কলম্বো শহরে প্রথম হবার পর, সেখানকার সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা, Ceylon Daily News-এর সমালোচক ছবিসহ একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন, নাচ, গান ও সাজসজ্জার প্রশংসা করে। আমি "শাপমোচন"-এর প্রথম দৃশ্যে ইন্দ্রের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। সেখানে আমাকে ইন্দ্রের ক্রোধনৃত্য বা অভিশাপনৃত্য গুরুদেবের "হে মহা দুঃখ হে রুদ্র" গানটির সঙ্গে করতে হয়েছিল। পত্রিকার সমালোচক যে ভাষায় তার প্রশংসা করেছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি।

'Ceylon Daily News

Gifted Artiste

Mr. Santi Ghose, the finest dancer of the whole troupe, in his Indra's dance of wrath interpreted the violent emotions of a majestic anger, controlled but unforgiving, in a remarkable piece of dancing.

This gifted artiste has lived ... in the interior of Malabar learning the ancient ... art of Kathakali dance.

What Mr. Ghose learned from the ... dancers of Malabar has been blended with the precious genius of a master artiste and the dance has been purified into something rich and strange.'

এবারেই প্রথম, শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণের সময় গুরুদেবসহ আমরা সকলে সে দেশের বৌদ্ধ মন্দিরের পুরুষদের ক্যান্ডি নাচ দেখবার সুযোগ পাই এবং সকলেই তা দেখে মুগ্ধ হই। তখনই আমি স্থির করি ক্যান্ডি নাচ আমাকে শিখতেই হবে। মিঃ পেরেরা, তাঁর হোরানার বিদ্যালয়ে ক্যান্ডি নাচের চর্চার ব্যবস্থা পরে করেছিলেন। পেরেরার সঙ্গে কথাবার্তা অনুসারে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত প্রতি গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটির সময় হোরানায় গিয়ে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে ক্যান্ডি নাচ শিখেছি। আমার এই ক্যান্ডি নাচের শিক্ষাকে কার্যকরীভাবে শ্রীলঙ্কায় এবং শান্তিনিকেতনে কীভাবে সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলাম তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে অন্যত্র দিয়েছি বলে এখানে তার পুনরুক্তি করবার প্রয়োজন নেই।

১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মোট চারবার শ্রীলঙ্কায় গিয়ে ক্যান্ডির পুরুষোচিত নাচ শিখে এসে গুরুদেবের উদ্দীপক গানের সঙ্গে সেই নাচের ভঙ্গিকে মিশিয়ে বলিষ্ঠ জোরালো নাচে নিজে যেমন নেচেছি অন্যদেরও তেমনই নাচিয়েছি।

শান্তিনিকেতনে কত্থক নৃত্য

এলাহাবাদের কত্থক নৃত্যে পারদর্শিনী আশা ওঝা নামে একটি শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে এসেছিল নৃত্য শিক্ষার্থে। গুরুদেব তার কত্থক নৃত্য দেখে খুশি হয়ে তাকে তখনকার 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যে যুক্ত করবার অভিমত প্রকাশ করেন। আমি তাকে 'উত্তীয়' চরিত্রে

অভিনয়ের দায়িত্ব দিই। তাকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলাম, খাঁটি কথক নৃত্যের মাধ্যমেই ওই চরিত্রটিতে তাকে নৃত্যাভিনয় করতে হবে। আমার কাছে বুঝে নিয়ে সে কথক শৈলীতেই নাচ তৈরি করে 'উত্তীয়'র ভূমিকায় নেচেছিল। তার সাফল্যে গুরুদেব, প্রতিমা দেবী, শিল্পাচার্য নন্দলাল থেকে এখানকার দর্শকদের সকলকেই সে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গানটি গুরুদেব প্রথম রচনা করেছিলেন ১৯৩১ সালে জাপানি কুস্তি বা জুডো প্রদর্শনীর উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে। এই কুস্তির কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রাথমিক ব্যায়াম শিক্ষার্থীদের শিখতে হত সারিবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করার ছন্দে। দলবদ্ধ সেই ব্যায়ামের কতকগুলি অঙ্গভঙ্গিকে ওই গানটির পঙক্তির সঙ্গে সাজিয়ে তাসদ্বীপের চরিত্রানুযায়ী নাচ তৈরি করে, ছাত্রীদের মধ্যে যারা জুডো শিখেছিল তাদের দিয়ে নাচিয়েছিলাম। ওই নাচটির বিষয়ে একটি চিঠিতে প্রতিমা দেবীকে গুরুদেব লিখেছিলেন— 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা গানটাতে যে নাচ ওরা লাগিয়েচে, সে নতুন ধরনের, সেটাতে খুব এনকোর পেয়েচে।'

ক্যান্ডি নাচ

শ্রীলঙ্কার পুরুষদের ক্যান্ডি নৃত্যের প্রাচীন প্রথা হল গানের ছন্দের সঙ্গে পায়ের ছন্দ মিলিয়ে দুই হাতে সাধারণত কয়েকটি ভঙ্গির প্রদর্শন। গানের সঙ্গে নাচ হলেও তালবাদ্যে ছন্দের প্রাধান্য বিশেষ গুরুত্ব পায়। এটি মুদ্রাভিনয় নয়, দলবদ্ধ নাচ। সারিবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে সামনের দিকে এগিয়ে চলার নাচ।

শ্রীলঙ্কার হোরানার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে রামায়ণের 'সীতাহরণ' এবং জাতকের 'সিদ্ধান্তদায়' গল্প অবলম্বনে ক্যান্ডি নাচ ও আমার কাছে শেখা মণিপুরি নাচ সহযোগে ওই দুটি গল্প নৃত্যে অভিনয় করিয়েছিলাম। এতে গান ছিল না। তালবাদ্যে নানা প্রকার ছন্দকে ভাবানুযায়ী সাজিয়ে নৃত্যাভিনয় করাই। গল্পের মধ্যে সৈনিকদের অনুপ্রবেশের কথা ছিল। ডান হাতে তলোয়ার নিয়ে কীভাবে বাজনার তালে যুদ্ধাভিনয় করতে হবে তাও দেখিয়ে দিই। নাচটি ক্যান্ডি নাচের সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। দর্শকমাত্রই তা দেখে খুশি হয়েছিলেন।

১৯৩৮-এ শান্তিনিকেতনে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের সময় 'কোটাল' এবং 'উত্তীয়' চরিত্রে অভিনয় করেছিল শ্রীলঙ্কা থেকে আগত সঙ্গীতভবনের নৃত্যকলার ছাত্র অনঙ্গলাল। সে ছিল তাদের দেশের ক্যান্ডি নাচে পারদর্শী। তাকে কোটালের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্যান্ডি নাচের তালে ঘাতকের ভাবধারা অবলম্বনে নাচটি কীভাবে করবে এবং শেষ দিকে তেহাই-এর সঙ্গে উত্তীয়ের উপরে তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের সব আলো নিভিয়ে দিতে বলেছিলাম। অনঙ্গলাল আমার নির্দেশমতো তালের সঙ্গে নাচে ঘাতকের উন্মাদনা প্রকাশ করে এবং তেহাই-এর সময় ঠিকমতো ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের সব আলো নিভে যেত। দৃশ্যটি দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। অনঙ্গলালকে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে তাদের ক্যান্ডি নাচকে বেশ খানিকটা মোলায়েম করে 'দইওয়ালা'র চরিত্রের অভিনয়ও শিখিয়ে দিতে হয়েছিল।

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে 'হো, এল এল এল রে'— দস্যুদের এই গানটির সঙ্গে চারটি ছেলেকে নাচের জন্য নির্বাচন করা হয়। তাদের ডান হাতে রুপালি কাগজে মোড়া কাঠের তলোয়ার ছিল। বাঁ হাতে ছিল রঙিন নকশাকাটা হালকা ঢাল। গানের কথা শেষ হবার পরই উদ্দাম ক্যান্ডি নাচের ঢঙে তালের সঙ্গে যুদ্ধের নাচ করাতাম তাদের দিয়ে। এই যুদ্ধনৃত্যটিও দর্শকদের মনকে খুবই নাড়া দিত।

১৯৩৬ সালে মে, জুন ও জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কায় ক্যান্ডি নাচ শেখবার সময় শ্রীপল্লী বিদ্যালয়ের একদল ছেলেমেয়েকে বেছে নিয়ে গুরুদেবের গান এবং তার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ঢঙে নাচ,

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহে শিখিয়েছিলাম। কলম্বো শহরে সেইসব ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আগ্রহে পুরোপুরি ক্যান্ডিনাচের নর্তকদের মতো সাজ-পোশাকেও আমাকে একলা কয়েকটি ক্যান্ডিনাচ দেখাতে হয়েছিল। নাচে বৈচিত্র্য আনবার উদ্দেশ্যে আমি তলোয়ার হাতে একটি যুদ্ধনৃত্যও করেছিলাম। ক্যান্ডিনাচের নর্তকদের মধ্যে এ ধরনের নাচের প্রচলন ছিল না। সে দেশের দর্শক ক্যান্ডি নাচের নতুন রূপের পরিচয় পেয়ে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের অগস্ট মাসে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের পর আমি কলাভবনের ছাত্রদের দিয়ে মুখোশ ধারণ করে নৃত্যাভিনয় করাবার জন্য শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছে অনুমতি চাই। তিনি সানন্দেই আমাকে অনুমতি দেন এবং এ কথাও বলেছিলেন, মুখোশের জন্য ভাবতে হবে না। তিনিই তার ব্যবস্থা করে দেবেন। সাজ-পোশাকের দায়িত্বও তিনি নেবেন। তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে 'রাবণের কাণ্ড' নামে রামায়ণের সীতাহরণের অংশটিকে নিয়ে নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী কয়েকটি দৃশ্যে সাজিয়ে নিয়েছিলাম। গল্পটির আরম্ভ ও শেষ হয়েছিল এইভাবে। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের পঞ্চবটী কাননের জীবনযাত্রা। শূর্পনখার আগমন, নাসিকা কর্তন। রাবণের দরবারে কর্তিতনাসা শূর্পণখার উপস্থিতি ও রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। রাবণের ক্রোধ। পঞ্চবটীতে স্বর্ণমৃগ প্রেরণ। স্বর্ণমৃগ দর্শনে সীতা সেটিকে ধরে আনবার জন্যে রামকে অনুরোধ। স্বর্ণমৃগকে ধরে আনতে রামের গমন ও মৃগবধ। এদিকে অপেক্ষমাণা সীতা পুষ্পমালা রচনায় রত। তাঁদের কুটিরের সামনে লক্ষ্মণের পদচারণা। সহসা রামের কণ্ঠের আর্তনাদ শুনে সীতার মানসিক অস্থিরতা এবং রামের সন্ধানার্থে লক্ষ্মণকে প্রেরণ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণকে যেতে হল। কিন্তু যাবার আগে চতুর্দিকে গণ্ডি কেটে সীতাকে তার বাইরে না যেতে অনুরোধ করে গেলেন। সন্ন্যাসীবেশে রাবণের প্রবেশ ও তাঁকে লক্ষ্মণ-রচিত রেখার বাইরে আসার জন্য সীতা প্ররোচিত। রাবণ নিজমূর্তি ধারণ করে বলপূর্বক সীতা-অপহরণ। নন্দলালবাবু কলাভবনের মিউজিয়মে রক্ষিত চিন, জাপান ও আমাদের পুরুলিয়ার নানাপ্রকার মুখোশে রামায়ণের চরিত্রগুলিকে সাজিয়েছিলেন। এই নৃত্যনাটিকায় কোনও গান ছিল না। নৃত্যাভিনয়ের সময় সঙ্গীত ও কলাভবনে রক্ষিত চিন জাপান ব্রহ্ম ও যবদ্বীপের নানাপ্রকার তাল ও সুরের যন্ত্র দ্বারা চরিত্রানুযায়ী চাল-চলনের ছন্দে সুর রচনা করে নেওয়া হয়। নাটকে নারীচরিত্রে ছাত্রদেরই সাজিয়ে ছন্দে মূকাভিনয় করতে হয়। নাটকটি সিংহসদনের মঞ্চে অভিনীত হয়। এমন জমে গিয়েছিল যে, এখানকার দর্শকদের ঐকান্তিক অনুরোধে ২৪ থেকে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত পর পর পাঁচদিন সন্ধ্যায় অভিনয় করতে হয়। গুরুদেব অভিনয়ের প্রশংসার কথা শুনে দ্বিতীয় দিন দেখতে এসে শেষ পর্যন্ত বসে দেখেছিলেন। তিনি যে খুশি হয়েছিলেন অভিনয়ের পরই আমাকে ডেকে তা বললেন। 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকার সংবাদে বলা হয়েছিল, 'The Kala Bhavan students gave a remarkable exhibition of Mask dancing in an inprovised skill called 'Rabaner Kanda'. The show was a great success and being absolutely a new idea, came as a very pleasant surprise to all of us.'

শান্তিনিকেতনে, "রাবণের কাণ্ড" নামে মুখোশ নৃত্যাভিনয়টি অনুষ্ঠিত হবার সময় কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এক সংবাদদাতা এখানে ছিলেন। তিনি নাটকটি দেখে, তাঁর মতামত পত্রিকায় যে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, তা হল :—

'৩০ অগস্ট ১৯৩৬

শান্তিনিকেতনে নৃত্যাভিনয়

"গত ২৫শে, ২৬শে ও ২৮শে অগস্ট শান্তিনিকেতনে নৃত্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের সাহায্য ও নৃত্যবিশারদ শান্তিদেব ঘোষের প্রযোজনায় ও পরিকল্পনায় কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা নূতন ধরনের নৃত্যাভিনয়ে শান্তিনিকেতনবাসী ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সদর হইতে আগত বহু দর্শককে বিমুগ্ধ করিয়াছে। শান্তিনিকেতনের নৃত্য ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ নূতনত্ব দান করিয়াছে ; এই নৃত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে এবং বাংলাদেশে ইহা যে নতুনতম পথপ্রদর্শক

হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

"নৃত্যাভিনয়ের আখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহার বিষয়বস্তু 'সীতাহরণ'। রাবণের সভায় সুর্পণখার নৃত্য, মায়ামৃগ সাজিয়া মারিচের সীতাকে লোভ দেখানো, সন্ন্যাসী সাজিয়া রাবণের সীতাকে হরণ এবং রাবণের সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা ও তৎপর সীতার প্রতি ক্রোধ,— এই কয়েকটি বিষয়বস্তু নৃত্যের মধ্য দিয়া চিন দেশীয়, জাপানি, জাভা ও ভারতীয় নানারূপ যন্ত্রসঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা হইয়াছিল। সিংহলের ক্যান্ডিয়ান নৃত্য, মালাবারের কথাকলি, মণিপুরী ও জাভার নৃত্যের মধ্য দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরল ও সুন্দরভাবে এই আখ্যানবস্তুকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। পুরাণকে অবলম্বন করিয়া ও পুরাণের গল্পের ভিতর দিয়া ভারতীয় নৃত্য যেভাবে জমিয়া উঠিতে পারে, এই পৌরাণিক আবহাওয়া হইতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে তাহা উপভোগ করা যায় না। ভারতীয় ওস্তাদগণ যেরূপ টেকনিক ও তান মান লয়ের কাজ দেখাইতে যাইয়া গানকে নীরস ও প্রাণহীন করিয়া তোলে, তেমনি ক্যান্ডিয়ান বা কথাকলি নৃত্যে টেকনিক ও কলাকৌশল দেখাইবার প্রতি বেশি ঝোঁক দিলে সাধারণ দর্শকের কাছে তাহা অত্যন্ত একঘেয়ে ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু শান্তিদেব ঘোষ টেকনিককে বজায় রাখিয়া ও নৃত্যকে সরল, মনোরম ও প্রাণস্পর্শী করিয়া বর্তমান কালের দর্শকদের রুচি অনুযায়ী করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তিনি এই নৃত্যাভিনয়ের মধ্য দিয়া ভারতীয় নৃত্যের আবেগজনিত গতিভঙ্গির ছন্দোবদ্ধ লীলাকৌশল, বীর্য ও শক্তির দিকটা চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সীতার প্রতি ক্রোধোন্মত্ত রাবণের ভূমিকায় তিনি ক্যান্ডিদেশীয় নৃত্যের পৌরুষ ও ভীষণতাকে যেভাবে রূপ দিয়াছেন তাহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। শূর্পনখা, লক্ষ্মণ ও সীতার নৃত্যে বৈচিত্র্য ছিল এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মায়ামৃগের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করিয়াছে। হরিণের গতি ও ভঙ্গি নৃত্যের মধ্যে দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া যথেষ্ট নিজস্বতার পরিচয় দিয়াছেন। রামের বাণবিদ্ধ হরিণের মৃত্যুদৃশ্যটি বিশেষ করুণ ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। এই নৃত্যাভিনয়ের আর একটি বিশেষত্ব যে, ইহা সম্পূর্ণ মুখোশ নৃত্য।

"শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের পরিকল্পনায় নানা দেশীয় মুখোশ ও সাজ-সজ্জা দর্শকদের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দর্শকরূপে এই নৃত্যাভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শীঘ্রই তিনি মূল রামায়ণ হইতে পৌরাণিক গল্প অবলম্বন করিয়া এই ধরনের নৃত্যাভিনয় উপযোগী একটি কাহিনী লিখিবেন বলিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে আমি নিজের উৎসাহে গুরুদেবের 'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যের কচ ও দেবযানী চরিত্র দুটি নিয়ে আবৃত্তির ছন্দে নৃত্যাভিনয় করব বলে মনস্থির করে, এই দুটি চরিত্রের কথাকে সংক্ষেপে করে নিয়েছিলাম। কিন্তু কেটেছেঁটে ঠিকমতো সংক্ষেপ করতে পেরেছি কি না তা নিয়ে মনে সন্দেহ জাগে। শেষ পর্যন্ত একদিন সাহস করে গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হই। তিনি সব দেখেশুনে আমাকে নিরুৎসাহ তো করলেনই না, বরং কবিতাটি দেখে প্রতি চরিত্রের কতটুকু থাকবে, কতটুকু বাদ দিতে হবে মুখে বুঝিয়ে বলে কালিকলমে তা চিহ্নিত করে দিলেন। সে সময়ে 'মায়ার খেলা' গীতিনাটিকাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করার কাজ শেষ হয়েছিল। কবিতার দেবযানীর কথার সঙ্গে খাপ খায়, সেইরূপ তিনটি গান তাতে জুড়ে দিয়েছিলাম। গান তিনটি হল—'দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি', 'যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে' এবং 'যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল'। ভাল করে তৈরি করে একদিন সন্ধ্যায় 'উদয়ন' বাড়ির সভাগৃহে গুরুদেবসহ অনেকের সামনে গান ও আবৃত্তির ছন্দে অভিনয় করেছিলেন—দেবযানী চরিত্রে মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিকে নন্দিতা দেবী (বুড়ি) আর কচের ভূমিকায় কথাকলি নাচের শিক্ষক কেলু নায়ার নৃত্যাভিনয় করেছিলেন কথাকলি নাচের ঢঙে।

আমার জাভা যাত্রাকালে ব্রহ্মদেশে এক মাস ছিলাম। সেখানকার বেঙ্গলি স্কুলের ছাত্রীদের অভিনয় করিয়েছিলাম—বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ থেকে উর্বশীর জন্ম-বৃত্তান্ত—খোলবাদ্যের ছন্দে।

বিশ্বভারতীতে কাজের ফাঁকে শান্তিনিকেতনে এবং বিদেশে ভ্রমণকালে নিজের চেষ্টায় ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করেছি এবং তাতে মনে আনন্দও পেয়েছি প্রচুর।

এ ভাবে নৃত্যাভিনয় রচনার প্রেরণায় ভিন্নপথে চলবার সাহস আমার মনে জুগিয়েছিলেন গুরুদেব এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল। 'রাবণের কাণ্ড' মুখোশ নৃত্যটি গুরুদেবের তিরোধানের কয়েকবছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতার রঙ্গমঞ্চে পর পর কয়েকটি সন্ধ্যায় অভিনয় করিয়েছিলাম, সেখানকার পেশাদার নর্তক-নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রীদের দিয়ে। তখন নাটিকাটির নাম বদল করে, নামকরণ করেছিলাম—'সীতাহরণ'।

এবারে মুখোশ তৈরি করানো হয়েছিল কলকাতার এক শিল্পীর পরিচালনাধীনে। দেশি যন্ত্রসঙ্গীতের জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিমিরবরণসহ তাঁর যন্ত্রীদল। নৃত্যাংশে যুক্ত হয়েছিলেন কলিকাতার কিছু পেশাদারী নৃত্যের যুবক-যুবতী। আমিও ছিলাম নৃত্যে একটি চরিত্রে। শান্তি বর্ধন নামে একটি যুবক এই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সে গুজরাত ও বম্বেতে একটি নৃত্যদল গঠন করে সীতাহরণের মতো একটি মুখোশ নৃত্যাভিনয় করত বলে শুনেছি।

কলকাতায় আমি যখন সীতাহরণ মুখোশ নৃত্যাভিনয় করাই তখন হুবহু শান্তিনিকেতনের ঢঙে তা করাতে পারিনি, মুখোশ, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের কারণে। তাঁদের সামর্থ্যানুযায়ী আমাকে নূতনভাবে সব কিছুকেই সাজিয়ে নিতে হয়েছিল। কলকাতার দর্শকেরা তা দেখে খুবই খুশি হন।

শান্তিনিকেতনের বর্তমান নৃত্য আন্দোলন বিষয়ে একটি কথা এখানে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। অন্যত্র বলেছি যে, আমাদের দেশে ক'টি প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের ধারা এখনও প্রচলিত আছে, তার সবকটিই সেই সব অঞ্চলের ভাষার গানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের নৃত্য আন্দোলনের সুবিধার্থে প্রথম যখন মণিপুরি নৃত্য ও পরে যখন কথাকলি নৃত্যের শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়, তখন তাঁদের সঙ্গে কেবল একজন তালবাদক নিযুক্ত হতেন। তাঁদের সঙ্গে সেই নাচের প্রয়োজনীয় গানের জন্যে কোনও গায়ককে নিযুক্ত করা হত না। এর একমাত্র কারণ ছিল, গুরুদেবের নানা পর্যায়ের গান ও নৃত্যনাট্যের গানগুলি। এখানে, মণিপুরি ও কথাকলি নৃত্যের তালবাদ্যের নানা প্রকার ছন্দোবদ্ধ নাচ শেখার পর গুরুদেবের গানের ভাবানুযায়ী নানা প্রকৃতির নাচ তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়েছে। গুরুদেবের গানের সঙ্গে সেইসব নাচ কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে, নতুন শিক্ষকদের এখানে এসে প্রথমে কিছুকাল তার শিক্ষাও নিতে হত। কিন্তু, গুরুদেবের পরলোকগমনের পর এবং আমি যখন প্রায় এক দশক সঙ্গীতভবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তখন সঙ্গীতভবনের কথাকলি নাচের শিক্ষক দাবি তুললেন কথাকলি নাচের গায়ককেও নিযুক্ত করতেই হবে। তা না হলে ওই নাচের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে। তাঁর এই দাবি সঙ্গীতভবনের তখনকার পরিচালকগণ বিনা বিচারে মেনে নিলেন। মালায়লি ভাষার কথাকলি নাচের গায়ক নিযুক্ত হলেন। সেই থেকে তাঁরা এখনও রয়ে গেছেন। মণিপুরি নাচের শিক্ষকও কথাকলি নাচের দেখাদেখি, সেই নৃত্যের একজন গায়ককে নিযুক্ত করার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তাঁর দাবিও মেটানো হল, বিনা বিচারে। পূর্বে, প্রায় বিশ বছর, মণিপুরি ও কথাকলি গায়ক ছাড়া কীভাবে শান্তিনিকেতনের নৃত্য আন্দোলন গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল তার প্রতি সঙ্গীতভবনের পরিচালকরা চিন্তাভাবনা করলেন না।

এখনও পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে পূর্ব যুগের আদর্শেই নৃত্য পরিবেশিত হচ্ছে। মণিপুরি ও কথাকলি নাচের গানের কোনও স্থান নেই সেখানে। কেন তা নেই, এ প্রশ্নের উত্তর সঙ্গীতভবনের পরিচালক ও নৃত্য শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এর একমাত্র কারণ হল গুরুদেব কর্তৃক এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের প্রবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবার ইচ্ছা কারও মধ্যে নেই। মালাবারের 'কেরলা কলামণ্ডলম' বা মণিপুরের ইম্ফল শহরে প্রতিষ্ঠিত নৃত্য বিদ্যালয়ের মতো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ধারায় এখানকার ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও তার সম্ভাবনা নেই। তথাপি ওই দুই ধারার নৃত্যের গায়ক-গায়িকারা রয়েছেন গান শেখাবার জন্যে নয়। যার প্রয়োজন পূর্বে যেমন ছিল না, এখনও নেই।

ভারতবর্ষে নৃত্যের যে বিকাশ ঘটেছে তার প্রধান অবলম্বন বরাবরই ছিল গান। যার প্রভাব এ যুগেও ব্যাহত হয়নি। ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য, মণিপুরি, কত্থক, কথাকলি, কুচিপুড়ি, ওড়িশি প্রভৃতি

নৃত্যাভিনয় যে আঞ্চলিক ভাষার গানের উপর গঠিত, সে কথা ভারতীয় নৃত্যানুরাগী মাত্রেই ভাল করে জানেন। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে নানাবিধ লোকনৃত্যের প্রচলন আজও আমরা যা দেখি, সেগুলিও পরিবেশিত হয় বা উপস্থাপিত হয় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষার গানের দ্বারা। গানের সঙ্গ ছাড়া, উচ্চ ও নীচ কোনও সমাজেই প্রাচীন নৃত্যধারার অস্তিত্ব আশা করা যায় না। কিন্তু এই গান-ভিত্তিক সর্বস্তরের নৃত্যকলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রকৃতির তালবাদ্যের বিচিত্র ছন্দের তাল। গানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তালবাদ্যের ছন্দের সঠিক প্রয়োগ ছাড়া নাচগুলি অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে।

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের প্রচেষ্টায় বিংশ শতকের উপযোগী যে নৃত্যধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তারও মূল ভিত্তি হল গান। এদিক থেকে তিনি ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রথাকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পথেই তিনি আমাদের পরিচালিত করে গেছেন। য়ুরোপের আদর্শে সঙ্গীতের সুর ও ছন্দকে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। এই কারণেই তিনি বিভিন্ন প্রকৃতির গান, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য রচনা করে গেছেন একটানা, বছরের পর বছর। সবই তিনি করেছেন এখানকার নৃত্য-আন্দোলনে বিকাশের কথা ভেবে। তাঁর কবিতার আবৃত্তির সঙ্গেও নৃত্যের ব্যবস্থা করে তিনি এখানকার নৃত্যাভিনয়কে পুষ্ট করেছেন। কেবলমাত্র যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা এখানকার নাচকে পুষ্ট করবার প্রয়োজন আছে বলে তাঁর মনে হয়নি। কিন্তু আমি যখন কয়েক প্রকার দেশি যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে নৃত্যাভিনয় করিয়েছি, তখন সেইরূপ পরীক্ষাকে তিনি সমর্থন করেছেন। পূর্বেই জানিয়েছি গুরুদেব দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রকার নাচ থেকে এখানকার নৃত্য-আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন দিকটিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তার নির্দেশ সর্বদাই দিতেন। এইভাবেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনকে গান ও কবিতা-নির্ভর যুগোপযোগী একটি নতুন আন্দোলনে পরিণত করে যেতে পেরেছিলেন। এ যুগে গান-নির্ভর নৃত্য-আন্দোলনের পরিচয় আর কারও নৃত্যমাধ্যমে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে তিনি একক।

শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষার প্রয়োজনে মণিপুরি-কথাকলিসহ আরও কয়েকটি নাচের শিক্ষক ১৯২০ সাল থেকে গুরুদেবের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সর্বদাই তাল-বাদ্যের প্রয়োজনে একজন করে থাকতেন। সেইসব নাচের গানের জন্য কোনও গীতকারকে নিযুক্ত করা হত না। এর একমাত্র কারণ হল গুরুদেবের গানই তার স্থান পূরণ করত।

ভারতীয় নৃত্যাভিনয় পদ্ধতির উদ্ভব অতি প্রাচীনকাল থেকেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নৃত্যভঙ্গির দ্বারা অভিনয়ের যে পদ্ধতি তখন গড়ে উঠেছিল এবং তা যাতে লুপ্ত হয়ে না যায়, তার জন্যেই নাট্যশাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রণেতা সেই নৃত্যাভিনয় পদ্ধতিকে চিরস্থায়ী করে রাখার কথা ভেবে ওই গ্রন্থটি রচনা করে গিয়েছিলেন। সেই নৃত্যাভিনয়ের ধারাকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আকারে ধরে রাখা যদিও সম্ভব হয়নি, কিন্তু মূল ধারার প্রতি আস্থা রেখেই পরিবর্তন যুগে যুগে ভারতীয় নৃত্যগুরুরা করে গেছেন। আঞ্চলিক ভাষার গানের কথা, সুর ও তালের কারণেই হয়ত এই পরিবর্তন ঘটেছিল। যার পরিচয় আমরা আজও পাচ্ছি কথাকলি, ভরতনাট্যম, কুচিপুডি প্রভৃতি নৃত্যের মাধ্যমে। এইসব অঞ্চলের নৃত্যনাট্য যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত সে কথাই তিন অঞ্চলের নৃত্য-গবেষকরা বিশেষভাবে বলে গেছেন। কথাকলি নৃত্যাভিনয় কেরল রাজ্যের মলয়ালম ভাষার গান ও তালের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। তামিলভাষী মানুষ তাঁদের মাতৃভাষায় গান রচনা করে প্রাচীন যুগের নৃত্যাভিনয় ধারাকে নিজেদের ইচ্ছামতো সাজিয়ে নিয়েছেন। একই পথে চলেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের নৃত্যগুরুরা। অন্ধ্রের প্রাদেশিক তেলুগু ভাষার গানের দ্বারা কুচিপুডি নাচ যেভাবে গড়ে উঠেছিল তা দেখে সহজেই বোঝা যায় যে কুচিপুডিও ওইরূপ প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতিকে মূল ভিত্তি করেই গঠিত। গানের কথা, সুর ও তালের প্রভাবে নিজেদের প্রয়োজনমতো খানিকটা নতুন করে সাজিয়ে নিতে হয়েছে।

আমার অনুমান, বৌদ্ধ যুগের প্রারম্ভে, নৃত্যাভিনয়ের দ্বিতীয় আর একটি ধারার উদ্ভব হয়েছিল গানের মাধ্যমে। এই ধারাটি ভরতনাট্যম-এর মুদ্রাভিনয়ের পদ্ধতিকে গ্রহণ করেনি। তাঁদের

নৃত্যাভিনয়ের ধারা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মতো মুদ্রাভিনয় নয়। তাঁরা আঞ্চলিক গানের কথা, সুর ও তালকে অবলম্বন করে, নাচের সময় হাতের ভঙ্গিকে যেভাবে প্রয়োগ করে গেছেন তাকে মুদ্রাভিনয় কোনও মতেই বলা চলে না। এই নৃত্যধারার পরিচয় এখনও ভারতবর্ষে অসমের বৈষ্ণবদের সত্রের নাচ, মণিপুরের বৈষ্ণবদের মহারাস এবং কথক প্রভৃতি কতকগুলি নৃত্যাভিনয়ের সময়ে আমরা পাই। এ ধরনের নৃত্যাভিনয়ের সময় হাতের পাতা ও অঙ্গুলিকে বিশেষ একটি ঢঙে সাজিয়ে সমগ্র হাত দুটিকে গানের তালে ও ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করা হয়।

শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব

ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে ঋতুবৈচিত্র্য অত্যন্ত প্রকট এবং আমাদের জীবন ও মনে তার প্রভাব বা অনুভূতির প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। ভারতের ছটি ঋতু— গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত প্রতিটি নরনারীর মনে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। ভারতবাসী সব ক'টি ঋতুর আগমন ও নির্গমনকে অন্তরে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। সেই কারণেই এখানকার মানুষ প্রতি ঋতুকে কেন্দ্র করেই নানা প্রকার আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে এসেছে যুগে যুগে। ভারতের মানবসমাজের যাবতীয় ঋতু উৎসবেরই মূল লক্ষ্য ছিল চিত্তবিনোদন। প্রতি ঋতুতেই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দিনকে বেছে নিয়ে, বছরের পর বছর বিচিত্র ধরনের উৎসবের আয়োজন হয়ে এসেছে।

বেদ-উপনিষদের যুগে, রামায়ণ-মহাভারতের এবং বৌদ্ধ ও জৈন যুগে, ঋতুকে ভিত্তি করে নানা আনন্দানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য যুগেও সমান উৎসাহে তা প্রতিপালিত হত। মুসলমানদের সাতশো বছরের রাজত্বকালে ভারতের জনসমাজ নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে লালনপালন করে এসেছে। ইংরেজদের শাসনের যুগেও তার ছেদ ঘটেনি, বিশেষ করে গ্রামসমাজে। প্রাচীন যুগ থেকে এখানে বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী যতরকম উৎসবের প্রচলন ছিল, তার বিস্তারিত খবর আমরা পাই প্রাচীন সাহিত্য, কাব্য ও ধর্মশাস্ত্র থেকে। সে যুগের রাজা-মহারাজা ও নগরের ধনী নাগরিক সমাজের প্রচেষ্টায় চিত্তবিনোদনের জন্য নানা প্রকারের আনন্দানুষ্ঠান হত। মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্রম' শাস্ত্রগ্রন্থে, খ্রিস্টপূর্ব ভারতের রাজা-মহারাজা ও নগরের ধনীসমাজে প্রচলিত নানা প্রকার আনন্দানুষ্ঠানের বিস্তারিত যে তালিকা দিয়ে গেছেন তার থেকে, কয়েকটিরই মাত্র পরিচয় দিচ্ছি। যথা ঘটানিবন্ধন— দেবতার উৎসব দিনে নাগরকদের সম্মেলন। গোষ্ঠীসমবায়— বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে সম্মিলন। উদ্যানগম— উদ্যানবিহার, জলবিহার প্রভৃতি। পক্ষ বা মাসের তিথিগুলিতে কলাবিদ্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর ভবনে পরস্পর সম্মেলন অবশ্যকর্তব্য ছিল। গণিকা-গায়ক-বাদক-নট-নটী ও নর্তকরা এইসব অনুষ্ঠানে প্রধান স্থান পেত। ছয় ঋতুর যে সকল দিনে বা রাত্রিতে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা আনন্দানুষ্ঠান হত, মহর্ষি বাৎস্যায়ন তার কথাও বলে গেছেন তাঁর 'কামসূত্রম' শাস্ত্রগ্রন্থে। যেমন দীপান্বিতা অমাবস্যা, কোজাগরি পূর্ণিমা, মদনত্রয়োদশী ক্রীড়া, বসন্ত ঋতুতে সহাকার ভঞ্জিকা ক্রীড়া, আগুনে পুড়িয়ে ছোলা-মটর ভোজন, পদ্মের মৃণাল ভোজন, প্রথম বর্ষায় বনভোজন, পিচকারি যোগে জল প্রেক্ষণ, অপর দেশে পাঞ্চালী ভাবা প্রভৃতির অনুকরণ, শাল্মলী বৃক্ষ আশ্রয় করে তার পুষ্পসম্ভারে বিভূষিত আমোদ, বৈশাখ শুক্লচতুর্থীতে পরস্পরের গাত্রে সুগন্ধ যবচূর্ণ প্রেক্ষণ, শ্রাবণ শুক্লতৃতীয়ায় ঝুলন, মদন প্রতিমা পূজা, চৈত্র শুক্ল চতুর্দশী, মদন বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গ করে তার দ্বারা মদন পূজা, 'হোলকা' উৎসব। অশোকপুষ্পের কিরীট পরিধান, ফুল কুড়নো খেলা, আম্রমুকুলে কর্ণভূষণ রচনা। ইক্ষুখণ্ড দ্বারা সজ্জিত হওয়া। নাগরকগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে কদম্ব পুষ্প ক্ষেপণে যুদ্ধ। কিন্তু মহর্ষি বাৎস্যায়ন বিশেষ করে লিখে

গেছেন এই কথা জানিয়ে যে, এই সকল ও অন্যান্য সর্বদেশ-প্রসিদ্ধ ও প্রাদেশিক ক্রীড়ায় নাগরক দলের সহিত সাধারণেরাও যোগ দিতে পারবে।

যদিও মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্রম' গ্রন্থে খ্রিস্টপূর্ব যুগের রাজা-মহারাজা ও নগরের ধনীসমাজের চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী সারা বছরের আয়োজিত আনন্দানুষ্ঠানের কথাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তবুও তিনি গ্রামসমাজের আনন্দানুষ্ঠানের কথাও তাঁর গ্রন্থে বলে গেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'গ্রামবাসীব্যক্তি স্বজাতীয় বিচক্ষণ কৌতূহলপরায়ণ ব্যক্তিগণকে প্রোৎসাহিত করে নাগরক জনের বৃত্ত বর্ণন করত শ্রদ্ধা সম্পাদক-পূর্বক তাহার অনুকরণে প্রবর্তিত করিবে, গোষ্ঠীর প্রবর্তন করিবে, মিলিয়া মিশিয়া লোকের অনুরঞ্জন করিবে, প্রত্যেক কর্মে সাহায্য করিবে এবং পরস্পরে উপকার করিবে।' মহর্ষি বাৎস্যায়নের এই উক্তিটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তখনকার দিনে নগর ও গ্রামসমাজের আনন্দানুষ্ঠানগুলি একই প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলায় প্রচলিত ছিল। 'কামসূত্রম' গ্রন্থ থেকে 'হোলকা' নামে যে আনন্দানুষ্ঠানটির উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি, সেটি হল এ যুগের দোল-পূর্ণিমার দিনের হোলি উৎসবের মতো একটি আনন্দানুষ্ঠান।

প্রাচীন যুগের সমাজব্যবস্থার সঠিক পরিচয়ে আমরা জানতে পারছি যে, তখনকার নগর ও গ্রামের মানবসমাজের যাবতীয় আনন্দানুষ্ঠান পূর্ণিমা অমাবস্যা ও নানা তিথি-নক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কোন কোন আনন্দানুষ্ঠান কোন ঋতুতে, কোন মাসে, কখন করতে হবে, তাকে প্রাচীনেরা যেরূপ শৃঙ্খলার সঙ্গে পালন করতেন, তার কিছু নমুনা এখনও এ যুগের বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে যুক্ত, আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে আমরা পাই— ঝুলন, সরস্বতী পূজা, দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, দেওয়ালি, কালী পূজা প্রভৃতির মতো উৎসবে। এ ছাড়া ছোট-বড় আরও কয়েক শত ব্রত, পরব ও আনন্দক্রীড়া এখনও ভারতের জনসমাজে পূর্ণিমা ও নানা তিথিনক্ষত্রের বিচারে নিয়মিত পালিত হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর, এখানকার ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-কর্মী ও তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সমাবেশে যে একটি মানবসমাজ গড়ে উঠেছিল, সেই সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে, তাঁদের নিজস্ব চিত্তবিনোদনের কথাও গুরুদেবকে ভাবতে হয়েছিল। সেই কারণে, প্রাচীন যুগের আদলে তিনি প্রবর্তন করলেন ঋতুকেন্দ্রিক কয়েকটি উৎসব। যথা, বর্ষায় বর্ষামঙ্গল, শরতে শারদোৎসব, বসন্তে বসন্তোৎসব, বৎসরের প্রথম দিনের নববর্ষ উৎসব এবং বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব ইত্যাদি। এ ছাড়া আনন্দক্রীড়ারও প্রবর্তন করেছিলেন, যেমন বনভোজন, খেলাধুলা, সন্ধ্যায় কয়েকটি শিক্ষামূলক আনন্দক্রীড়া। উৎসব-বিশেষের প্রয়োজনে তিনি অজস্র গান রচনা করেছেন, নাটক লিখেছেন, সকলকে দিয়ে সেই গান গাইয়েছেন, নাটকের অভিনয় করিয়েছেন উৎসব দিনে। নৃত্যকলাও এই অনুষ্ঠানে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। এখানকার প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে বাস করে, এইসব আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে, প্রতিটি ঋতু সকলের মনকে নির্মল আনন্দে অনুপ্রাণিত করে তুলত।

বসন্ত ঋতুর দোলপূর্ণিমার দিন ও রাত্রির অনুষ্ঠানকে গুরুদেব বসন্তোৎসব নামে প্রচার করলেন। একে তিনি অতীত দিনের 'হোলকা' বা বর্তমান কালের মতো হোলি উৎসব বললেন না। প্রথম দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায়, চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গুরুদেব-রচিত বসন্ত ঋতুর গান ও কবিতা আবৃত্তি করা হত। কখনও কখনও বিদ্যালয়ের কিছু দূরে, গাছপালাবিহীন খোলা মাঠেও এইরূপ অনুষ্ঠান হয়েছে। বিদ্যালয়বাসী ছোট-বড় সকলেই পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়েছে। দোলপূর্ণিমার এই প্রকার অনুষ্ঠানে গুরুদেবের থাকত মুখ্য ভূমিকা। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহে আমাদের সকলের মন পূর্ণিমা রাত্রির বিশেষ এক মাধুর্যে ভরে উঠত। বিদ্যালয়ে পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে বহুবার নিজের রচিত নাটকের অভিনয়ও তিনি করিয়েছেন। শালবীথিকে পিছনে রেখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় হয়েছে। মনে পড়ে, দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায়, আম্রকুঞ্জে এই নাটকটির অভিনয়ের কথা, বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে। চাঁদের আলো ছড়ানো। আমগাছগুলির প্রাঙ্গণে একটি স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিল, যেখানে স্বতন্ত্র কোনও মঞ্চ ছিল না। গুরুদেব স্বয়ং অন্ধ-বাউলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। গৌরপ্রাঙ্গণের উন্মুক্ত আকাশতলে উপবিষ্ট শান্তিনিকেতনবাসী

দর্শকদের দেখানো হয়েছে বসন্ত ঋতুর গান ও কথার সঙ্গে নৃত্যসহযোগে 'বসন্ত' ও 'নবীন' গীত-নাটক দুটি। বসন্ত ঋতুর নির্বাচিত গানের সঙ্গে কেবল নৃত্যে অভিনয় হয়েছে বহুবার দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায়। দোলের দিন সকালে 'বসন্তোৎসব' নামে যে অনুষ্ঠানটি এখন হয়, এইরূপ অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের এবং বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে হত না। সকালে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আম্রকুঞ্জে বা নিকটবর্তী বৃক্ষাদির ছায়ায় জড়ো হত ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, কর্মী ও আশ্রমবাসীরা। সেখানে বহুক্ষণ ধরে গুরুদেবের বসন্ত ঋতুর গান গাইত সকলে মিলে সমবেত কণ্ঠে। কখনও কখনও বসন্ত ঋতুর উপযোগী উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীতে বাঁধা হিন্দি গানও গাইতেন উচ্চাঙ্গ হিন্দি গানের শিক্ষক। এর সঙ্গে চলত কয়েকটি রঙের আবির মাখানোর খেলা। দু-তিন রঙের জল— বালতি বা টিনে ভর্তি করে এনে পিচকিরির সাহায্যে পরস্পরের গায়ে দেওয়া হত।

সেদিনের দোল-উৎসবে অনেকে পাকা রঙেরও ব্যবস্থা করত, যা জামা-কাপড় থেকে সহজে উঠত না। অতি উৎসাহী কিছু ছাত্র, কখনও কখনও কালি ও আলকাতরা যে ব্যবহার করত না, তা নয়। তবে সকালের এই অনুষ্ঠানে বা আম্রকুঞ্জে গানের সময়ে সে যুগে গুরুদেব নিজে কখনও থাকতেন না। আবির নিয়ে, গুরুদেবের বাড়িতে গিয়ে অনেকেই তাঁর পায়ে আবির ছুঁইয়ে তাঁকে প্রণাম করে ফিরে আসত।

বসন্তোৎসবের সূচনা

গুরুদেব কাঁচা পাকা, নানা রং মাখানোর খেলার 'হোলি' উৎসবকে 'বসন্তোৎসব' নামকরণ করে নতুন ভাবের উৎসবে পরিণত করেন, এ যুগের তিরিশ দশকের প্রথম দিকে। তখন থেকে গুরুদেব নিজে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে এতে যুক্ত হতেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য নতুন গান রচনা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন, গানের সঙ্গে নৃত্যপটু ছাত্রীরা নৃত্যে অভিনয় করত। ছাত্র ও নৃত্যশিক্ষকরাও তাতে যোগ দিয়েছেন।

সকালের এই অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রথম দিকে শালবীথির পশ্চিমপ্রান্ত থেকে গানের দল 'ওরে গৃহবাসী' গানটি গাইতে গাইতে আসত আম্রকুঞ্জের দিকে। যারা আম্রকুঞ্জের মূল অনুষ্ঠানে গানের সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করত, কেবল তারাই এই দলে যোগ দিত। ছাত্রীদের এক হাতে থাকত তালপাতার ঠোঙার মধ্যে রঙিন আবিরসহ বসন্তের কয়েকপ্রকার রঙিন ফুল। তালপাতার ঠোঙাটি কলাভবন থেকেই তৈরি হত। ধূপের ঝারিও থাকত দু'-একজনের হাতে। প্রথম যুগে অর্ঘ্য হাতে সাধারণ পদক্ষেপে ছাত্রীরা চলত আম্রকুঞ্জের দিকে, এ সময়ে তারা নাচত না। তিরিশ দশকের মাঝামাঝি, গুরুদেব ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে আলোচনার পর অর্ঘ্যসহ পদযাত্রার উপযোগী নাচ তৈরি করে নৃত্যপটু ছাত্রীদের শিখিয়ে নিয়ে, সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলার একপ্রকার নাচের প্রবর্তন করি।

প্রথম দিকে গানের দল নাচের দলের সামনে থাকত। পরে এই দলকে নৃত্যদলের শেষে রাখা হল। এখন থেকে গানের কথা এবং মৃদঙ্গ ও মন্দিরার তাল লক্ষ্য করে নাচের দল এগিয়ে চলত। প্রথম যুগে নাচের দলে নাচ জানা ছাত্রী সংখ্যায় অল্প থাকায়, এক সারিতেই নাচের ছন্দে তারা চলত। কিন্তু ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কতকগুলি সমস্যাও দেখা দেয়। পিছনের গানের মৃদঙ্গের এবং মন্দিরার শব্দ প্রথম দিকের নৃত্যদলের কানে ঠিকমতো পৌঁছত না। সামনের দলের সঙ্গে পিছনের নৃত্যভঙ্গি প্রায়ই মিলত না। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে স্থির করা হল, গানের দল আম্রকুঞ্জের মঞ্চ থেকে মাইক্রোফোনে গান গাইবে, মৃদঙ্গ ও মন্দিরার সঙ্গে। এই ব্যবস্থার পর, আম্রকুঞ্জের দিকে বিরাট নৃত্যদলের একসঙ্গে একই নৃত্যভঙ্গিতে এগিয়ে চলার আর কোনও অসুবিধা রইল না। আরও পরে, যখন নৃত্যদলের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তখন পাশাপাশি দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দুটি সারি করে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে সংখ্যার আধিক্য অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং বাইরের বিশাল

জনসমাগমের কারণে অনেক রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার সুরাহা করতে হলে নতুন করে আর একবার ভাববার সময় এসেছে বলে আমি মনে করি।

এই সারিবদ্ধ নৃত্যদলে অনেক দিন পর্যন্ত ছাত্রদের কোনও স্থান ছিল না। পরে একদল ছাত্রকে শিখিয়ে এই নৃত্যদলে যুক্ত করা হল। তখন এক সারিতে ছাত্র এবং অন্য সারিতে ছাত্রীদের পাশাপাশি দাঁড় করানো হল। বীরভূমের পুরুষদের রায়বেশে নাচের একটি ভঙ্গি শেখানো হল দু' দলকেই। কাঠিয়াবারের ডাণ্ডিরাসের একপ্রকার সহজ কাঠি হাতে নাচ এবং গুজরাটের হাততালি দেওয়া গরবা নাচের সহজ ভঙ্গিও তখন যুক্ত হল। সারিবদ্ধ এই নাচে এগিয়ে চলার সময়, কয়েকবার, প্রতিটি শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে নৃত্যছন্দে, আম্রকুঞ্জের মূল উৎসব স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কয়েকবার, আম্রকুঞ্জের অনেকগুলি আমগাছকে বেষ্টন করে, চিহ্নিত পথে, অনুষ্ঠানমঞ্চের দিকে গিয়ে তাদের অর্ঘ্য রাখতে হয়েছিল। শালগাছ ও আমগাছকে বেষ্টন করে এই এগিয়ে চলার নৃত্যের সময় মনে হত, গাছগুলি যেন বসন্তোৎসবের নৃত্যদলের সঙ্গী। ধূপের গন্ধের সঙ্গে আম ও শালফুলের মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ভরে যেত। সারিবদ্ধ চলার নাচ সমাপ্ত হবার পর শুরু হত মূল বসন্তোৎসবের নৃত্যগীত ও কবিতা আবৃত্তি।

সকালের এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী নৃত্যদলের সাজসজ্জা বিষয়ে কিছু বলার আছে। সকালে যারা মূল অনুষ্ঠানে গানের সঙ্গে নাচত, তাদের সংখ্যা সাধারণত সীমিত হত। যারা নিয়মিত নৃত্যচর্চার দ্বারা নাচে দক্ষতা অর্জন করত, তারাই কেবল নির্বাচিত হত এই অনুষ্ঠানের জন্য। অন্য যারা চলার নাচে যোগ দিত 'ওরে গৃহবাসী' গানের সঙ্গে, তাদের নির্বাচন করা হত, নাচের সাধারণ দক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রেখে। কিন্তু সকলেরই সাজপোশাক হত একই প্রকার। মেয়েদের পরনে থাকত বাসন্তী রঙে রাঙানো সাধারণ শাড়ি, ছেলেরা একই রঙে রাঙানো ধুতি মালকোচা মেরে পরত, গায়ে থাকত বাসন্তী রঙের রঙিন পাঞ্জাবি। ছেলেদের মাথায় বাঁধা হত একটি রঙিন পট্টি। মেয়েরা খোঁপায় গুঁজত নানা প্রকার ফুলের ছোট একটি গুচ্ছ একটি কচি পাতার সঙ্গে। কোমরে মেয়েরাও একটি রঙিন চাদর বাঁধত এক দিকে গিঁট দিয়ে। এইরূপ একটি সহজ সরল সাজে, চারিদিকের গাছপালার সঙ্গে জড়িত বসন্ত ঋতুর এই উৎসব সকলের মনকে গভীর আনন্দে ভরে দিত। সকালের এই নৃত্যগীত আবৃত্তির অনুষ্ঠানের শেষে শুরু হত কেবল আবির মাখানোর খেলা, যা এখনও হয়। এখানকার প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাবতীয় সাজসজ্জার মধ্যে ছিল সহজ সরল একটি মাধুর্য। শিল্পাচার্য নন্দলাল এই রকমের উৎসবের সাজসজ্জার মধ্যে চোখধাঁধানো আড়ম্বরপূর্ণ সাজের একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ফুল ও রঙের আলপনা এবং বসন্ত ঋতুর নানা বৃক্ষের নানা রঙের ফুল কলসে সাজিয়ে দিতেন সামনে ও পাশে। এইভাবে চারিদিকের নতুন পাতা ও ফুলে ভর্তি গাছপালায় ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে, গানে নাচে সাজে সকালবেলার বসন্ত ঋতুর বসন্তোৎসব সার্থক আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হত।

শান্তিনিকেতনে নির্বাচিত গানের দলে যখন আমি স্থান পেয়েছিলাম, তখন আমি পাঁচ-ছয় বছরের বালক। আমিই ছিলাম দলে সর্বকনিষ্ঠ। নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পাই প্রথম ১৯১৯ সালে, 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়ের সময়। তখন আমার বয়স নয় বছর। নাটকের কোন চরিত্রে কে উপযুক্ত, সে বিষয়ে মহড়ার পূর্বেই গুরুদেব ভেবে রাখতেন। তিনি চাইতেন, যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-অনুরাগ, হাসি-ঠাট্টা, উল্লাস-উদ্দীপনা ইত্যাদি সময়ে কথাবার্তায় স্বরক্ষেপণ ও দেহভঙ্গি যেভাবে করেন, নাটকের অভিনয়ের সময় তার প্রকাশ সে ভাবেই হওয়া চাই।

অভিনেতার ভূমিকায় গুরুদেব

'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী তাঁর 'অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ তিরিশ বছর নানা ভূমিকায় গুরুদেবের অভিনয় দেখে, তাঁর সাজপোশাক ও বাচনভঙ্গি সম্পর্কে লিখে গেছেন— গুরুদেব 'কখনও সন্ন্যাসী, কখনও ঠাকুরদাদা, কখনও বা ধনঞ্জয় বৈরাগী বা আচার্য অদীনপুণ্য' চরিত্রে অভিনয় করলে 'পোশাক পরিচ্ছদ সাধারণত যা পরিতেন, তাহার খুব বেশি অদল-বদল হইত না, রঙ্গমঞ্চে তাঁহাকে কবি রবীন্দ্রনাথই মনে হইত, তাঁহার নিজের কথা নিজের স্বাভাবিক সুরেই বলিয়া যাইতেন। ... ভুলিয়া যাইতাম, যে-সকল ভূমিকায় তাঁহাকে অভিনয় করিতে দেখিতাম, সেগুলি তাঁহারই প্রতিরূপ, রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি নিজের ভূমিকারই প্রায় নিজে অভিনয় করিতেন...।' 'ফাল্গুনী' নাটকের 'বৈরাগ্যসাধন' অংশে 'কবিশেখর'-এর ভূমিকায় গুরুদেব যখন 'কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবিশেখরের ভিতর কবি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাইলাম।' অন্যদের অভিনয়ের সময় গুরুদেবও তাই চাইতেন।

গুরুদেবের মধ্যে কিন্তু নানা চরিত্রের নিখুঁত অভিনয় করবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। তার পরিচয় পেতাম, যখনই তিনি কোনও নতুন বা পুরাতন নাটকের পুনরাভিনয় করাবেন বলে স্থির করে, মহড়া আরম্ভ করবার পূর্বে নিজে সকলের সামনে নাটকটি একবার পড়ে শোনাতেন। বাল্য বয়স থেকে প্রায় সব নাটকেরই প্রাথমিক পাঠ গুরুদেবের মুখে শোনার সুযোগ অন্যদের সঙ্গে আমিও পেয়েছিলাম। নাটকের কোন চরিত্রে কে যথাযথ অভিনয় করতে পারবে তার নির্বাচনের সময় গুরুদেবকে বিশেষ চেষ্টা করতে হত না। সহজেই সফল হতেন। কারণ হল, তখনকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মী প্রায় সকলের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এ ছাড়া, স্বল্প পরিচিত যে-কোনও ব্যক্তির সঙ্গেও কথাবার্তার পর তিনি সহজেই বুঝে নিতে পারতেন কোন চরিত্রের ভূমিকায় তাঁকে মানাবে বা মানাবে না, কোন চরিত্রের পক্ষে তিনি একেবারেই উপযুক্ত নন।

১৯২৬ সালে প্রথম যখন 'নটীর পূজা' নাটকটি রচনা করলেন, তখন তার বিভিন্ন ভূমিকায় যে-সব ছাত্রীদের তিনি নির্বাচন করেছিলেন, তাদের অভিনয়ের সময় বোঝা গিয়েছিল চরিত্র বণ্টনে তাঁর বিচার কতখানি নিখুঁত ছিল। ১৯২৯ সালে 'তপতী' নাটকটি অভিনয়ের সময়েও দেখেছি একই ক্ষমতার প্রকাশ। নিজস্ব স্বভাবকে ভুলে যাঁরা অন্য পথে চলতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের তিনি তাঁর নাটকে স্থান দেননি। ১৯৩৩ সালে গুরুদেবের ৭০ বছরের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের সময় 'নটীর পূজা' নাটকটির পুনরাভিনয়কালে তিনি সম্পূর্ণ নতুন আর একদল ছাত্রী নির্বাচন করেছিলেন। অভিনয়ের পারদর্শিতায় তাঁরা প্রথমবারের মতোই দর্শকদের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৩৩ সালে 'তাসের দেশ' নাটকটি রচনার পর যখন বিভিন্ন চরিত্রের জন্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মীদের মধ্য থেকে চরিত্র বাছাই করবার কথা ভাবছিলেন, তখন প্রতিমা দেবী স্থির করেছিলেন নাটকের 'রাজপুত্র'-এর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য একটি ছাত্রীর কথা। সে দেখতে সুদর্শন, রং তার ফর্সা এবং আকারেও বেশ লম্বা। তাকে সাজালে অল্প বয়সী সুদর্শন যুবক বলেই মনে হবে। গুরুদেব কিন্তু প্রতিমা দেবীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। তিনি স্থির করলেন, রাজপুত্রের চরিত্রে অভিনয় তিনি আমাকে দিয়েই করাবেন, আমি সুদর্শন না হলেও। এই চরিত্রে, একাধারে নাচ-গান ও নানা আবেগের কথা বলে অভিনয় করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই তিনি আমাকেই ওই রাজপুত্রের ভূমিকায় অভিনয়ের উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুও গুরুদেবের প্রস্তাবে একমত হন। আমার গায়ের রং ময়লা এবং দেখতে তেমন সুদর্শন না হলেও আমার নির্বাচনে তাঁর সম্মতি ছিল এই কারণে যে, আমাকে তিনি সাজাবেন এমন সাজে যাতে রাজপুত্রের ভূমিকায় আমি দেখতে যেন বেমানান না হই। শিল্পাচার্য নন্দলাল মনে করতেন, চেহারায় সুদর্শন না হলে তাকে নাটকের ওইরূপ চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ না দেবার মধ্যে কোনও যুক্তিই নেই। সাজসজ্জার দ্বারা কুদর্শনকেও মঞ্চে সুদর্শন করা যায়। শিল্পী নন্দলাল ময়লা ব্যক্তির মুখে হাতে পায়ে

গায়ে কখনও সাদা রং মাখিয়ে ফর্সা করতেন না। নাচের অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদাই আমার গায়ের স্বাভাবিক রংকে বজায় রেখেই সাজিয়ে দিতেন। 'শাপমোচন'-এ 'অরুণেশ্বর'-এর ভূমিকায় যতবার অভিনয় করেছি কিংবা 'ইন্দ্র'-এর চরিত্রে অভিনয়ের সময় আমাকে খালি গায়েই তিনি সাজিয়ে দিতেন। গায়ের রং বদলের চেষ্টা করতেন না। নাটকের অভিনয়ে, গানের সঙ্গে নৃত্যাভিনয় কিংবা নৃত্যনাট্যের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ের সময় রং কালো ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও তিনি একই চিন্তা মাথায় রেখে কাজ করে গেছেন।

'তাসের দেশ' নাটকটি রচনা করে গুরুদেব প্রথম যখন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পাঠের দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নারী ও পুরুষ চরিত্রের হাসি-ঠাট্টা, ক্রোধ-অনুরাগ, উদ্দীপনার কথাগুলি কখন কীভাবে বলতে হবে। এই সময়ে রাজপুত্রের কথার ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরের নানা বৈচিত্র্য, খুবই মনোযোগ দিয়ে, মনের মধ্যে তার ছাপ গ্রহণ করে মহড়া এবং অভিনয়ের সময় নিজের স্বভাবানুযায়ী তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে গেছি। গুরুদেব প্রতিদিনই মহড়ার সময় উপস্থিত থেকে, সবই দেখতেন এবং শুনতেন, কিন্তু রাজপুত্রের কথাবার্তা কীভাবে হবে, সে বিষয়ে গুরুদেবকে কখনও কিছু বলতে হয়নি।

১৯১৫ সালে 'ফাল্গুনী', ১৯১৭ সালে 'অরূপরতন' এবং 'ডাকঘর' নাটকের মহড়া দেখেছি, দিনের পর দিন, অভিনয়ও দেখেছি। এরপর আমি যখন ৯ বছর বয়সে পা দিয়েছি, অর্থাৎ ১৯১৯ সালে, —তারপর থেকে 'শারদোৎসব', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'ঋণশোধ', 'নটীর পূজা', 'তপতী', 'ফাল্গুনী', 'শাপমোচন', 'অরূপরতন' বা 'রাজা' নাটকের অভিনয়ের সময় নানাভাবে গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথসহ বড়দের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৩৫ সালে পুজোর ছুটির পূর্বে গুরুদেব যখন তাঁর জীবনে শেষবারের মতো 'শারদোৎসব' নাটকটির অভিনয় করান, তখন তিনি নিজে পূর্বের ন্যায় সন্ন্যাসীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আমাকে দিয়েছিলেন বালকদলকে নিয়ে অভিনয় করবার দায়িত্ব, 'ঠাকুর্দা'র চরিত্রে। বাল্যকালে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, বালকদের দলে যুক্ত হবার সুবাদে 'শারদোৎসব' ও 'ঋণশোধ' নাটকের অভিনয় যেভাবে হয়েছিল, তার কথা মনে রেখে, এবারে আমার কর্তব্য ঠিকমতো আমি করতে পেরেছিলাম। গুরুদেবের পাশে আমি যে বেমানান হইনি সকলেরই তা মনে হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের যুগে সাধারণত প্রতিবছর গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটির আগে বা অন্যান্য উৎসবের সময়, নাটক অবশ্যকরণীয় ছিল। এই কারণে বছরের পর বছর গুরুদেবকে বহু নাটক রচনা করতে হয়। এইসব নাটকের মহড়া চলত প্রকাশ্যে, সকলের সামনে বহুদিন ধরে। আশ্রমবাসী সকলেই নাটকগুলির মহড়া দেখতেন, উৎসাহ নিয়ে। আমি এবং আমার মতো অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীরাও বড়দের সঙ্গে মহড়ার সময় সর্বদাই উপস্থিত থেকে তা উপভোগ করেছি, নাটকের মূল ভাবার্থ না বুঝে। কখনও ক্লান্ত হতাম না। গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের অভিনয়ের দক্ষতা বর্ণনাতীত। কিন্তু সে যুগের অন্যদের মধ্যে যাঁরা অভিনয়ের দক্ষতার দ্বারা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিলেন, যাঁদের কথা আজও ভুলতে পারিনি, তাঁরা হলেন, জগদানন্দ রায় ও সন্তোষ মিত্র। শুনেছি, জগদানন্দবাবু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুগ থেকেই গুরুদেবের যতগুলি নাটক অভিনীত হয়েছিল তার সবকটিতেই তিনি সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এও শুনেছি, নাটকগুলির যে চরিত্রেই তাঁকে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করা হত, তাঁর অভিনয়ের পারদর্শিতায় তিনি গুরুদেব ও আশ্রমবাসী সকলকেই খুশি করতে পেরেছিলেন।

১৯১৯ সালে 'শারদোৎসব' নাটকের পুনরাভিনয়কালে মহড়া হত, প্রতিদিন অপরাহ্ণে 'নতুনবাড়ি' এবং গুরুদেবের 'দেহলি' বাড়ির দক্ষিণের প্রাঙ্গণে। গুরুদেব 'সন্ন্যাসী'র ভূমিকায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর্দার ভূমিকায় অল্পবয়সী ছাত্রদলসহ অভিনয় করতেন। জগদানন্দবাবু ছিলেন 'লক্ষেশ্বর'-এর ভূমিকায়। তাঁরও অভিনয় এত স্বাভাবিক ছিল যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, তাঁর কথাবার্তা চালচলন যে প্রকার ছিল নাটকে লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় অভিনয়ের সময় মনে হত জগদানন্দবাবু এবং নাটকের লক্ষেশ্বর যেন একই ব্যক্তি। কয়েকবছর পরে 'শারদোৎসব' নাটকটির সামান্য পরিবর্তনের পর

'ঋণশোধ' নামে কলকাতায় যখন অভিনীত হয়, তখনও লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় জগদানন্দবাবুই অভিনয় করেছিলেন। একটানা প্রায় ২০ বছর শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'ঋণশোধ' নাটকে অভিনয়ের পর তাঁকে আর কোনও নাটকের অভিনয়ে যোগ দিতে দেখিনি।

সন্তোষ মিত্র কলকাতা থেকে প্রথম এসেছিলেন ১৯১৭ সালে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চিত্রবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু তিনি শিক্ষকতার কাজে যোগদানের পর 'শারদোৎসব নাটক থেকে শুরু করে একটানা প্রায় সবকটি নাটকেই অভিনয় করে গেছেন, গুরুদেবের পরলোকগমনের কয়েকবছর পূর্ব পর্যন্ত। তাঁকে গুরুদেব সব সময়ে গ্রামবাসী, যুবকদল প্রভৃতি নানা চরিত্রের ভূমিকায় নিযুক্ত করতেন। 'ডাকঘর' নাটকে 'দইওয়ালা'র চরিত্রেও তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছি। তিনি গুরুদেবের আদর্শানুযায়ী নিখুঁত অভিনয় করেছেন। সবসময়ে নিজের স্বভাবানুযায়ী কথাবার্তায়, চালচলনে যেন নিজেকেই প্রকাশ করতেন। সেই কারণে দলের সঙ্গে যুক্ত থেকেও দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়ত তাঁরই উপরে। গুরুদেবের জীবিতকালে অভিনীত নানাপ্রকার নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে আরও অনেকেই অভিনয় করেছেন। তাঁরাও অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন বলেই সামগ্রিকভাবে নাটকগুলি ছোট-বড় সব দর্শকের মনই স্পর্শ করত, বিশেষ করে যেখানে 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' ও 'ডাকঘরের' মতো লিরিকধর্মী নাটকগুলির প্রকৃত মর্মার্থ বাল্যকালে আমার বোঝবার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা দেখতাম। নাটকগুলির অভিনয়ের শেষে যেন সংবিৎ ফিরে পেতাম।

নাটকের অভিনয় চর্চার এইরূপ একটি জোরালো পরিবেশের মধ্যে বাল্য বয়স থেকেই বর্ধিত হবার সুযোগ পেয়ে, অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে আমার অভিনয়ের জীবন ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল, গুরুদেবের প্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত। গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে আমার উপর গুরুদেবের নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব যখন এসে পড়ল, তখন নতুনদের নির্বাচন করে চরিত্র বণ্টন ও অভিনয় করানো আমার পক্ষে খুবই সহজ হয়েছিল। গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করে আনন্দেই তা সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমার জীবনে নাটকের অভিনয়, পাত্রপাত্রী নির্বাচন, নাটক পরিচালনা প্রভৃতির শিক্ষাগ্রহণ এখানকার সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

অরূপরতন

১৯৩৭/ ১৩৪৪ সালের পয়লা বৈশাখের উৎসবের দিন, বিশ্বভারতীর তরুণ অধ্যাপকদল স্থির করেছিলেন, সন্ধ্যায় তাঁরা গুরুদেবের 'অরূপরতন' নাটকটির অভিনয় করবেন, প্রতিমা দেবীর নেতৃত্বে। মাসখানেক পূর্বেই তাঁরা তার মহড়া শুরু করেন। উদয়ন বাড়িতে মহড়ার সময় গুরুদেব মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে মহড়া দেখতেন। তরুণ অধ্যাপকরা এই নাটকে যোগদানের জন্য আমাকে বললেন না। দিন পনেরো পরে একদিন মহড়ার পূর্বে গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। অপরাহ্ণে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি তখন তাঁর রাত্রির খাওয়া খাচ্ছেন, প্রতিমা দেবী সেখানে বসে। অন্যরা তখনও কেউ আসেননি। আমি সেখানে প্রবেশ করামাত্র তিনি বললেন, তাঁর এই অসুস্থ শরীরে নাটকের অভিনয় ও গানের নিয়মিত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে। আমি সম্মতি জানাবার পর প্রতিমা দেবীকে বললেন সে কথা অন্যদের জানিয়ে দিতে। এ খবর তরুণ অধ্যাপকদের কাছে পৌঁছানো মাত্রই তাঁরা সুরেন করের মাধ্যমে গুরুদেবের কাছে প্রতিবাদ জানালেন। তাঁদের প্রতিবাদের সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমি সুরেন করকে জানিয়ে দিই যে, আমি ওই নাটকের কোনও দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নই, গুরুদেব ও প্রতিমা দেবীকে তা যেন তিনি জানিয়ে দেন। এরপর গুরুদেব আমাকে আর কিছু বলেননি।

আমিও বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করব না বলে স্থির করলাম।

১লা বৈশাখের দিনতিনেক পূর্বে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, নাটকটির অভিনয় ও গানের মহড়া দেখে তিনি খুশি নন। সেই কারণে ১লা বৈশাখের সন্ধ্যায় নাটকটির অভিনয় হবে না বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এবং এও জানিয়েছেন যে, ১লা বৈশাখের আম্রকুঞ্জের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে ওই নাটকটি তিনি আদ্যন্ত পাঠ করে শোনাবেন। আমাকে বললেন, নাটকের গানগুলি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গাওয়াবার ব্যবস্থা করতে। এ কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের কথাগুলি আবেগে এবং যথাযথ কণ্ঠস্বরের প্রয়োগে সকলে হয়তো সফল হতে পারেনি বলেই তিনি অভিনয় বন্ধ করে দেন। ১লা বৈশাখের প্রাতঃকালের অনুষ্ঠানে সমগ্র নাটকটি পাঠ করে হয়তো তিনি বুঝিয়ে দেবেন বলে স্থির করেছেন, চরিত্রগুলির সংলাপ ভাবের বৈচিত্র্যানুযায়ী কীভাবে বলতে হবে। তিনি নিজে তাঁর নাটকের মহড়ার পূর্বে সকলের সামনে নাটকটি সর্বদাই পাঠ করে শোনাতেন। 'অরূপরতন' নাটকটির মহড়ার পূর্বে তরুণ অধ্যাপকরা তার ব্যবস্থা করেননি। নিজেরাই মহড়া শুরু করে দিয়েছিলেন গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে।

'অরূপরতন' নাটকটির একটি কপি গুরুদেবের কাছ থেকে নিয়ে গানগুলি কোথায় আছে তা দেখে নিলাম। গানের দলে যাদের রাখলাম তারা সকলেই গানগুলি জানত। একসঙ্গে যাতে সকলেই কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে পারে, তার অভ্যাস করাতে লাগলাম। কেবল দুটি গান আমি তালিকা থেকে বাদ দিই, সময়াভাবে সে দুটি গান শিখিয়ে গাওয়ানো যাবে না ভেবে। কিন্তু গান দুটিকে বাদ দেবার কথা গুরুদেবকে আমি জানালাম না। জানালে কোনও ফল হত না বলেই এই সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হয়েছিল। গানের দলকে বলেছিলাম তাঁর পাঠের মাঝে তিনি যখন থামবেন আমাদের দিকে চেয়ে, তখন তাঁর দিকে কেউ যেন না তাকায়। গুরুদেবের পাঠ চলতে লাগল। যে দুটি গান বাদ দিয়েছিলাম, সেখানে তিনি পাঠ বন্ধ করে গানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু গান হচ্ছে না দেখে আমার দিকে তাকালেন, তাঁর মুখে তখন বিরক্তির ছাপ। আমি ওঁর দিকে না তাকিয়ে চুপ করে রইলাম। তিনি পরবর্তী অংশের পাঠ শুরু করলেন। দুবারই একই ঘটনা ঘটল। এই কারণে অনুষ্ঠানের শেষে তিনি আমাকে যে বকবেন তার জন্য আমার মনকে আমি প্রস্তুত করেই রেখেছিলাম। হলও তাই। অনুষ্ঠান শেষ হতে আমি তাঁর সামনে দাঁড়ানো মাত্রই তিনি জানতে চাইলেন, কেন ওই দুটি গান গাওয়ানো হল না। আমি কোনও প্রকার দ্বিধা না করে সবই খুলে বললাম। বললাম, ওই দুটি গান নতুন করে সকলকে শেখাতে হত। এই অল্প সময়ের মধ্যে শিখিয়ে ভাল করে গাওয়ানো সম্ভব হবে না মনে করেই গান দুটি বাদ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বাদ দেওয়ার কথা শুনে আপনি যদি বলতেন গান দুটি গাওয়াতেই হবে তখন আমার পক্ষে কি পারব না বলা সম্ভব হত ? সুতরাং আপনাকে না জানিয়ে গান দুটি বাদ দেবার জন্যে আমাকে আপনি যে বকবেন তাও জানতাম। আমি নিরুপায় হয়েই এ কাজ করেছি। তখন তিনি শান্ত হলেন। স্নেহভরে বললেন, তাঁকে পূর্বে এ কথা জানালে পাঠের সময় গান দুটি না হওয়ায় তাঁকে ওইরূপ মানসিক অশান্তির মধ্যে পড়তে হত না।

ডাকঘর

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটির মুখে আমি গুরুদেবের পত্র নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার জাভা বালি সুমাত্রা দ্বীপে যাই। ফিরেছিলাম পুজোর ছুটির আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে। সে সময় তরুণ অধ্যাপকরা স্থির করেছিলেন তাঁরা গুরুদেবকে নিয়ে 'ডাকঘর' নাটকটির অভিনয় করবেন। গুরুদেবের শরীর সে সময় তেমন সুস্থ ছিল না। তবুও তিনি অভিনয় করবেন বলে সম্মতি দিলেন। নাটকটির কিছু পরিবর্তন করে তাতে কয়েকটি নতুন গান যুক্ত করেন। কোন চরিত্রে কে অভিনয়

করবে তার জন্য পরীক্ষাও চলল। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাঁর মনোমত চরিত্রের অভাব লক্ষ করে শেষ পর্যন্ত অভিনয় না করার সিদ্ধান্ত নেন। আমি ফিরে আসার পর তাঁর দ্বারা পরিবর্তিত 'ডাকঘর' গ্রন্থটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, পরে এক সময়ে এই পরিবর্তিত নাটকটির অভিনয় যাতে হয় তার চেষ্টা করতে। আমি সম্মতি জানিয়ে মনে মনে স্থির করেছিলাম গুরুদেবকে নিয়েই নাটকটির অভিনয়ের চেষ্টা করব। অবিলম্বে সে কাজে হাত দিতে পারিনি। কারণ গুরুদেবের অসুস্থতা একটু একটু করে বেড়েই চলছিল। অপেক্ষা করতে লাগলাম তাঁর শরীর ভালর দিকে যাবে মনে করে। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম না। অসুস্থতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৪১-এর অগস্ট মাসে তিনি চিরকালের মতো মর্ত্যলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু আমি স্থির করেছিলাম তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর ইচ্ছা আমাকে পূরণ করতেই হবে পরিবর্তিত 'ডাকঘর'-এর অভিনয় করে। বছরখানেক পরে শান্তিনিকেতনে নাটকটির অভিনয় করিয়েছিলাম। আমি অভিনয় করি গুরুদেব যে চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে ভেবেছিলেন, সেই চরিত্রেই।

শ্রীনিকেতন

বীরভূমের দরিদ্র গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়ন-কল্পে শ্রীনিকেতনের আনুষ্ঠানিক প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) গুরুদেবের দ্বারা যখন অনুষ্ঠিত হয়, তার গানের দলে আমি ছিলাম। শ্রীনিকেতনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণ হল, ১৯২৩ সালে আমাদের পিতৃদেব কালীমোহন ঘোষ, শান্তিনিকেতন থেকে মা-সহ আমাদের নিয়ে এলেন শ্রীনিকেতনে। এখানে এসে আমরা প্রায় একটানা ৫/৬ বছর বাস করেছি। এখান থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশোনার অসুবিধা হচ্ছিল বলে, ১৯২৭ সালে মা ও আমার ভ্রাতারা-সহ আমি পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি। কলাভবনের পাশে তিনটি খড়ের চালা মাটির বাড়ির একটিতে কয়েক বছর কাটানোর পর, ১৯৩০ সালে কলাভবনের পশ্চিমপ্রান্তে, জমি কিনে, বাবা একটি টিনের চালা মাটির বাড়ি তৈরি করালেন। সেখানেই আমরা উঠে যাই। এখনও সেখানেই আছি। বাবা থাকতেন শ্রীনিকেতনে একলা। ১৯৪০ সালে আমার পিতার এবং ১৯৪১ সালে গুরুদেবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শ্রীনিকেতনের সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। কখনও ছেদ পড়েনি।

গুরুদেবের মনে গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের চিন্তা শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাকালে প্রথম যে জেগেছিল তা নয়। তিনি এ বিষয়ে অনেক আগে থেকেই ভেবেছিলেন এবং তখন কীভাবে কাজে নেমেছিলেন, তারও একটি ইতিহাস আছে।

১৮৯০ সালে বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গুরুদেবের পিতা, গুরুদেবের উপর তাঁদের জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করেন। ১৮৯১ সাল থেকে জমিদারি তত্ত্বাবধানের কর্ম উপলক্ষে তাঁকে একটানা প্রায় দশ-এগারো বছর, বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর অঞ্চলে বাস করতে হয়।

তাঁর এই সময়কার পল্লীবাসের অভিজ্ঞতার কথা যা তিনি বলে গেছেন, তা হল—'শিলাইদহ পতিসর এইসব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। ...

...আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্য কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। ...

...আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। ...গ্রামের লোকেদের অভাব অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এইসব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। ...

...সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এইসব অসহায় অভাগাদের প্রাণে

মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। ...

...কীভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সেই ভাবনা ও চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল।'

পল্লীগ্রামে বাস করতে গিয়ে, পল্লীবাসীদের জীবনের দুঃখ দৈন্যের প্রথম পরিচয়ে গুরুদেব যে কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ দূর করবার আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁর মনকে সে সময়ে যে কতখানি গভীরভাবে অধিকার করেছিল, তা পরিষ্কার ধরা পড়ে তাঁর সে সময়ের পল্লীবাসকালে রচিত একটি বিখ্যাত কবিতা থেকে। কবিতাটি হল 'এবার ফিরাও মোরে'। রচনার তারিখ ১৩০০ সালের (১৮৯৩) ফাল্গুন মাস। কবিতাটি অন্য পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রথমে গ্রাম সংগঠনের কাজ এইখানেই শুরু করলেন সংক্ষিপ্তাকারে। পরে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিধি বৃদ্ধি হল। বেশ কয়েকবছর পর একটি চিঠিতে কাজের বিবরণ দিয়ে গুরুদেব লিখেছেন—'আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারির মধ্যে পল্লীগঠনের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে, সেখানকার লোকজনদের সঙ্গে বাস করে, তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা, তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করছি। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঞ্জাল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে।'

গুরুদেব তখন কতদিক থেকে যে পল্লীগঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন, তার একটি তালিকা সংক্ষেপে পেশ করছি। যেমন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব-সংবর্ধন। গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা। পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন। সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি, ধর্মভাব, একতা, স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করবার চেষ্টা।

প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ অনাথ অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা। পানীয় জল, নদী-নালা, পথঘাট, সৎকার স্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদের কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদি পালন দ্বারা জীবিকা উপার্জনে উপযোগী শিক্ষা প্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলাস্থাপন। গৃহস্থ স্ত্রীলোকরা যাতে আপন সংসারের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

সুরাপান বা অন্যরূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহার হতে লোককে নিবৃত্ত করা।

মিলন মন্দির, club স্থাপন ও তথায় সমবেত হয়ে পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

পল্লীর যাবতীয় তত্ত্ব-সংগ্রহ।

শিলাইদহ পতিসর অঞ্চলের গ্রামগুলিতে যখন এতপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজ চলছে, তখন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের পাশের দরিদ্র গ্রামবাসীদের কথাও গুরুদেব চিন্তা করতেন। শিক্ষকদের তিনি বলতেন, গ্রামবাসী ও তাদের নানা সমস্যার পরিচয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশ-সেবার প্রকৃত শিক্ষা। তাঁরই নির্দেশমতো বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ও আমার পিতৃদেব একদল বয়স্ক ছাত্র নিয়ে নিকটবর্তী সাঁওতালদের গ্রামে এবং ভুবনডাঙা গ্রামে গিয়ে দরিদ্র সমাজের ছেলেমেয়েদের সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে নানাপ্রকার খেলাধুলার প্রবর্তন করেন। তাদের বোধগম্য, গুরুদেবের 'শিশু', 'কথা ও কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে গ্রামের নিরানন্দময় জীবন, বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুবই আনন্দে কাটত। এইসব আনন্দময় কর্মযজ্ঞে, মাঝে মাঝে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের নানা গল্প শোনানো হত। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে শিক্ষামূলক নানাপ্রকার ছবিও দেখানো হত। অসুখে-বিসুখে গ্রামবাসীদের ঠিকমতো চিকিৎসা ও সেবার কাজও তাঁরা করতেন। ১৯১৩ সালে

উইলিয়ম পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। তখন তিনি যে ছোট পল্লীটির সেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেটি হল বর্তমান যুগের পিয়ার্সন পল্লী। যে কজন ছাত্র ও অধ্যাপক তখন এইরূপ গ্রামসেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের কাজের আন্তরিকতার পরিচয়ে, সে যুগের সকলেই মুগ্ধ ছিলেন! তখন এই কাজটি চলেছিল ক্ষুদ্র আকারে, তখনকার দিনের লোকবল ও অর্থবলের সামর্থ্যানুযায়ী। ব্যাপকভাবে দরিদ্রদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের সুযোগ আসে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার সময় ইংলন্ডবাসী লেনার্ড এলমহার্স্ট-এর অর্থানুকূল্যে ও কর্মপ্রেরণায়।

বিশ্বভারতী তখন দু ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ শুরু করে। প্রথম ভাগের কাজ চলেছিল শান্তিনিকেতনে, তখনকার বিদ্যালয়ে, বিদ্যাভবনে, কলাভবনে ও সংগীত বিভাগের দ্বারা। এই অংশে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসত দেশের চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ছেলেমেয়েরা। শ্রীনিকেতনের কাজ শুরু হল, পৃথকভাবে, দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে, কেবল তাঁদের কথা ভেবে।

গুরুদেব তখন বলতেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীর সঙ্গে দরিদ্র গ্রামসমাজের সার্বিক পরিচয়ে দেশের প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। সমাজের এক অংশ, অন্য সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটা কোনওমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। সর্ব স্তরের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা সখ্য স্থাপন করতে হবে। সে যুগের শান্তিনিকেতনের প্রায় সবকটি ভবনের একদল ছাত্রছাত্রী এবং একদল অধ্যাপক ও কর্মী শ্রীনিকেতনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, কোনও না কোনওভাবে। আবার শ্রীনিকেতনের একদল ছাত্র ও কর্মী শান্তিনিকেতনের নানা বিভাগের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ও শিল্পীদের কর্মের পরিচয়লাভের সুযোগ নিতেন সাগ্রহে।

প্রথম যুগে শ্রীনিকেতনের কাজ কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং গ্রামসমাজের নানাবিধ উন্নয়নের কাজ কীভাবে চলত, এবারে তার পরিচয় সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করি।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লেনার্ড এলমহার্স্ট শান্তিনিকেতন থেকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ৮/১০টি বয়স্ক ছাত্রকে বেছে নিলেন, যাঁদের পরিবারের কেউ কখনও চাষের কাজ, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, লোহা-পিতলের কাজ, পশুপালন, মুরগি-হাঁসের প্রতিপালনের দ্বারা, নিজেদের জীবিকা অর্জনের কাজ করেননি। প্রথমে এই ছাত্রদলের প্রত্যেককেই তাঁদের বাসস্থান সংলগ্ন কয়েক কাঠা জমি দেওয়া হল এবং দেওয়া হল কোদাল, কাটারি, খুরপি, জলসেচনের উপযোগী বালতি, ঝাঁঝরি প্রভৃতি। এলমহার্স্ট বললেন, প্রত্যেকের নির্ধারিত জমির মাটি, নিজেকে কোদালের সাহায্যে কুপিয়ে চাষোপযোগী করে নিতে হবে। প্রথমে সেই জমিতে প্রতিদিন একটি করে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে, তার মধ্যে বাড়ির আশেপাশের পচনযোগ্য আবর্জনা, গাছের ঝরা পাতা কুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ ছাড়া, আর একটি দুরূহ কাজ তিনি ছাত্রদের দিয়ে করাতেন। সেটি হল, তখনকার দিনের প্রতিটি বাড়ির খাটা পায়খানার ময়লা, সেখানে ফেলতে বলতেন। সব কাজই ছাত্রদের নিজের হাতে করতে হত। প্রতিটি ট্রেঞ্চের মধ্যে আবর্জনা ও পায়খানার ময়লার উপরে মাটি চাপা দিতে হত। এইভাবে প্রতিদিন একটি করে ট্রেঞ্চের দ্বারা, জমিটি যখন ভরে যেত, তখন ছাত্ররা নিজের হাতে, কোদাল প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে, সমগ্র জমিটিকে প্রতিটি ঋতু উপযোগী শাকসবজি চাষের জন্য সাজিয়ে নিত। জমির চারিদিকে গরুছাগলের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য, নিজেরাই বেড়া তৈরি করত। বর্ষা ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে নিয়মিত জলসেচনের দায়িত্ব থাকত ছাত্রদের উপরে। ফসলে কোনওপ্রকার রোগ দেখা দিলে, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তার রোগমুক্তির জন্য তারাই ভাবনাচিন্তা করত। কৃষিবিশেষজ্ঞের পরামর্শও তারা পেত। তাদের প্রতিদিনের কাজের বিবরণ ডায়েরিতে লিখতে হত। এলমহার্স্ট তা দেখতেন। তাদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনাও করতেন। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদিও তাদের পড়তে হত। অর্থাৎ এদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল হাতেকলমে কাজের দ্বারা যুগোপযোগী উচ্চস্তরের কৃষিশিক্ষা।

সে যুগে এলমহার্স্ট, কৃষিবিশেষজ্ঞ সন্তোষ বসু ও জাপানি শিল্পী ও কৃষিবিদ কাসাহারা এদের নানাভাবে পরিচালনা করতেন। কাসাহারা নিজের বাড়ি সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি তৈরি করে,

নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট সবজি ফলাতেন। তা দেখে আমরা ওই অঞ্চলের চাষিদের সঙ্গেই উৎসাহিত হতাম। এখন যেখানে শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, সেখানকার যাবতীয় জমিতে উচ্চফলনশীল ধানচাষ ও অন্যান্য সবজির চাষ-আবাদ হত। জলসেচনের জন্য পাশের বিরাট পুরনো দিনের জলাশয়টির সংস্কার করে, প্রয়োজনমতো জলসেচনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানকার জমিতে গরুর সাহায্যে হাল চালনার শিক্ষাও নিতে হত শ্রীনিকেতনের ছাত্রদের। ছোট আকারের ট্রাক্টরও এলমহার্স্ট কিনে দিয়েছিলেন, ডাঙা জমি চাষ করে তাতে ভুট্টা ও চিনাবাদামের উৎপাদন হত।

শ্রীনিকেতনের আরম্ভ থেকে ছুতোরের কাজ, চামড়ার কাজ, তাঁতের কাজ, গালার কাজ, পঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে গরু ও ষাঁড় আনিয়ে গো-পালন এবং নানা জাতের মুরগি ও হাঁস পালনের শিক্ষা দেওয়া হত। দেখেছি, কেরোসিনের ইনকিউবেটরের সাহায্যে, একসঙ্গে কয়েকশো মুরগি ও হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা করানো হত। দক্ষিণ ভারতের কতক অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল এখানকার কয়েকজন যুবক কর্মীকে, সেখানকার কাঁচা চামড়ার ট্যানিং-এর কাজ, কাপড়ের উপর রঙিন নকশার ছাপ তোলার কাজ শিখে আসবার জন্য। গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে লেখাপড়া ও নানা উন্নয়নমূলক কুটিরশিল্পের কাজ শুরু হয়।

শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়টির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে ১৯২৪ সালে, গ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী সমাজের ছেলেদের কথা ভেবে। শান্তিনিকেতনে সন্তোষ মজুমদারের বাড়ি সংলগ্ন জমিতে একটি খড়ের চালা মাটির বাড়িতে বালকরা বাস করত। সন্তোষবাবুই তাদের নানাবিধ শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯২৫ সালে সন্তোষবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পরে বিদ্যালয়টি শ্রীনিকেতনে উঠে যায়। ১৯৫১ সালে সমগ্র বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবার পর বিদ্যালয়টি উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের উপযোগী মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অনুকূল বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এটি এখন বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় বিদ্যালয়। কিন্তু তার দৈনন্দিন কার্যসূচি পূর্বের মতো একই নিয়মে এখন চলছে না। তাকে সাজিয়ে নিতে হয়েছে ভিন্ন পথে। গুরুদেব বলেছিলেন, শিক্ষাসত্রের ছাত্ররা লিখতে পড়তে শিখবে বটে, কিন্তু সে বিদ্যা হবে না ম্যাট্রিক বা এ যুগের মতো স্কুল ফাইনালের সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় পাস করবার শিক্ষা। তাদের মূল শিক্ষণীয় বিষয় হবে, তাদের পিতা-পিতামহেরা যে কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে সংসার চালাতেন, সে সবের উন্নত আধুনিক শিক্ষা, চাষের কাজ-সহ বৃত্তিমূলক অন্যান্য হাতের কাজও তাদের শেখানো হবে। গুরুদেব চেয়েছিলেন, এরা শিক্ষাসত্রের শিক্ষা শেষ করে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে, পিতৃ-পিতামহের মতো চাষ বা অন্য প্রকার কুটিরশিল্প ভাল করে করবে। এ ছাড়া এদের স্কাউট ট্রেনিং-ও দেওয়া হত। তার নাম দিয়েছিলেন 'ব্রতী বালক'। এই শিক্ষায় যাতে এদের শিক্ষিত করা যায়, তার জন্য ধীরানন্দ রায় ও শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিল্পী বিনায়ক মসোজীকে এই বিদ্যা শিখিয়ে আনা হয়েছিল জব্বলপুর থেকে। শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের নাচ গান অভিনয় ও কয়েকপ্রকার খেলাধূলাও শেখানো হত। এমনভাবে তাদের তৈরি করা হত, যাতে তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে অল্পবয়সী বালকদের নিয়ে দল গঠন করে, উন্নয়নমূলক নানা কাজে নেতৃত্ব দিতে পারে।

তখনকার দিনে শ্রীনিকেতনে এইরূপ ব্যাপকভাবে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল তা কেবলমাত্র নিকটবর্তী দরিদ্র গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নতি কীভাবে করা যায়, তার কথা চিন্তা করে। শ্রীনিকেতনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল, গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার পিতৃদেবের নেতৃত্বে পল্লীসেবা বিভাগের কর্মীরা। যাতে ব্রতী বালক দল গঠন, নৈশবিদ্যালয়, সমবায় সমিতি, গ্রামের জন্য circulating library, সমবায় ধর্মগোলা এবং মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্যাম্প করে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নমূলক কাজ ও নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত, কদিন ধরে। এই ক্যাম্পে শান্তিনিকেতন থেকেও অনেকে যোগ দিতেন। এ যুগে আমরা যাকে বলি 'ওয়ার্কশপ' এটিকে তাও বলা চলে।

গ্রামের পথঘাট সংস্কার, জলকষ্ট দূর করার জন্য জলাশয় ও পুষ্করিণী সংস্কার, সালিশের বিচারে

বিবাদ নিষ্পত্তি, জঙ্গাল পরিষ্কার—এ সবই ছিল পল্লীসেবা বিভাগের অন্যতম মুখ্য কাজ।

ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপে সে যুগের বীরভূমবাসীরা খুবই ভুগত। এ ছাড়া আরও অন্যান্য রোগেও তারা আক্রান্ত হত। এর প্রতিরোধের জন্য, সমবায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে তাদের চিকিৎসা এবং রোগ নির্মূল করার বা প্রতিরোধমূলক কাজও চলত। বীরভূমে গ্রামের বাৎসরিক মেলাগুলি সে যুগে পরিচালিত হত খুবই বিশৃঙ্খলার মধ্যে। তা দূর করবার ইচ্ছায়, আমার পিতৃদেব, শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন থেকে বহু সেবাব্রতী ছাত্র ও কর্মী নিয়ে সেখানে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন। এর দ্বারা মেলার নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা অনেকখানি দূর হত। গ্রামের হাজার হাজার নরনারী স্বস্তির সঙ্গে মেলার কটি দিন কাটিয়ে ফিরে যেতে পারত।

শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রয়োজনীয় নানা জীবিকার সঙ্গে জড়িত উপযোগী প্রদর্শনী সাজিয়ে, তাদের শিক্ষিত করে তোলা। তারা প্রদর্শনীতে এসে তা দেখে অনেক কিছু জানবার ও শেখবার সুযোগ পেত।

এইভাবে গুরুদেবের গ্রাম-উন্নয়নমূলক চিন্তাকে এলমহার্স্ট ও আমার পিতার নেতৃত্বে রূপ দেবার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল খুবই সাফল্যের সঙ্গে।

গুরুদেব দেখেছিলেন, গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাবে তারা নিজেদের কতখানি অসহায় মনে করত, পরের উপর নির্ভর করে কীভাবে তারা বঞ্চিত হত এবং একজোট হয়ে নিজেদের নানা সমস্যার সমাধান করতে তারা কীরূপ অসমর্থ ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, গ্রাম-উন্নয়নের কাজে সমবায়নীতির প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে।

১৯০৫-০৬ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে, গুরুদেবের সঙ্গে আমার পিতৃদেবের প্রথম পরিচয়ের পর, গুরুদেবের গ্রামসমাজের উন্নয়ন কার্যপ্রণালীর কথা শুনে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর জমিদারির অন্তর্গত একটি অঞ্চলে গ্রামবাসীদের উন্নয়নমূলক কাজে যখন যোগ দেন, তখন গুরুদেব পিতাকে কী চোখে দেখেছিলেন, সে কথা তাঁর এক চিঠিতে শান্তিনিকেতনের তখনকার এক অধ্যাপককে লিখেছিলেন—'লোকপ্রেম বলে একটি জিনিস আছে সে এক-একজনের স্বভাবসিদ্ধ—তার পক্ষে সেটা intellectual নয়, কর্তব্যবুদ্ধিগত নয়, সেটা তার হৃদয়বৃত্তির অন্তর্গত। এরাই সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে জনহিতের কাজ করতে পারে। ...এইরকম একটি পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে এসেছে—এর পড়াশুনা অল্পই— কিন্তু এর মধ্যে প্রাণের শক্তি ভাবের শক্তি খুব বেশি। এ ছেলেটি এফ এ পর্যন্ত পড়ে, পরীক্ষায় পাস না দিয়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত গোলমালের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে—এর শরীর নিতান্ত দুর্বল ও রুগ্‌ণ। সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়—কিন্তু এর মধ্যে ভাবের উদ্দীপনা অত্যন্ত সত্য—সেইজন্যে একে কিছুতেই প্রতিহত করতে পারেনি এবং সেই জন্য এর মুখের কথায় চাষাভুষোরা পর্যন্ত উৎসাহিত হয়। নিজের শক্তির প্রতি এর একটা বিনম্র বিশ্বাস আছে—'পারব' কথাটা কখনই ত্যাগ করে না। ঠিক এই type-এর লোক আমি সন্ধান করছিলুম—একে দেখে আমি খুব আশান্বিত হয়েছি। এখন এই ছেলেটিকে পূর্ববঙ্গের কোনও একটা পল্লীকে গড়ে তোলার জন্য পাঠাচ্ছি।'

লেনার্ড এলমহার্স্ট শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার বছরতিনেক পরে নিজের দেশ ইংলন্ডে ফিরে যান। সেখানে শহর থেকে দূরে অনেকখানি জায়গা-জমি-বাড়ি-ঘর কিনে, 'ডার্টিংটন হল' নামে শ্রীনিকেতনের আদর্শে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্বে রইলেন পিতা কালীমোহন ঘোষ। গুরুদেবের পল্লী উন্নয়নের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাপক কার্যসূচি রচনা করে, শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী কয়েকটি মুসলমান হিন্দু ও সাঁওতালদের গ্রামে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথমেই তিনি দুটি হিন্দু ও একটি সাঁওতালদের গ্রাম নিয়ে, সেখানকার জনসমাজের সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করে তিনটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রথম পুস্তিকাটি মুদ্রিত হয়েছিল —শ্রীনিকেতনের কয়েক মাইল উত্তরে, কোপাই নদীর পূর্ব পাড়ের বল্লভপুর গ্রাম ও সেখানকার গ্রামবাসীদের নিয়ে। কয়েক বছর পরে প্রকাশ করলেন, অজয়নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত রায়পুর গ্রামের ব্যাপক তথ্যপূর্ণ অপর একটি পুস্তিকা। শেষ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, নিকটবর্তী

একটি সাঁওতাল পল্লী ও তার বাসিন্দাদের সম্পর্কে।

১৯২২ সাল থেকে এক দশকের মধ্যে এইরূপ তিনটি গ্রামের বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা, গুরুদেবের পরিকল্পনানুযায়ী এখানে পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দ্বারা সম্পন্ন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। সে যুগে ভারতবর্ষে এ ধরনের নিখুঁত গ্রামীণ তথ্য সংগ্রহ্ আর কোথাও কেউ করেছিলেন বলে জানা যায় না।

তিরিশ দশকের প্রথম দিকে, পিতৃদেব সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপ ও অধুনা গঠিত ইহুদিদের ইজরায়েল পর্যন্ত দেশগুলি ঘুরে, সবকটি দেশের সমবায় পদ্ধতির কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি বিরাট রিপোর্ট দেন এবং নতুন উদ্যমে শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে প্রথম যে সব সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন সেগুলিকে নতুন করে সাজাতে শুরু করেন।

গ্রামে গ্রামে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের দ্বারা প্রথম থেকেই পিতৃদেব গ্রামবাসীদের কাছ্ থেকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন, তার আন্তরিক পরিচয় রেখে গিয়েছিলেন এলমহার্স্ট তাঁর 'Poet and Plowman' গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে তিনি আমাদের পিতৃদেব সম্পর্কে জানাচ্ছেন—

'Kalimohan Ghose: He was the first to help the Poet in carrying out his plan of rural reconstruction in his ancestral estate. In the words of the Poet: "the responsibility of the work I took upon my shoulders, in the teeth of opposition of the educated gentry, was rendered easy of fulfilment by the fact of having Kalimohan at my side. We spent many hours together discussing the possibilities of rural reconstruction. I found in him the making of a true social worker and without him my task would have been rendered very difficult indeed." Later, he joined the school as a teacher and was sent by the Poet to England to gather knowledge about the various methods of primary education and adult literacy work. With the starting of the Institute of Rural Reconstruction at Santiniketan, he stepped forward to take up once again the duty of service to the humble and poor village folk in a spirit of selfless dedication.' (Ref. Page-177-Notes).

L. K. Elmhirst said the following to Rabindranath: 'After all the area around Ilambazar was famous one for its lac-work. Kalimohan has already discovered that of all the many families once engaged in this industry only four survive and they are almost ready for the burning ghat, but Kalimohan wants to rescue them and to establish the industry. We shall have to see what we can do. Kalimohan eventually succeeded in putting in the local lac-workers back on their economic feet.' (Ref. Page-87 — Sriniketan Diary).

'Not long after my arrival Tagore had explained to me how, whilst he was absent in Europe and had left Andrews in-charge, politics had invaded his ashram and had won many of the staff and students away from education and in the direction of Gandhi's political programme. "A handfull only", he said, "has remained loyal to my original plan and ideas and I hope you can make good use of one or two of them since they are not very popular up here any more." He then introduced me to Kalimohan Ghose, tall, lean with a fine romanesque nose, a ready sense of humour and packed with nervous energy.

'I must have made a date with him immediately to spend Monday visiting farms and villages within reach on foot in the neighbourhood. No one else had yet suggested to me a visit to a village and this illustrated clearly the statement Tagore had made to me a year ago, I have an educational institution which is mainly academic and quite isolated from the villages around, which are in various stages of decay.' (Ref. Page 93)

'It is a great privilege to me to write a note of appreciation about that very great hearted man, Kalimohan Ghose, my old colleague from January 1922 when we worked together at Surul on behalf of the villages in that area.

'It was Rabindranath Tagore who first introduced me to Kali Babu and who told me how valuable a member of the staff of our little Institute of Village Reconstruction he might be. He certainly was, and for this reason that by always showing an absolute respect for every villager, man, woman or child, he quickly won in return first their respect, and then their friendship, and, at the last, their devotion, whether Santali, Muslim or Hindu.

'What other Hindu, in those difficult days, was ever elected in the District Board election as their man? At his death villagers from all three communities claimed him as 'our Kali Babu'. He never thought of visiting a village as a duty he ought, for same political, social or religious reason, to visit. For him it was a privilege and a perpetual opportunity to visit his friends.

'When a Hindu Community buzzed with anger over the invasion of their village by an English Sahib and a crowd of Muslims intent upon destroying the plague of monkeys the villagers said, "of course the monkeys are a plague be object to seeing them killed and even more to having Muslim villagers chasing them through our village." "But where do the monkeys live?" asked Kali Babu. "In the Muslim village" said the Hindus. Then answered Kali Babu, "they must be Muslim monkeys." Everyone roared with laughter at the idea. Apologies were made and the hostility suddenly evaporated.

'Whenever cholera broke out and the news reached us, it was Kali Babu who immediately mobilised and equipped an expedition to go, best haste, to the village and to bring the outbreak under control. Where the villager was in trouble, he must, said Kali Babu, be persuaded or cajoled or educated into getting himself out of trouble. Nothing must be done for him that he could, with help, learn to do for himself. That was the basic meaning of the word "respect" in Kalimohan Ghose's mind as well as in his great heart.'

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর গুরুদেবের চিন্তামতো দরিদ্র গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের যতগুলি কার্যসূচি রূপায়ণে পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের দ্বারা পিতৃদেব যত রকমের কাজ শুরু করেছিলেন, তার মধ্যে 'সমবায় সমিতি ও সমবায় ধর্মগোলা' ছিল অন্যতম। নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের মধ্যে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মনে সমবায় নীতির প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। গুরুদেব সে কথা ভাল করেই জানতেন। তা সত্ত্বেও তিরিশ দশকের গোড়াতে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে সেখান থেকে গুরুদেব রাশিয়া সম্পর্কে অনেককে চিঠিতে তাঁর সেখানকার ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে আমার পিতৃদেবকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি ছিল। তার একটিতে তিনি আমাদের পিতাকে যা লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। চিঠির এই অংশটি, ১৩৮৯/১৯৮২ সালের শারদীয় 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় 'রাশিয়ার অন্য চিঠি' নামাঙ্কিত প্রবন্ধে অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন—'কালীমোহন ঘোষকে লেখা চিঠিতে মৃদু ভর্ৎসনা আছে, শ্রীনিকেতনের কাজের

ব্যাপারে।' গুরুদেব লিখেছিলেন—'আমি তোমাদের কোনও দিকেই জাগাতে পারলুম না। দেশের সরকার বাহাদুরের বাহাদুরিতে যে কটা অত্যন্ত টিমটিমে সমবায়ের বাতি জ্বলছে, তোমরা তারই মধ্যে একটা জ্বালিয়েছ। সেটাও যে উজ্জ্বলতম, তা নয়। কিছুই তোমরা ফলিয়ে তুলতে পারনি। তার একমাত্র কারণ, বুদ্ধির হৃদয়ের এবং উদ্যমের সুবিপুল জড়তা।'

প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯২২ সালের পর থেকে, পিতার পরিচালনায় শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়ন বিভাগের সমবায় নীতির কাজকর্ম যখন ভালভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তখন গুরুদেব একথা কেন লিখলেন? আমার ধারণা এই চিঠিতে গুরুদেব যে অভিযোগ তুলেছিলেন, তা আসলে হল, 'ঝিকে মেরে বউকে শেখানো'র পদ্ধতি। এর পূর্বে, ১৯২৬ সালে গুরুদেব যখন ইতালি হয়ে য়ুরোপে ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের অঙ্ক শিক্ষক গৌরগোপাল তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন ইতালি পর্যন্ত। তাঁকে ইতালিতে পাঠানো হয়েছিল রোম নগরে বাস করে সে দেশের সমবায় কার্যাবলির অনুশীলনের জন্য। এই খবরটি ১৩৩৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার শান্তিনিকেতন পত্রিকায় জানানো হয়। সেই খবরে আছে, 'শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল ঘোষ সমবায় পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য রোম নগরীতে অবস্থান করিতেছেন।' এ ছাড়া, 'শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা' নামক এক পুস্তকের লেখক জানাচ্ছেন, 'দেশে ফিরে তিনি (গৌরগোপাল ঘোষ) পরের বছর শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বীরভূমের দরিদ্র পল্লীবাসীদের উন্নয়নের কথা ভেবে সমবায় নীতির শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যাঁকে রোম শহরে পাঠানো হয়েছিল, তিনি দেশে ফিরে এসে সে পথে গেলেন না। ইতালি যাবার পূর্বে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে চন্দননগর শহরে। কলকাতায় কলেজের শিক্ষা শেষ করে বি এসসি ডিগ্রিও পেয়েছিলেন। বীরভূমের দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার সময় তিনি কখনও পাননি। তা সত্ত্বেও সমবায় পদ্ধতি শিক্ষার জন্য তাঁকে কেন ইতালিতে পাঠানো হয়েছিল, সেও এক রহস্য।

গৌরগোপাল ঘোষ দেশে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে অঙ্কের শিক্ষক হিসাবেই কাজ করতে লাগলেন। বছরখানেক পরে শ্রীনিকেতনে প্রশাসনিক কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন উচ্চপদে। এই কারণে তাঁর ইতালিবাস এবং সে দেশের সমবায় নীতির অভিজ্ঞতা বীরভূমের গ্রামের কোনও কাজে লাগল না। গুরুদেব এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমাদের পিতাকে লেখা ওই চিঠিটির মাধ্যমে তখনকার কর্তৃপক্ষকে জানাতে চেয়েছিলেন, লোক নির্বাচনে তাঁদের ভুলটা কীভাবে ঘটেছে।

এর পরে গুরুদেব এলমহার্স্ট-এর সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁর অর্থানুকূল্যে তিরিশ দশকের গোড়ার দিকে, পিতাকে পাঠালেন সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপ এবং প্যালেস্টাইন (বর্তমান ইজরায়েল) পর্যন্ত ঘুরে, সেইসব দেশের সমবায় পদ্ধতির কার্যাবলির সঠিক পরিচয় আহরণের উদ্দেশ্যে। মোট ছ মাস সেইসব দেশে ঘুরে, সেখানকার সমবায় পদ্ধতির কার্যাবলি ভাল করে দেখে দেশে ফিরে, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁর সেই পর্যবেক্ষণের বিশাল রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। তাঁর সেই রিপোর্টটি গুরুদেব এবং অন্য অনেকের কাছে য়ুরোপের সমবায় কার্যপদ্ধতির, তখনকার একটি মূল্যবান দলিল হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। আমাদের পিতা শ্রীনিকেতনে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতি কটি এবং সমবায় ধর্মগোলার প্রভূত উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই যুগেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিকটবর্তী কিছু গ্রামে সমবায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসাকেন্দ্র।

হাল আমলের শ্রীনিকেতন

গুরুদেবের মৃত্যুর পরে, বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পর, যখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন থেকে শ্রীনিকেতন যে বেশ খানিকটা ভিন্ন পথে চলতে শুরু করেছে, তা বললে হয়তো এ যুগের সেখানকার কর্মী ও শিক্ষকগণ বলবেন, যেহেতু আমি

পুরনো দিনের মানুষ, সেই হেতু, সেই দিনের প্রতি আমার অন্ধ মমতাবশত আমি এ কথা বলছি। গুরুদেবের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির প্রতি আমার অন্ধ মমতার কথাতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই। আমার মধ্যে যদি তা ঘটে থাকে, তবে তার জন্য আমি গৌরব বোধ করব। এই ভক্তির জোরেই আমি শ্রীনিকেতনবাসীদের অনুরোধ করব এই বলে যে, তাঁরা স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এ যুগে তাঁরা শ্রীনিকেতনকে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী সমাজের উপযোগী একটি মিনিয়েচার এগ্রিকালচারাল য়ুনিভার্সিটি বা কলেজরূপে গড়ে তুলেছেন কি না। শ্রীনিকেতনের এ যুগের প্রবক্তাদের কাছে আমার আবেদন এই যে, তাঁরা ভেবে দেখুন, শ্রীনিকেতনের আশেপাশের শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী গ্রামবাসী, কীভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে বেঁচে আছে। স্বাধীনতার পর দরিদ্র গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের কাজ দেশের সরকার নিজ হাতে অনেকখানি নিয়েছেন বটে, কিন্তু সে কাজ, গুরুদেবের চিন্তানুযায়ী সার্বিক নয় বলেই আমার মনে হয়। এ কথা চিন্তা করে বলতেই হয় যে, শ্রীনিকেতন থেকে গ্রামের জন্য আজও অনেক কিছু করবার আছে। এ যুগের শ্রীনিকেতনের কাছে তার জন্য প্রচুর সুযোগসুবিধা ও অর্থ এসে গেছে। সেই অর্থ দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে বা তাদের প্রয়োজনে কতটুকু বণ্টিত বা ব্যয়িত হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে শ্রীনিকেতন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী সমাজের ছেলেমেয়েদের আর্থিক সুযোগসুবিধার কথা ভেবে কাজ করছেন কি না ভেবে দেখা দরকার। এরা শ্রীনিকেতনের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে কেবলমাত্র সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরির সন্ধানে চলেছে কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে। যাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীনিকেতনে প্রচুর অর্থ বিতরণ করছেন, এভাবে তাদের কি বঞ্চিত করা হচ্ছে না? যে অর্থ কেন্দ্র দিচ্ছেন, গ্রামের দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে, তার কত ভাগ আমাদের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে, আর কত ভাগ গ্রামের দরিদ্র সমাজের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হচ্ছে, সে বিষয়ে এ যুগের বিশ্বভারতীর পরিচালকদের একবার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখার জন্য তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ।

বিশ্বভারতীর তরুণ অধ্যাপকবৃন্দ

বিশ্বভারতীর তদানীন্তন পরিচালকবৃন্দ ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর শান্তিনিকেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক একটি আই এ এবং বি এ উপাধি পরীক্ষার পড়াশোনা ও তার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেবার অনুমতি সংগ্রহ যেভাবে করেছিলেন সে বিষয়ে ভিন্ন অংশে তার আলোচনা করেছি। শান্তিনিকেতনে এই কলেজের পড়াশোনার প্রয়োজনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী যাঁদের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁরা সকলেই ছিলেন বয়সে তরুণ। তাঁরা স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠী তৈরি করে বিদ্যালয়ের যুগ থেকে যাঁরা গুরুদেবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে বনিবনা করে চলতে চাইতেন না। বনিবনার অভাবে বেশ কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপককে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে হয়েছিল। আমার পিতৃদেবও এই দলের নানাপ্রকার বিরুদ্ধতার কারণে বিরক্ত হয়ে শ্রীনিকেতনের কর্মত্যাগ করে চলে যাবার অনুমতি চেয়ে গুরুদেবের কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। গুরুদেব তা গ্রহণ না করে আমার পিতাকে অনুরোধ করেছিলেন শ্রীনিকেতনের কর্ম পরিত্যাগ করে চলে না যেতে। পিতা গুরুদেবের অনুরোধে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

কলেজের এই তরুণ অধ্যাপকগণ চেষ্টা করেছিলেন আমাকেও তাঁদের দলে টানতে। তাঁদের কার্যকলাপে, তাঁদের প্রতি প্রথম থেকেই আমি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতাম। এই কারণে ওই দলটি আমার বিরুদ্ধে গুরুদেবের কাছে হামেশাই নানাপ্রকার অভিযোগ পেশ করতেন। গুরুদেব

আমার বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগের কথা শুনে বিশেষ আমল দিতেন না। আমাকে ডেকে তিনি সব বলতেন এবং আমার কথা শোনার পর আমাকে সর্বদাই উপদেশ দিতেন, আমি যেন নিজের মতো কাজ করে যাই। অভিযোগের কথা শুনে যেন বিচলিত না হই। আমাকে নিয়ে এইরূপ ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত। কিন্তু গুরুদেব আমাকে সর্বদাই রক্ষা করতেন বলে আমি নির্ভয়ে আমার মতো কাজ করে যেতাম। কলেজের তরুণ অধ্যাপকদের কথায় কান দিতাম না। তাঁরা কিন্তু আমার প্রতি তাঁদের মিথ্যা অভিযোগের পথ কোনওদিন ত্যাগ করেননি। এঁরা চাইতেন, প্রবীণ অধ্যাপকদের মতো আমি যেন বিরক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনের কর্ম ত্যাগ করে বাইরে চলে যাই। রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবী তরুণ অধ্যাপকদের কথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁরাও চাইতেন না আমি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করি।

গুরুদেবের মৃত্যুর মাস আষ্টেক পূর্বে, অর্থলোভে আমি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করব, আমি সিনেমায় যোগ দেব, এইরূপ এক মিথ্যা অভিযোগ গুরুদেবের কাছে এমনভাবে পেশ করা হয়েছিল যে, গুরুদেব তা বিশ্বাস করে এবারে আমাকে আর ডেকে পাঠালেন না। তখন তিনি খুবই অসুস্থ। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে নিজের অসুস্থ হাতেই চিঠি লিখে, তাঁর দ্বিতীয় ভৃত্যকে দিয়ে আমার কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন। আমি বাড়িতে দুপুরের স্নান-আহার করে, সংবাদপত্র পড়ছিলাম। ভৃত্যটি চিঠিখানি আমার হাতে ধরিয়ে দেবার সময় বলেছিল, 'বাবামশায় এটি পাঠিয়েছেন'। আমি চিঠিটি পড়ে স্তম্ভিত। তাঁর হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারলাম, বেশ কষ্ট করেই চিঠিটি তাঁকে লিখতে হয়েছিল।

গুরুদেবের হস্তলিখিত চিঠিপত্রগুলি তখনকার দিনের একটি অফিসের খাতায় নিয়মিত নকল রেখে, তারপরে যথাস্থানে পাঠানো হত। আমাকে লেখা এই চিঠির ক্ষেত্রে তিনি তা করতে না দিয়ে, কাউকে না জানিয়ে সরাসরি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেন জানি না, তখন আমার মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই এই চিঠির কথা অন্য কেউ জানুক, হয়তো তিনি তা চাননি। পরে বুঝেছিলাম, আমার এই অনুমান সত্য। এই চিঠির কথা তখন আর কেউ জানতেন না। আমি কাউকে জানাব না বলেই স্থির করেছিলাম।

সেদিন গুরুদেবের ওই চিঠি পাঠ করে আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলে গিয়েছিলাম গুরুদেবের কাছে। তিনি তখন উদয়ন বাড়ির নীচের তলায় দক্ষিণ অংশের বারান্দায় একটি বড় আরাম কেদারায় একাকী বসেছিলেন। আমি চিঠিটি দেখিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলাম, আমাকে এভাবে আপনি কেন অবিশ্বাস করলেন ? স্বপ্নেও কখনও আপনাকে এবং শান্তিনিকেতন ত্যাগ করবার কথা আমার মনে জাগেনি। আপনার আশ্রয়েই আমি মানুষ। নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার কাজ আমি করবার সুযোগ পেয়েছি বলে আমার মনে কোনও অসন্তোষ স্থান পায়নি। আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে আমার কর্মজীবন কাটাচ্ছি। আমার তখনকার চোখের জল ও কণ্ঠস্বর শুনে গুরুদেব আমাকে শান্ত হতে বলে, নিকটেই একটি মোড়া ছিল, তাতে বসতে বললেন। চোখ মুছে মুখোমুখি বসেছিলাম। তখন তিনি যে কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন, তাকে আমি পরে মন্ত্রের মতো আমার জীবনে গ্রহণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি সৎপথে থেকে আমার কর্মজীবন চালিয়ে যাই, তা হলে কোনও অশুভ শক্তি আমার কোনও প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সেদিন তিনি এ কথাও বলেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে বেশ কিছু ঝড়-ঝাপটার মুখে আমাকে পড়তে হবে। তখন ভয় না পেয়ে মাথা উঁচু করে আমি যেন চলি। ভয়ে ভেঙে পড়লেই আমাকে অন্যায়ের কাছে হার মানতে হবে। তাঁর এই উপদেশে সাহস পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মন বলেছিল, আমার মতো সামান্য যুবকের পক্ষে এইভাবে একলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কি সম্ভব হবে। আমার মন বেশ খানিকটা শান্ত হবার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ে হাত রেখে বলেছিলাম, বিশ্বভারতী আমাকে যদি জোর করে তাড়িয়ে না দেয়, তা হলে কোনও প্রলোভনে আমি শান্তিনিকেতন কখনওই ত্যাগ করব না। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আমাকে সেদিন আশীর্বাদ করেছিলেন। ২১/১/৪১ তারিখে যে চিঠি তিনি নিজের হাতে লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি হল—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু শান্তি,

কেবল দুটি উপদেশ আমার আছে। এই আশ্রমেই তুই মানুষ। সিনেমা প্রভৃতির সংস্পর্শে কোনও গুরুতর লোভেও নিজেকে যদি অশুচি করিস তাহলে আমার প্রতি ও আশ্রমের প্রতি অসম্মানের কলঙ্ক দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়, আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে—বিশুদ্ধভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কর্তব্য হবে। আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য। আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি। ইতি

'রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা' গ্রন্থে তা প্রকাশ করতে হয়েছিল কোনও কারণে বাধ্য হয়ে। গুরুদেব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে নানারূপ অপবাদের ঝড়ের মধ্যে আমি পড়ব, তা সত্যিই তখন পড়েছিলাম। মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে রেহাই আমাকে পেতে দেয়নি তথাকথিত এখানকার তরুণ অধ্যাপকরা।

১৯৪৩ সালে পুনরায় আমার নামে, আমার কর্তব্যে অবহেলার এক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল বিশ্বভারতী কর্মসমিতিতে।

সে সময় গুরুদেবের কথা স্মরণ করে আমি স্থির করেছিলাম, সেই অভিযোগ, প্রকৃত বিচারের দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, যেখান থেকে অভিযোগ এসেছে তাঁর সঙ্গে আমি কোনওপ্রকার সহযোগিতা করব না। কোনও নির্দেশও আমি মানব না। এ নিয়ে হইচই পড়ে যায়। বিষয়টি সহজভাবে মিটিয়ে নেবার চেষ্টাও কর্তৃপক্ষ তখন করেছিলেন। সেভাবে মিটিয়ে নিতে আমি দিইনি। মিথ্যা অপবাদে অপমানিত হয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলেও যাইনি। রথীন্দ্রনাথ তখন আমার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করেন। আমি সসম্মানেই সেখানে রয়ে গেলাম। প্রায় এক দশক পরে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী যখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য হলেন, আমাকে আমার পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনলেন, পুরো মর্যাদা দিয়ে।

এই ঘটনার প্রায় ২০ বছর পরে পুনরায় কলেজের সেই দল এবং শান্তিনিকেতনের একদল প্রাক্তন ছাত্র, যাঁরা ছিলেন কর্মসমিতির সদস্য, এক জোট হয়ে আমার নামে আর একটি মিথ্যা অভিযোগ এনে, আমাকে বলা হয়েছিল, আমি যদি অভিযোগ স্বীকার করে সমাধান প্রার্থনা করি, তা হলে কর্তৃপক্ষ আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে সময়েও গুরুদেবের সেদিনকার সেই উপদেশ স্মরণ করে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। জানিয়েছিলাম, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটি নিরপেক্ষ তদন্তকারী দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তা করতে প্রস্তুত নই। কর্মসমিতির সদস্যরা আমাকে কর্মচ্যুত করেন এবং একই সঙ্গে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন যাতে আপশে মিটমাট হয়ে যায়। সেই সময় দিল্লির আকাশবাণী থেকে, গুরুদেবের জন্মশতবর্ষের কার্যোপলক্ষে নিযুক্ত হবার প্রস্তাব পেয়ে, দিল্লিতে গিয়ে তার দায়িত্ব নিই। বছরখানেক পরে সুধীরঞ্জন দাশ বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর, আমাকে শান্তিনিকতনে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি দেন। আমি আকাশবাণীর ডাইরেক্টরকে সে কথা জানিয়ে সেখানকার কর্মত্যাগ করে ফিরে আসার পর আমাকে পূর্বের ন্যায় পূর্ণ দায়িত্বে তিনি নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে জানি না কী কারণে, আমাকে বিশ্বভারতী থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই নানাপ্রকার কাজের দায়িত্ব ত্যাগ করে শান্তিনিকেতন ছেড়ে বরাবরের মতো চলে যেতে হয়েছিল। এবারেও মনে হয়েছিল, গুরুদেবের সেদিনকার সেই উপদেশ অনুযায়ী আমি মিথ্যাচারণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই বোধহয় বিরোধীরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য বাধ্য হয়েছিলেন শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে।

গুরুদেবের ওই চিঠিটি বেশ কিছুকাল পরে আমি আমার 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা' গ্রন্থে প্রকাশ করে

দেবার পর তথাকথিত রবীন্দ্রানুরাগী এক লেখক, এক মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, ওই চিঠিতে যে তারিখ আছে, সে সময়ে গুরুদেবের নাকি নিজ হাতে লেখার কোনও ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং সেটি জাল চিঠি। এর প্রতিবাদ করে উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে চিঠিতে জানাই যে, ওই তারিখের পরেও তিনি নিজ হাতে লিখে, কটি চিঠি কাকে কাকে পাঠিয়েছিলেন, তার একটি তালিকা। সেটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও প্রতিবাদ লেখক করেছিলেন বলে এখনও খবর পাইনি।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর একজন শিল্পী ও সমালোচক তাঁর এক প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন, আমি নাকি বিশুদ্ধভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা দিতাম না, সেই কারণে গুরুদেব আমাকে সে বিষয়ে সতর্ক করবার জন্য চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বিশুদ্ধভাবে সে গানের [রবীন্দ্রসঙ্গীত] প্রচার করা তোর কর্তব্য হবে।' আমি এই রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পাঠ করে পরিষ্কার বুঝে নিয়েছিলাম যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে গুরুদেব নিজে কী বোঝাতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে এই লেখকের মনে সঠিক কোনও ধারণা নেই বলেই ওইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করতে তিনি সাহস পেয়েছেন। 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলতে গুরুদেব যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলে গেছেন। আমাকে এই চিঠিটি লেখার পূর্বে, ইংরেজি ৩০ জুন ১৯৪০/বাংলা ১৬ আষাঢ় ১৩৪৭ তারিখে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনের দোতলার হল ঘরে কলকাতার 'গীতালি' নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ের সভানেত্রী ছিলেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। যুগ্মসম্পাদক ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ভ্রাতা প্রফুল্ল মহলানবিশ, যিনি 'বুলা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। সে দিনের 'গীতালি'র ছাত্রছাত্রী এবং সেখানকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গুরুদেবের বর্ষা ঋতুর গান, একক দ্বৈত ও সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিলেন। গান শেষ হলে বুলাবাবু গুরুদেবকে অনুরোধ করেন, সেদিনের গান সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে। গুরুদেব বুলাবাবুর অনুরোধ রক্ষা করে সেদিন তাঁদের যা বলেছিলেন তা হল—'আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। ...বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ, এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে শিখিয়ো—এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।'

'গীতালি' রবীন্দ্রসঙ্গীত বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার। কিন্তু সেদিন 'গীতালি' যে তা প্রকাশ করে শোনাতে পারেনি, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গুরুদেবের, উপরে উদ্ধৃত ভাষণ থেকে। গুরুদেব ভাল করেই জানতেন, দিনেন্দ্রনাথ ও রমা করের (নুটু) অবর্তমানে তখন একমাত্র আমার দ্বারাই তা সম্ভব ছিল। পাছে আমি বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন পথ ধরি, সেই কারণেই আমার প্রতি ওই পত্রে তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

গুরুদেবের তিরোধান-পর্ব

গুরুদেবের নানা পথে বিকীর্ণ জীবনের শেষ তিরিশ বছর ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে জানবার ও দেখবার সুযোগ আমার যেভাবে হয়েছিল, তাকে যথাসম্ভব বিস্তীর্ণভাবে আমার এই রচনার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত করেছি। এবারে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের বিবরণ দিয়ে আমার স্মৃতিচারণার সমাপ্তি টানব।

আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, জীবনের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণ হল, তাঁর প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের কাজ যথাযথভাবে হচ্ছিল না। ফলে নিয়মিত প্রস্রাবের অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। এই

সময়ে তিনি ছিলেন কালিম্পঙে মৈত্রেয়ীদেবীর আশ্রয়ে। শোনা যায়, সেখানকার ইংরেজ সিভিল সার্জনকে ডাকা হয়। তিনি নাকি বলেছিলেন প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের চিকিৎসা সে যুগে যেভাবে হত, অর্থাৎ পেট ফুটো করে নল লাগিয়ে প্রস্রাব ত্যাগ করার যাতে সুবিধা হয়—তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। প্রতিমাদেবী তখনই সেইরূপ চিকিৎসায় সম্মতি দেননি। সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে এসে ডাঃ নীলরতন সরকারকে ডেকে তাঁর মতামত চাইলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার নাকি পেট ফুটো করবার চিকিৎসার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে বলেছিলেন, এই বয়সে ওইরূপ চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যাবে না। বিপদ ঘটতে পারে। তখন ঠিক হয়েছিল ওষুধ খাইয়ে গুরুদেবের প্রস্রাবের অসুবিধাকে দূর করবার চেষ্টা করা হবে। পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বিদেশ থেকে উপযুক্ত ওষুধ আনানোর খুবই অসুবিধা। তা সত্ত্বেও চেষ্টা করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ ভাল না হলেও ওইসব ওষুধের কারণে কিছুটা সুস্থবোধ করবার পর তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়।

তখন তাঁকে রাখা হয়েছিল 'উদয়ন' বাড়ির নীচের তলায় দক্ষিণ দিকের অংশে। দিনরাত্রি তাঁর সেবার জন্য দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন, তার মধ্যে গুরুদেবের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, কন্যা মীরা দেবী, নাতনি নন্দিতা (বুড়ি) এবং অনিল চন্দের পত্নী রানী চন্দের কথা মনে আছে। রাত্রিতে তাঁর সেবার জন্য যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সচ্চিদানন্দ রায় (আলু) আর বিশ্বরূপ বসু। কখনও কখনও সেবার লোকেরও বদল হত। কিন্তু তখন যাঁরা থাকতেন তাঁদের কথা এখন স্মৃতির বাইরে চলে গেছে। গুরুদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে আমিও রাত্রির ওই সেবাদলে একবার স্থান পেয়েছিলাম। কিন্তু কি কারণে সেই দল থেকে আমি নিজে থেকেই মুক্তি নিয়েছিলাম, ইতিপূর্বে তা বর্ণিত হয়েছে বলে এখানে তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।

গুরুদেবের প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের চিকিৎসা নানা উপায়ে চলতে থাকে। কখনও অসুখের প্রকোপ বাড়ে, কখনও কমে। এই অবস্থায় শেষদিকে শুনলাম, কলকাতার এক কবিরাজের চিকিৎসায় তাঁর অসুখের কিছুটা নাকি উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় করবার আশ্বাস তিনি দিতে পারেননি। ভালমন্দে মিশিয়ে এ ভাবেই গুরুদেবের দিন তখন কাটছিল। এই অবস্থায় নিরূপায় হয়ে কলকাতার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং একজন খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসককে খবর পাঠানো হল, তাঁরা যেন শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবকে ভাল করে পরীক্ষা করে স্থির করে দেন যে, ওই অবস্থায় কী করণীয়। তাঁরা খবর পেয়েই চলে এসেছিলেন। তখন কবিরাজি চিকিৎসকও ছিলেন। কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি যেভাবে চিকিৎসা করছেন তার দ্বারা সম্পূর্ণ রোগমুক্তির আশা আছে কি না। তিনি নাকি বলেছিলেন যে, সেইরূপ সঠিক আশার কথা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ হল, গুরুদেবের অসুখ তখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার থেকে গুরুদেবকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার ভরসা দিতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না। প্রথম থেকেই যদি তাঁকে তিনি তাঁর চিকিৎসাধীনে পেতেন তা হলে সাহস করে তিনি বলতে পারতেন যে এই অসুখ থেকে তাঁকে মুক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না। এরপরই ডাঃ রায় ও শল্যচিকিৎসকদ্বয় স্থির করেন, গুরুদেবকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে শল্যচিকিৎসার দ্বারা চেষ্টা করবেন সুস্থ করে তুলতে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, কন্যা মীরা দেবী ও আরও কয়েকজন ডাঃ রায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। দায়িত্ব দিলেন ডাঃ রায়কে, তিনি যেন গুরুদেবকে সব কথা জানিয়ে তাঁকে রাজি করান। পূর্বে ডাঃ নীলরতন সরকার শল্যচিকিৎসা গুরুদেবের পক্ষে অশুভ হবে বলে যে মত দিয়েছিলেন, গুরুদেবের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়েছিল। তাই, ডাঃ রায়ের অনুরোধে গুরুদেব নাকি সঙ্গে-সঙ্গেই সম্মতি দেননি। একদিন ভাল করে ভেবেচিন্তে পরের দিন ডাঃ রায়কে কলকাতায় যাবার সম্মতি জানান। সেই মতো দিনক্ষণ স্থির করে গুরুদেবকে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়। শান্তিনিকেতনবাসী আমরা সকলেই সেই সংবাদ পেয়ে অন্তর থেকে আশা করেছিলাম এই ভেবে যে, ডাঃ রায় যখন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন আর ভয়ের কোনও কারণ নেই। সুস্থ হয়ে গুরুদেব নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে প্রশ্ন

জেগেছিল, সম্মতির জন্য গুরুদেব পুরো একদিন সময় নিলেন কেন ? তিনি কি বুঝেছিলেন, যে ধরনের চিকিৎসা তাঁর দেহে করা হবে, তা তাঁর পক্ষে শুভ হবে না। সেই কারণেই কি অশুভ পরিণতির কথা ভেবে নিজের মনকে তৈরি করে নিতে একদিন সময় চেয়েছিলেন ? যৌবনে পদার্পণ করবার পর আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছিলাম যে গুরুদেব একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তিনি প্রায় প্রতি বিষয়ের কার্যকারণ চিন্তা করে পূর্বেই বুঝতে পারতেন, সে বিষয়ের ভালমন্দের পরিণতি কী হবে। গুরুদেবের প্রতি এইরূপ একটি বিশ্বাস আমার মনে স্থান পেয়েছিল বলেই আমার বারে বারে মনে হয়েছিল যে, গুরুদেব নিশ্চয়ই তাঁর এই কলকাতায় যাত্রাকে অগস্ত্যযাত্রা রূপেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই নিজের মনের সায় পাবার জন্য তাঁকে পুরো একদিন সময় নিতে হয়েছিল।

কলকাতায় গুরুদেবকে যেদিন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেদিন 'উদয়ন' বাড়ির সামনে এখানকার আশ্রমিকরা সমবেত হয়েছিলেন। যে পথ দিয়ে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রাস্তার দু পাশে সকলে ভারাক্রান্ত চিত্তে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে প্রণতি জানাচ্ছিলেন। গাড়িটি অতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল।

'উদয়ন' বাড়ির প্রাঙ্গণে গুরুদেবকে একটি বড় ইজিচেয়ারে বসিয়ে কাঁধে করে বয়ে এনেছিলেন একদল। তখন দেখলাম তাঁর চোখে কালো রঙের কাঁচের চশমা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে তাঁকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চোখে কালো চশমা দেখে আমার মন বলে উঠল, কেন তিনি কালো কাঁচের চশমা সেদিন পরলেন ? শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনবাসী সকলকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাবার বেদনা তাঁর চোখের চাহনি থেকে যাতে কেউই বুঝতে না পারেন, তার জন্যেই কি পরেছিলেন সেই কালো কাঁচের চশমা ?

তিনি গাড়িতে করে চলে যাবার সময় কালো কাঁচের চশমা পরা তাঁর মুখ দেখে আমার মন খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। গাড়ির পিছনে পিছনে অশ্রুসিক্ত নয়নে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। পা আর চলতে চাইল না। ফিরে এলাম নিজেদের বাড়িতে। সারাদিনই কাটালাম বাড়িতে, আমার জীবনে গুরুদেবের নানারূপ স্মৃতিচারণ করতে করতে অন্য কোনও চিন্তার দিকে মন কিছুতেই যেতে চাইল না।

এরপর একটার পর একটা দিন যেতে লাগল। শান্তিনিকেতনবাসী সকলেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, গুরুদেবের সংবাদ পাবার জন্যে। খবর আসছে, কিন্তু গুরুদেবের দেহে শল্যচিকিৎসার কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় দিনকয়েক বাদে খবর এল, তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, কিন্তু তিনি নাকি জ্ঞানহারা, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'কোমা', সেই অবস্থায় আছেন। শান্তিনিকেতনে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যেন দিশেহারা। যে আশা নিয়ে শান্তিনিকেতনবাসী সকলে তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন, তা কি তাহলে পূর্ণ হবে না ! তিনি কি আর জ্ঞান ফিরে পাবেন না ? এই চিন্তাতেই সকলের মন তখন ভারাক্রান্ত। এইরূপ এক মানসিক অবস্থায় আমিও দিন কাটাচ্ছিলাম। কোনও কাজে মন দিতে পারছিলাম না। কেবল মনে হচ্ছিল, তিনি নিজে যা ভেবে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছিলেন, তাই কি শেষ পর্যন্ত হতে চলেছে !

এইপ্রকার মানসিক বিভ্রান্তির মধ্যে যখন দিন কাটাচ্ছি, তখন ২২শে শ্রাবণের আগের রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে গুরুদেবের কথা চিন্তা করতে করতে যখন প্রায় ঘুমে চোখ বুজে এসেছে, হঠাৎ কেন জানি না ঘুম ভেঙে গেল। মনে হতে লাগল, হয়তো আর গুরুদেবকে দেখতে পাব না। উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম কলকাতায় আমাকে যেতেই হবে। তখনই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মাকে বললাম, আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে, তা না হলে গুরুদেবের দেখা আমি আর পাব না।

সেই অন্ধকার রাত্রে পায়ে হেঁটে বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে, কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে হাওড়াগামী ট্রেনটি পেলাম। তাতে চড়ে বসলাম। মনে তখন একমাত্র চিন্তা, গুরুদেবকে দেখতে পাব তো ? বর্ধমান হয়ে গাড়িটি যখন ব্যাণ্ডেলে এসে পৌঁছল, তখন সকাল হয়ে গেছে। যাত্রীদের মধ্যে

কয়েকজন তখন গুরুদেব সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। গুরুদেব যে মৃত্যুপথযাত্রী সে খবর তাঁরাও পেয়েছেন। কীভাবে তা পেয়েছেন, সে কথা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করবার সাহস তখন পাচ্ছি না। হাওড়া পৌঁছে কোনওরকমে ট্রামে করে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির মুখে এসে, সেই গলি দিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তখন গলিতে বেশ ভিড় জমে গেছে। উঠে পড়লাম ভিড় ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। যে ঘরে গুরুদেবকে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলেছিল, সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি, মেডিকেল কলেজের মতো একটি স্টিলের খাটে গুরুদেবকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পূর্বদিকে তাঁর মাথা একটু উঁচু করে শোয়ানো। তিনি চোখ বোজা অবস্থায় আছেন, কিন্তু জ্ঞানহীন। তাঁর পূর্বদিকের মাথার কাছে মেঝেতে বসে ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন মহিলা একমনে একত্রে বসে গুরুদেবের 'পূজা' পর্যায়ের গান গাইছিলেন। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে গুরুদেবের তখনকার চেহারা দেখে আমি স্তম্ভিত। তাঁর সেই ভরাট মুখের কোনও চিহ্ন নেই। শুকিয়ে যেন ছোট হয়ে গেছে। এর কারণও ছিল। গুরুদেব যে সর্বদাই মুখে দু পাটি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতেন, তা আমি জানতাম। দু পাটি দাঁত অসুস্থ অবস্থায় খুলে রাখা হয়েছিল বলেই মুখের দু পাশের গাল যে চুপসে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারলাম। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করবার ইচ্ছা থাকলেও ভিতরে ঢুকতে পারিনি। দরজার সামনে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। তখন আমার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। দরজা থেকেই জোড়হাতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করে, সেখান থেকে ফিরে এসে, পাশের লাল বাড়ি, যাকে বলা হত 'বিচিত্রা ভবন', তার দক্ষিণের বারান্দায় এসে, গুরুদেব যে ঘরে ছিলেন, সে দিকে তাকিয়ে রইলাম। সামনের গলিটিতে তখন লোকে লোকারণ্য। সে যুগের আকাশবাণীর দ্বারা গুরুদেবের খবর এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে, তার দ্বারা সকলেই বুঝে নিয়েছিলেন, গুরুদেবের মৃত্যু আসন্ন। দোতলার বারান্দা থেকে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এই জনতা বোধহয় আগে গুরুদেবকে সামনাসামনি কখনও দেখেনি বলেই উন্মত্তের মতো ছুটে এসেছে তাঁকে শেষ দেখা দেখবার আকাঙ্ক্ষায়। তখন দুটি বাড়িরই দোতলায় গুরুদেবের পরিচিত বহুজনকে দেখা গেল। তাঁদের কথাবার্তায় জানা গিয়েছিল যে, গুরুদেব যে কোনও সময়ে প্রাণত্যাগ করতে পারেন। একটি কাঠের খাটও সেই কারণে আনিয়ে রাখা হয়েছিল। কারা সেই খাটটিতে গুরুদেবকে শুইয়ে কাঁধে বহন করে নিমতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবে, তার কথাও ভেবে রাখা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দেখা গেল দর্শনার্থী মানুষের প্রচণ্ড চাপ। তারা ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগল, দোতলায় উঠে গুরুদেবকে শেষ দেখা দেখে নিতে। দোতলায় ওঠবার দুটি দরজার মধ্যে একটি ছিল লোহার কোলাপসিবল বড় গেট, অপরটি ছিল কাঠের। যাঁরা ভিড়ের ওই চাপ সামলাবার চেষ্টা করছিলেন, সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও দেখেছিলাম। তিনি বহু চেষ্টা করেও ভিড় শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলেন না। লোহার কোলাপসিবল গেটটি দুভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হুড়মুড় করে মানুষের দল দোতলায় গুরুদেবের ঘরের সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে দূর থেকে জোড়হাতে প্রণাম জানিয়ে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছিল। প্রণাম জানাবার সময় কোনওপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। কোলাপসিবল গেটটি ভেঙে পড়বার সময় অপর আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটি উল্লেখযোগ্য মনে করি।

শ্যামাপ্রসাদবাবুরা যখন ভিড় সংযত করবার চেষ্টা প্রাণপণে করে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে আর একদল যুবক, জলনিকাশের যতগুলি নল উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিল, সেগুলিকে অবলম্বন করে অনায়াসেই দোতলায় উঠতে লাগল। গল্পে সৈনিকদের দুর্গে প্রবেশ বা দুর্গজয়ের যে বর্ণনা পড়েছি, জলের পাইপ বেয়ে উপরে ওঠার দৃশ্য দেখে আমার সেই কথা মনে হতে থাকে। তখনও গুরুদেব প্রাণত্যাগ করেননি। অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত। বোধহয় বেলা ১২টার পর একজন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, গুরুদেব বরাবরের মতো চলে গেলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। গুরুদেব যে ঘরে শায়িত ছিলেন তার পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হল। ভিতরের মহিলারা গুরুদেবকে নতুন বস্ত্র পরিয়ে, মালাচন্দনে সাজাতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে বারান্দায় কাঠের খাটটি এসে গেল। তার

উপরে গুরুদেবকে শুইয়ে নিয়ে যাবার জন্য পরিষ্কার গদি ও বালিশ রাখা হয়েছিল। দুদিকের কাজ শেষ হলে ঘরের দরজা খুলে গুরুদেবকে বহন করে এনে খাটে শুইয়ে দিলেন, যাঁরা খাটটি বহন করে নিয়ে যাবেন তাঁরাই। খাটটি কাঁধে তুলে পাশের সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসার পর বিস্ময়কর এক কাণ্ড ঘটে গেল। তখন গলিতে প্রচণ্ড মানুষের ভিড়। হঠাৎ দেখি ভিড়ের মধ্যে একদল যুবক গুরুদেবসহ কাঠের খাটটি নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে কোনওপ্রকার হট্টগোল হতে দেখিনি। সবটাই নিঃশব্দে ঘটেছিল। বাহকেরা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল, মরদেহের সামনের এবং পিছনের ভিড়ও চলতে শুরু করেছে।

'বিচিত্রা' ভবনের দক্ষিণের বারান্দায় আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলাম। আমার মন তখন বলতে লাগল, যারা কোলাপসিবল গেট ভেঙেছে, জলের নল ধরে দোতলায় উঠেছে, তারা তা করল কেন? কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জনগণকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে কেন তাঁরা পারলেন না? সে সময়ে গুরুদেবের অতি পরিচিতরা, যাঁরা এই ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা যে কেন এত তাড়াহুড়ো করে গুরুদেবের দেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার কারণ আমি জানি না। জনসাধারণের গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন এবং চাক্ষুষ দর্শনের সুযোগদানের ব্যবস্থা অনায়াসেই করতে পারতেন— সেইদিন এবং সেই রাত্রিতে মরদেহকে সাজিয়ে রেখে। তা হলে, দর্শনে ইচ্ছুক জনসাধারণ, সারিবদ্ধ হয়ে, একে একে গুরুদেবকে দর্শন করে শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়ে চলে যাবার সুযোগ পেত। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মরদেহ নিয়ে কলকাতায় এইরূপ ব্যবস্থা পূর্বে হয়েছে, এ যুগেও তা অব্যাহত আছে।

গুরুদেবের মরদেহ নিয়ে জনগণ যখন গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠেছে, তখন সেই ভিড়ের পিছনে আমিও স্থান নিই। কিছুক্ষণ যাবার পর শোনা গেল গুরুদেবের মরদেহ উত্তর কলকাতার বড় বড় রাস্তা ঘুরে নিমতলায় যাবে। তখন স্থির করলাম এই ভিড় এড়িয়ে আগেই আমি নিমতলায় পৌঁছে যাব। পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছে দেখি, সেখানেও ভিড় জমে গেছে। অসংখ্য মানুষ আগে থেকেই গুরুদেবের শেষকৃত্য দর্শনের সুবিধার্থে শোকযাত্রার সঙ্গে না গিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। তখন যেভাবে দাহকর্ম সম্পন্ন হবে তার ব্যবস্থা করছিলেন শান্তিনিকেতনের সুরেন্দ্রনাথ কর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন শান্তিনিকেতনবাসী। এঁরা সকলে পূর্বেই এসে গিয়েছিলেন ব্যবস্থাপনার জন্য। শোকযাত্রা এখানে পৌঁছতে অনেক সময় নেবে মনে করে আমি হেঁটে বিবেকানন্দ রোডে আমার এক মাসির বাড়ি চলে আসি। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় ছিলাম। তৃষ্ণায় জল গ্রহণের কথাও তখন মনে ছিল না। স্নান করে সামান্য কিছু খেয়ে, খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আবার যাত্রা করলাম শ্মশানঘাটের দিকে। ইতিমধ্যে সময় যে কতটা পার হয়ে গেছে তার কোনও খেয়াল ছিল না। সে যুগে আমার হাতে ঘড়িও ছিল না। তখন রাত হয়ে গেছে। শ্মশানঘাটে পৌঁছবার আগে থেকেই দেখি, দলে দলে মানুষ ফিরে যাচ্ছে। অনুমান করলাম তা হলে নিশ্চয়ই দাহকর্মের সমাপ্তি ঘটেছে। শ্মশানে পৌঁছে দেখলাম, গঙ্গা থেকে কলসিতে জল এনে শ্মশানের আগুন নেভাবার কাজ চলছে। বাইরে তখন বেশি লোক আর নেই। ভিতরে সুরেন কর-সহ তাঁর সহকর্মী কয়েকজন সেখানে আছেন। আমাকে দেখামাত্র সুরেনবাবু ভিতরে আসতে বললেন। সেখানে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যে একজন খুব বড়ো পিতলের কলসি নিয়ে এলেন। সুরেনবাবু স্থির করেছিলেন ওই কলসিটিতে শ্মশানের ভস্ম সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবেন। আমরা সকলেই হাতের মুঠোয় চিতাভস্ম সংগ্রহ করে কলসিতে রাখতে লাগলাম। এই সময় আমার হাতে একটি ছোট হাড় ঠেকল। আমি সেটিকে কিছু পোড়া চন্দন কাঠের টুকরোর সঙ্গে তুলে, কাছেই পড়ে থাকা একটি কাগজে ভাল করে মুড়ে, নমস্কার করে পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিলাম। ভস্ম সংগ্রহের কাজ শেষ হবার পর সুরেন কর বললেন, পরের দিন হাওড়া স্টেশন থেকে দ্বিপ্রহরের ট্রেনে কলসিটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে তাঁরা ক'জন ফিরে যাবেন, আমিও যেন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিই। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে, সেই রাত্রে আমার মাসিমার বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখলাম সুরেনবাবু দু'জন সঙ্গীসহ একটি কম্পার্টমেন্টে

কলসিটিকে যত্নের সঙ্গে সাজিয়ে বসে আছেন। সে যুগে তৃতীয় শ্রেণীতে এ যুগের মতো ভিড় হত না। সুতরাং সকলের সঙ্গে আমার স্থান সহজেই হয়ে গিয়েছিল।

সুরেন কর ছিলেন গুরুদেবের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। গুরুদেবের নানা ব্যক্তিগত কাজের জন্য তিনি গুরুদেবের সঙ্গ পেয়েছেন বহুবার। গুরুদেবের সহায়ক হিসেবে বিদেশেও ভ্রমণ করেছেন। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার কিছু পরেই গুরুদেব সম্পর্কে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইলে, তিনি খুবই আগ্রহভরে একটার পর একটা ঘটনার স্মৃতিচারণ করে আমাদের এমন মজিয়ে রেখেছিলেন যে, একটার পর একটা স্টেশন পার হয়ে বর্ধমানে যখন গাড়ি থামল তখন আমাদের হুঁস হল। চা পান করলাম। গাড়ি ছাড়ার পর আবার আমাদের অনুরোধে তিনি গুরুদেবের সম্পর্কে গল্প বলতে শুরু করলেন। এভাবে গুরুদেবের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সন্ধ্যার মুখে বোলপুর স্টেশনে পৌঁছলাম। কলসিটিসহ স্টেশনে নেমে জানতে পারলাম, সুরেন কর যে দলবলসহ গুরুদেবের চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছেন, তার খবর শান্তিনিকেতনে যথাসময়ে পৌঁছে গিয়েছে। স্টেশনের বাইরে এবং আগাগোড়া বোলপুর শহরের যে পথে সুরেনবাবুসহ কলসি নিয়ে আমরা যাব, সেই পথের দু'পাশে শহরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকারা সারিবদ্ধ হয়ে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে, নিঃশব্দে। কলসিটি যখন তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তখন মাথা নিচু করে করজোড়ে তারা প্রণাম নিবেদন করছিল। আমরা কলসিটি আমাদের মাথায় বা একদিকের কাঁধে রেখে পায়ে হেঁটে চলছিলাম। সে যুগে বিজলিবাতির চল ছিল না। আধা-অন্ধকারেই আমরা ধীরপদে চলছিলাম। বাতি হাতে রাস্তায় কিছু মানুষ এসেছিল। শান্তিনিকেতনের নেপাল রোডের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দেখি, রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, কর্মী এবং আশ্রমবাসী মহিলারা করজোড়ে দাঁড়িয়ে। আমরা কলসি নিয়ে নেপাল রোড শেষ করে উত্তরায়ণের পথ ধরে 'কোণার্ক' ও 'শ্যামলী' বাড়ির সামনে গিয়ে, কলসিটি 'শ্যামলী'র মাঝের ঘরে সাজানো একটি কাঠের বেঞ্চির উপরে রাখলাম। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী আমাদের পূর্বেই শান্তিনিকেতনে এসে এইরূপ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কলসিটির নীচে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে আসি। বাইরে প্রতিমা দেবীসহ রথীন্দ্রনাথ ছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে। প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, গুরুদেবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'শ্যামলী'তে রাখা ওই কলসিটির সামনে বসে যদি নিয়মিত গুরুদেবের 'মৃত্যু' ও 'পূজা' পর্যায়ের গান গাই তা হলে ওঁরা দু'জনে খুবই খুশি হবেন। আমি তা শুনে খুবই অভিভূত হয়ে পড়ি। মনে হল গুরুদেবই বোধহয় তাঁর ইচ্ছাকে ওঁদের দু'জনের মাধ্যমে আমাকে জানালেন। আমি কোনওরকম দ্বিধা না করে কৃতজ্ঞচিত্তে আমার সম্মতি জানিয়ে বাড়িতে আসি। পরদিন সকালে কলাভবনের অধ্যাপক মাসোজীকে 'শ্যামলী'তে আমার গানের কথা বলে আমার গানের সঙ্গে তাঁকে এস্রাজে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানালে তিনিও সানন্দে তাঁর সম্মতি জানালেন। সে যুগে মাসোজী শান্তিনিকেতনে যাবতীয় গানের অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে এস্রাজ বাজাতেন।

পরের দিন সন্ধ্যা থেকে 'শ্যামলী'তে কলসিটির নীচে মাটিতে শতরঞ্চির উপর বসে গান শুরু করলাম মাসোজীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রতিমা দেবী রোজই এসে বাইরে বসতেন। রথীবাবু প্রতিদিন আসতে পারতেন না। আমি রোজই প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো সময় ধরে গান গাইতাম। কোনও কোনও দিন মনে একটি বিশেষ অনুভূতি জাগত। মনে হত, আমি যেন গুরুদেবের সামনে বসে গান গাইছি, তিনি যেন মনোযোগ দিয়ে তা শুনছেন। এবারে দুটি অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ করে আমার এই স্মৃতিচারণ শেষ করছি।

প্রথমটি হল, গুরুদেবের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পরে আমি জোড়াসাঁকোয় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে আমার ব্যক্তিগত একটি কাজে আসি। তখনও পর্যন্ত গ্রন্থনবিভাগের অফিস ছিল জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে। এখানে পৌঁছেই আমি প্রথমে চলে গিয়েছিলাম, যে ঘরে গুরুদেব তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই ঘরটি দেখতে। গিয়ে দেখি কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে যে স্টিলের খাটটি গুরুদেবের অসুস্থতার সময় দেওয়া হয়েছিল, যার উপরে শায়িত অবস্থায় তিনি শেষ

দিন পর্যন্ত ছিলেন, সেই খাটটি সেখানে নেই। তার পরিবর্তে আছে কাঠের একটি বিরাট পালঙ্ক, যা বিবাহের সময় ব্যবহৃত হয়। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিনবিহারী সেন-এর দপ্তরে প্রবেশ করে বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি যে, মূল স্টিলের খাটের পরিবর্তন করে কাঠের ওই পালঙ্কটিকে ওই ঘরে রাখা হয়েছে কেন। কার নির্দেশে এরূপ ভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিনবাবু এর উত্তরে একটি কথাও সেদিন বলেননি। আগাগোড়া মুখ বন্ধ করে বসেছিলেন। আমি অপেক্ষা না করে ক্রুদ্ধচিত্তে অফিস থেকে বেরিয়ে আসি। পরে শুনেছিলাম, সেই খাটটি নাকি কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হয়। পরিবর্তে কাঠের খাটটি সেখানে স্থান পেয়েছিল। আমি প্রতিবাদ করবার পরই কাঠের পালঙ্কটিকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর থেকে ওই ঘরটি খালি রাখা আছে। কোনওপ্রকার খাট নেই।

দ্বিতীয় ঘটনা হল, গুরুদেবের চিতাভস্মসহ কলসিটি নিয়ে। উত্তরায়ণে রবীন্দ্রভবন নির্মিত হবার পর গুরুদেব-ব্যবহৃত নানা জিনিস একটি ঘরে সাজানো হল। শত শত দর্শনার্থী এই প্রদর্শনী নিয়মিত দেখতে আসেন। দেখলাম সেখানে সেই বড়ো কলসিটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি সে সময়ের রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ও অন্য সব কর্মীদের কাছে বড়ো কলসিটির বিষয়ে জানতে চাই। তাঁরা সকলেই বলেছিলেন, গুরুদেবের চিতাভস্ম-রক্ষিত বড়ো কলসি ছিল বলে তাঁরা জানেন না। খাতাপত্রে ছোট একটি কলসির উল্লেখ আছে। তখন বেশ বুঝলাম, গুরুদেবের চিতাভস্মসহ বড়ো কলসি নিরুদ্দেশ হয়েছে কোনও এক অজানা কারণে। সেই ভস্মগুলি যদি বড় আকারের কাঁচের বয়ামে পুরে প্রদর্শনীগৃহে রাখা হত, তাহলে এ যুগের দর্শনার্থীরা গুরুদেবের দেহের হাড়ের টুকরো এবং আগুনে পোড়া চন্দন কাঠের টুকরোগুলি দেখে অভিভূতচিত্তে মাথা নত করতে পারতেন। আমি নিজে যে টুকরোটি শ্মশান থেকে সংগ্রহ করেছিলাম, সেটি এখনও অতি যত্নের সঙ্গে কাঁচের একটি ছোট বয়ামে রেখেছি। প্রতিদিন প্রাতে গুরুদেবকে স্মরণ করে তাঁর কাছে আমার প্রণতি জানাই।
